গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

পথ ও পথিক

নবকিশোর সঙ্কল্প করিল সে আর পড়িবে না।

পড়াশুনার প্রতি তাহার অনুরাগের অভাব ছিল না। কিন্তু এ সঙ্কল্পের মূলে ছিল তার কঠোর দারিদ্র্য। তাহার মত অসহায়, সম্পত্তিহীন আজন্ম ভিক্ষুকের পক্ষে পড়াশুনার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা নয় কী ?

মা'র কথা তাহার ভাল করিয়া মনে নাই। জন্ম দিয়াই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। বয়োপ্রাপ্ত না হইতেই পিতাও তাহাকে অকালে ছাড়িয়া গেলেন। এই হতভাগ্যের জীবনে, একা উনিশটি বছর শুধু আগাছার মত পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া কাটিয়া গেল। গ্রাম-সম্পর্কে এক গোলাদার মহাজনকে সে 'খুড়া' ব ডাকিত। তাহারই দোকানে একটু আশ্রয় লাভ করিয়া, তাহারই ব দু'বেলা দু'মুঠা অন্নের সংস্থান করিয়া কোন গতিকে গ্রামের ইস্কুল হইতে সে প্রবেশিকা পরীক্ষাটা দিয়াছিল। উত্তীর্ণ হইল প্রথম বিভাগে এবং দশ টাকা বৃত্তিও পাইল। কিন্তু তাহার পর, সহরে গিয়া কলেজে উচ্চতর শিক্ষা লাভের বাসনা বলবতী হইলেও—সে সঙ্কল্প তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল।

এই দুর্মূল্যের বাজারে পয়সা কড়ি খরচ করিয়া, কে তাহার পড়াশুনার ভার গ্রহণ করিবে ?

লেখা-পড়া শিখিয়া দশজনের একজন হইবে, পাঁচ জনে সুখ্যাতি করিবে, উপার্জ্জনক্ষম হইয়া নিজ দারিদ্র্যের প্রতিকার করিতে পারিবে এ ধরণের চিন্তা যে তাহার কিশোর হৃদয়ে স্থান পাইত না, এমন নহে। কিন্তু সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার উপায় কী! সে যেদিকেই চায়, দেখিতে পায় স্বার্থপর মানুষ শুধু নিজের নিজের চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত। কোনদিকে এমন কেহ নাই, যে তাহার কথা একটু ভাবে—এই কষ্টের মধ্যে, প্রতিকারের পথ করিয়া দিয়া, সংসারের পথে, জীবনের পথে একটু পাথেয়ের সন্ধান করিয়া দেয়।

দু'একটি বন্ধুর পরামর্শে সে, পাড়ার দু'একজন মাতব্বরের বাটীতে দৌড়িয়াছিল। সকলেই তাহার কৃতকার্য্যতার তারিফ করিল। কিন্তু নিজে উদ্যোগী হইয়া তাহার পাঠ্যজীবনের ব্যয়-ভার বহন করিতে কেহই অগ্রসর হইল না। নবকিশোর সেই মুহূর্ত্ত হইতেই বুঝিতে পারিল—হৃদয়হীন মানব তাহার ব্যথা বুঝিতে অক্ষম। অন্তরে তাহাদের সমবেদনা বলিয়া কোন পদার্থ নাই—খানিকটা মৌখিক উৎসাহের আবরণে তাহারা নিজ নিজ মুরুব্বীসুলভ পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে মাত্র।

তাহার খুড়া, মহাজন শ্রীধর মণ্ডলকে সে জানাইল অতঃপর সে তাঁহারই গদিতে বসিয়া দুইবেলা খাতা লিখিবে। যে লোকটি একদিন ঠিকা বেতনে এই কার্য্য করিত তাহাকে ছাড়াইয়া দিবার জন্য নবকিশোর তাহার খুড়াকে অনুরোধ করিল।

শ্রীধরের মত সঙ্গতিপন্ন মহাজন যে ইচ্ছা করিলে নবকিশোরের কলেজে পড়ার ব্যয়ভার স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারিত না, তাহা নহে। কিন্তু সে উচ্চ-শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ প্রকাশ করিত। বরং এ কথাও প্রকাশ করিতে ছাড়িত না যে উচ্চ শিক্ষা উপার্জ্জনের পরিপন্থী।

তাহার দ্বারা লোককে আয়েসী এবং বাবু করিয়াই তোলে—ভবিষ্যতের সুসার কিছু হয় না।

সুতরাং নবকিশোর যে স্বেচ্ছায় দোকানের খাতা লিখিতে সম্মত হইল ইহাতে বৃদ্ধ শ্রীধর একটু সন্তুষ্টই হইল। তা' ছাড়া সে নবকিশোরকে একটু প্রীতির চক্ষেই দেখিত। ছেলেটা শুধু অত্যধিক বিনয়ীই নয়, তাহার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চরিত্রবান বালক সে এ অঞ্চলে খুব বেশী দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় জলপানি লইয়া উত্তীর্ণ হইলেও তাহার অহঙ্কার নাই। পড়াশুনার সুযোগ পাইল না বলিয়া সে অদৃষ্টকে দোষারোপ করে না। শ্রীধর যখন যাহা বলে সে তাহা নির্ব্বিচারে পালন করে। কখনও উচ্চ বাচ্য করে না। এই সব সদ্‌গুণের জন্য ছেলেটির প্রতি শ্রীধরের একটা আত্মিক টানও জন্মিয়াছিল।

আর একটি নারী নবকিশোরকে সত্যই ভালবাসিত। সে শ্রীধরের পত্নী কৃষ্ণপ্রেয়সী। ছেলেটা স্বহস্তে দুইবেলা রাঁধিয়া খাইত। ইহাতে কৃষ্ণপ্রেয়সী মনে মনে যথেষ্ট আঘাত পাইলেও কোন প্রতিকার করিতে পারিত না। নিষ্ঠাচারী এই ব্রাহ্মণ সন্তানটির প্রতি মমত্ব বোধে তার মাতৃ-হৃদয় বিগলিত হইত। অপুত্রক এই নারী, মাতৃত্বের সাধ তাহার বহু-কালই দূর হইয়াছে। তাই পিতৃ-মাতৃহীন এই ব্রাহ্মণ সন্তানটিকে ঘিরিয়া তাহার অতৃপ্ত মাতৃ-হৃদয়ের বুভুক্ষা খানিকটা মিটাইতে চেষ্টা করিত। কিন্তু বেচারী কিশোর,তাহাকে ধরা-ছোঁয়া দিত না। দিনের পর দিন এই ছেলেটি তাহারই চোখের সম্মুখে সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য নির্ম্মম ভাবে করিয়া যাইতেছে। কাহারও একটু ভালবাসা বা একটু আব্দারের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। তবুও কৃষ্ণপ্রেয়সীর মনে হইত ইহার অন্তরে কোথায় যেন একটা গোপন ব্যথা রহিয়াছে, হৃদয়ের খানিকটা দিক হয় ত' অভাবের যাতনায় মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও যেন সে ইহা প্রকাশ করিতে জানে না!

আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়দাত্রী হিসাবে যতটুকু শ্রদ্ধা করা দরকার বা আদেশ পালন দরকার, এই বালকটী শুধু তাহাই করিয়া ক্ষান্ত যাইবে, তাহার একটুখানিও বেশী নয়! কৃষ্ণপ্রেয়সী মনে মনে পীড়িতা হইত। সে শূদ্র-কন্যা হইলেও তাহারও মাতৃ-হৃদয় ত' একই ধাতু দিয়া-ই তৈরী, তবে সেখানে এত জাতিবিচার কেন? কিশোর কি একদিন তাহাকে ভুলিয়াও মা বলিয়া ডাকিতে পারে না? কতদিন সে তাহার কাছে আছে, কথা কহিয়াছে, দরকারে অদরকারে খাটিয়া দিয়াছে। কিছু খাইতে দিলে সে আহার্য্য সাদরে গ্রহণ করিয়াছে, কিছু বলিলে বড় বড় ভাসা ভাসা চোখে তাহার দিকে তাকাইতেছে। তথাপি ভুলিযাও সে তাহার অভাবের কথা, দৈন্যের কথা মুখ ফুটিয়াও একদিন জানায় নাই।

'খুড়ীমা' বলিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সীকে ডাকিলেও তাহার মনে হইত এ যেন প্রাণের কথা নয়। একটা বাহ্যিক সম্বন্ধই সহজ করিবার জন্য ইহার আবশ্যকতা—অন্তরে তাহার বিন্দুমাত্র সায় নাই। আজ পাঁচটি বছর তাহার কোল জুড়িয়া এ ছেলেটি বড় হইলেও, তাহাকে কখনও নাগাল পাইত না। এই বুকভাঙ্গা দুঃখ লইয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিল—নবকিশোর ধরা দিল না।

বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইলে দোকানের কাজ সারিয়া নবকিশোর প্রত্যহ বাড়ী ফিরিত এবং বাড়ী ফিরিয়াই দেখিতে কে যেন ইতিমধ্যে উনান জ্বালিয়া তাহার রান্না চড়াইয়া দিয়াছে। হাঁড়িটি যথাসময়ে নামাইয়া কলার পাতে ভাত বাড়িয়া নবকিশোর আহারে বসিত। ক্ষুধার অন্ন তাহার মুখে মিষ্টই লাগিত। কিন্তু তাহারই অলক্ষ্যে থাকিয়া একটি নারী যে এমনি করিয়া দিন দিন তাহার অভাব অভিযোগের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে পঙ্গু করিয়া, দূর্ব্বল করিয়া তুলিবে—এই ধরণের চিন্তায় তাহার মন

মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সীকে একটা কথাও বলিতে পারিত না।

একদিন মধ্যাহ্নে স্বামী আহারে বসিলে কৃষ্ণপ্রেয়সী বলিল—"কিশোর দশটাকা জলপানি পেয়েচে, আর কিছু বাড়িয়ে দিয়ে তাকে সহরে পাঠিয়ে দাও না গা। ছেলেটা লেখাপড়া শিখুক।"

স্বামী বোধকরি তখন আহারে বসিয়া মনে মনে সমস্ত দিনকার খরিদ-বিক্রীর হিসাব কসিতে ছিল। হঠাৎ কথাটা শুনিতে পাইল না। কৃষ্ণপ্রেয়সী পুনরুক্তি করিতেই শ্রীধর বলিল—

"কিশোর তোমার সে ছেলে নয়। দশটা দশটা টাকার লোভে সে যে আখের নষ্ট না কোরে, দোকান আগলে বসে আছে, এতেই সে একদিন মানুষ হ'য়ে উঠবে—তুমি দেখে নিও।"

কথা শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী বিস্মিত হইয়া কহিল—"তুমি যে অবাক কোরলে গা? লেখাপড়া শিখলে আখের নষ্ট হবে?" শ্রীধর বুঝাইল—"সে দিনকাল আর নেই বড় বৌ। লেখা পড়া শিখে ছেলেদের আর হাত গজায় না। মিথ্যা খানিকটা দেমাক বাড়ে মাত্র! এ তল্লাটে তুমি এমন একটা ছেলেকেও দেখাতে পারবে না যে লেখাপড়া শিখে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েচে।"

কৃষ্ণপ্রেয়সী আর কথা বলে না। স্বামীর উপর তার অগাধ বিশ্বাস! মনে মনে হয়ত' তাহার কথাই খতাইয়া দেখে। স্বামী লেখাপড়া না শিখিয়াও যে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া এ তল্লাটে দশজনের একজন হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেয়সীর ইহাই ছিল মস্ত বড় অবলম্বন।

বেলা প্রায় দশটা নাগাদ হঠাৎ দোকান হইতে ফিরিয়া নবকিশোর বাড়ী হইতে ছাতাটি লইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল।

কৃষ্ণপ্রেয়সী তাহা দেখিতে পাইয়া সামনে আসিয়া পড়িল।

কিশোর তাহাকে দেখিয়া একটু চঞ্চল হইয়া বলিল, "খুড়ীমা এ বেলা আর আমার উনুন জ্বেলো না। আমার ফিরতে দেরী হবে।"

এত বেলায় অভুক্ত অবস্থায় সে কোথায় চলিল জিজ্ঞাসা করায় নবকিশোর জানাইল সে দক্ষিণপাড়ায় গুড়ের বায়না দিতে চলিয়াছে।

কৃষ্ণপ্রেয়সী কিশোরের দিকে তাকাইয়া বলিল—"তুমি যে অবাক কোরলে বাবা, সারাদিন না খেয়ে পিত্তি পড়বে যে। বরং তুমি আধঘণ্টা বোস, আমি উনুন ধরিয়ে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দি।"

নবকিশোর বিব্রত হইয়া পড়িল। সে খবর পাইয়াছে গুড়ের কারবারী দক্ষিণপাড়ায় আসিয়াছে। সময়মত বায়না না দিলে তাহাদের পাওয়া যাইবে না, গ্রামান্তরে চলিয়া যাইবে। তাই কৃষ্ণপ্রেয়সীকে বাধা দিয়া বলিল, "তা হয় না খুড়ীমা, এক্ষুনি না গেলে হয়ত সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।"

"তবে বাবা কিছু মুখে দিয়ে যাও"—বলিয়া নবকিশোরের হাত হইতে ছাতাটি কাড়িয়া লইয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী একখানি আসন পাতিয়া, ঠাঁই করিয়া তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল।

বাড়ীতে সামান্য যা কিছু ফলমূল ছিল তাহার সহিত কয়েক কুচি বাতাসা দিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী নবকিশোরকে আহারে বসাইল।

এই অভুক্ত অবস্থায় এখান হইতে পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া কত বেলায় যে কিশোর ফিরিবে তাহা ভাবিয়াই সে অস্থির হইয়া পড়িল। এই যৎসামান্য আহার সামনে ধরিয়া দিতেও তাহার কুণ্ঠা হইতেছিল কিন্তু কিশোর যে একদণ্ড অপেক্ষা করিতেও নারাজ।

কিশোর কোন গতিকে ফলমূলগুলি গিলিয়া বাহির হইয়া গেল। কৃষ্ণপ্রেয়সী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেল। সেদিন স্বামীর আহার চুকিলে সে আর রান্না ঘরে ঢুকিল না। দুই কুচি শশা আর

একটুখানি গুড় খাইয়া মধ্যাহ্নের আহার সমাপ্ত করিল। শ্রীধর তাহার একবিন্দুও জানিতে পারিল না।

বেলা প্রায় উত্তীর্ণ হইবার মুখে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে নবকিশোর ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দক্ষিণপাড়া হইতে কার্য্য সারিয়া ফিরিল। কিশোরের শুষ্ক মুখ দেখিয়া মনে হইল সমস্ত দিন তাহার কিছুই আহার হয় নাই। সে ছাতা রাখিয়া গায়ের চাদরখানা খুলিতেই কৃষ্ণপ্রেয়সী আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

"বাবা কিশোর, হাতমুখ ধুয়ে এসে একটু বোস্ আমি বরং দু'খানা লুচি ভেজে দি'। আমার হাতে লুচি খেলে তোর আর কিছু দোষ হ'বে না বাবা। লুচি ত' আর ভাত নয়?"—কথাগুলি ঝড়ের বেগে উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী রন্ধনশালার দিকে আগাইয়া গেল।

কিশোর এ কথার কী জবাব দিবে সে নিজেই জানে না।

আজ সমস্ত দিন পর্য্যন্ত আহারের অভাবে হাঁটিয়া হাঁটিয়া যেটুকু ক্ষুধার উদয় হইয়াছিল বেলা পড়িতে তাহাও মরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেয়সীর মুখ দেখিয়া তাহার না বলিতে সাহসে কুলাইল না। এমনিই সে কথা বলে কম, তাহার উপর সমস্ত দিনের পরিশ্রমে তাহার প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। তাই হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া, কুশাসনখানি পাতিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে বসিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ-প্রেয়সী একটি থালায় পরিপাটি করিয়া লুচি ভাজিয়া, খানিকটা তরকারী ও গুড়সমেত আসন পাতিয়া সাজাইয়া দিল। বোধ করি জীবনে সেই প্রথম নবকিশোর অনুভব করিল অন্নপূর্ণা আজ তাগার সামনে মূর্ত্তি ধরিয়া ক্ষুধার অন্ন পরিবেশন করিয়া গেল। মুখে তাহার বাক্য সরিল না, কিন্তু ভগবানের চরণে বার বার প্রণতি জানাইল—এ চিরদরিদ্রের প্রতিও তাঁর করুণার অভাব নাই।

কিশোরকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া কৃষ্ণপ্রেয়সীর যেন হৃদয়

জুড়াইয়া গেল। তাহার মনে হইল—কিশোর যদি আজ বিনা আহ্বানে নিজে চাহিয়া খাইত, আহারের জন্য আব্দার ধরিয়া অস্থির করিয়া তুলিত—তবে কেমন হইত? হতভাগা ছেলে যদি ভুলিয়াও তা একদিন করিবে? ভুলিয়াও কোন কিছু চাহিবে!

তাহার পর সন্ধ্যাবেলা হইতেই নবকিশোরের জন্য লুচি ভাজা যেন তাহার দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতর গিয়া দাঁড়াইল।

নবকিশোরও দু' চারদিন নির্ব্বিবাদে এ অত্যাচার সহ্য করিল। কিন্তু তৃতীয় দিন সে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে দোকান হইতে বাড়ী ফিরিল না। কৃষ্ণপ্রেয়সী উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন। বাড়ীর একটা চাকর দিয়া নানা স্থানে অনুসন্ধানে পাঠাইলেন, কিন্তু নবকিশোরকে পাওয়া গেল না! শেষে তিনি স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন—ছেলেটাকে কোন গতিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীধরকে উঠিতে হইল। দোকানের নিকটেই ছেলেদের এক কুস্তির আখড়া হইতে তিনি কিশোরকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিলেন।

কিশোর কৃষ্ণপ্রেয়সীকে দেখিয়াই ভয় পাইয়া গেল। উৎকণ্ঠায় তাহার মুখ যেন মসীবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কিশোর জানাইল—আজ সে কিছুই আহার করিবে না, তাহার জ্বরবোধ হইতেছে।

কৃষ্ণপ্রেয়সী "কই দেখি" বলিয়া তাহার গাত্রের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল। বলিল—"তোর আবার জ্বর কোথারে, লুচি খেতে হবে না বাবা, আমি উনুন ধরিয়ে দি' তুই ভাত চড়িয়ে দিগে।"

সেই দিন হইতে দুই বেলা আবার যথানিয়মে নবকিশোরের ভাতের হাঁড়ি উনানে চড়িতে লাগিল।

কয়েক মাস যায়। পড়াশুনার চিন্তা সে যে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে

পারিয়াছিল এমন মনে হয় না। ইতিমধ্যে একদিন স্কুলের সেক্রেটারী কলিকাতা হইতে গ্রামে আসিয়াই একটি লোককে দিয়া নবকিশোরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন, তাঁহারই স্কুলের এই মেধাবী ছাত্রটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশ টাকা বৃত্তি পাইলেও পয়সার অভাবে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

কিশোর আসিয়া চ্যাটার্জ্জী সাহেবের সহিত দেখা করিল। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এক্ষণে নামজাদা ব্যারিষ্টার এবং গ্রামের স্কুলের অবৈতনিক সেক্রেটারী।

কিশোর নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই চ্যাটার্জ্জী সাহেব তাহাকে কলেজে ভর্ত্তি না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিশোর সংক্ষেপে তাহার জবাব দিল।

চ্যাটার্জ্জী সাহেব কিশোরের আর্থিক অস্বচ্ছলতা কাহিনী শুনিয়া তিনি হইলেন। তিনি বলিলেন—"তুমি কলিকাতায় এস। আমি তোমার পড়াশুনার ব্যবস্থা কোরে দেব।"

"কিন্তু এ বছর ত' হবে না স্যর। আমি যে দোকানের ভার নিয়েচি।"

চ্যাটার্জ্জী সাহেব ভাবিয়া দেখিলেন—কলেজের 'সেসন্' প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে। এখন ভর্ত্তি হইলে কিশোরকে অনেক লোকসান সহ্য করিতে হইবে। তাই তাহার জবাব শুনিয়া বলিলেন—

"অনর্থক এ বছরটা তুমি নষ্ট কোরলে। যাই হোক, তোমাকে বলাই রইল। আমি আবার আসব, আসছে বছর নিশ্চয়ই কলেজে ভর্ত্তি হওয়া চাই। বরং আমি তোমায় খানকতক সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বই পাঠিয়ে দেব ইতিমধ্যে পড়ে রেখো!"

কিশোর অল্প দু' চারটি মামুলী কথাবার্ত্তার পর সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিদায় লইল।

স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত কী কী কথাবার্ত্তা হইল, কিশোর আসিয়া তাহা অকপটে শ্রীধরকে জানাইল। শ্রীধর শুনিয়া মনে মনে সুখী হইল কী দুঃখিত হইল বলা যায় না। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেয়সী আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিল না—"আহা তাই হোক গো, কিশোর আমার লেখাপড়া শিখুক, মানুষের মত মানুষ হোক," বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল।

কিছুদিন পর কিশোরের নামে পার্শেলে কতকগুলি বই আসিল। খুলিয়া দেখিল চ্যাটার্জ্জী সাহেব পাঠাইয়াছেন—আই-এ ক্লাসের পাঠ্য-পুস্তক, কতকগুলি ইংরাজী সাহিত্যের এবং বিজ্ঞানের বই। বিজ্ঞানের উপর চ্যাটার্জ্জী সাহেবের ঝোঁক ছিল। বিজ্ঞানের অনুশীলন ব্যতীত বর্ত্তমান সময়ে ছেলেদের পাঠ সম্পূর্ণ হয় না, ইহাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। বর্ত্তমান ইচ্ছামূলক শিক্ষার যুগে কিশোরের কোন দিকে অভিলাষ তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াই তিনি বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি পাঠাইয়াছিলেন।

সবগুলি বই-ই একেবারে আনকোরা নতুন, ঝরঝরে তরতরে। নূতন বই পড়া কিশোরের জীবনে এই প্রথম। চিরকাল স্কুলের পাঠ্য-পুস্তক সে অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া বা ভিক্ষা করিয়া চালাইয়াছে। আজ সেই অযাচিত দানে কিশোরের অন্তর আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে পড়িল যখন এমনি করিয়া অভাগার জীবনে প্রথম অরুণোদয়ের সূচনা হইয়াছে; তখন হয় ত' একদিন তাহার মনের অন্ধকারও দূর হইবে।

এমনি করিয়া সুখে-দুঃখে তাহার একটি বছর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে সে চ্যাটার্জ্জী সাহেবের প্রদত্ত বইগুলি চার পাঁচবার করিয়া পড়িয়া শেষ করিয়াছে। তাহার মনে কতবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে আরও কতকগুলি

পুস্তকের জন্য চ্যাটার্জ্জী সাহেবকে পত্র লিখিবে। কিন্তু সঙ্কোচের জন্য সে তাহা পারে নাই।

মাঝে স্কুলের আর এক মিটিঙ্-এ চ্যাটার্জ্জী সাহেব আর একবার গ্রামে আসিলেন। সেবারেও কিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি ভুলিলেন না। কথায় কথায় বইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা উঠিতেই চ্যাটার্জ্জী সাহেব নিমেষেই বুঝিতে পারিলেন, এই মেধাবী বালক শুধু তাহা পড়িয়া শেষ করে নাই। উহা নিঃশেষ করিয়া জীর্ণ করিয়াছে। শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত, বিজ্ঞানের বইগুলি সে কী করিয়া আয়ত্ত করিল—সাহিত্য-সম্বন্ধে অনুশীলন সে কি ভাবে সম্পূর্ণ করিল, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহারও অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে আছে। তাহারাও স্কুল কলেজে উচ্চ শিক্ষা পায়, সর্ব্বদা শিক্ষিতসমাজে মিশিয়া থাকে, গৃহ-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করে, কিন্তু এই পল্লীগ্রামে থাকিয়া মুদীর দোকানের খাতা লিখিয়া এ ছেলেটী কেমন করিয়া এতখানি উৎকর্ষের পরিচয় দিল তাহা কিছুতেই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। তাহার মনে হইল—দরিদ্র হইলেও ছেলেটী নিশ্চয়ই ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতার অধিকারী। বয়সে নিতান্ত বালক হইলেও সেই মুহূর্ত্তে চ্যাটার্জ্জী সাহেবের ব্যবহারে একটা সম্ভ্রমের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

এইবার কিশোরকে তিনি কলিকাতা যাইয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

•

এই একটি বছর কিশোর বাড়ীতে কিছু কিছু পড়াশুনা করিলেও, তাহার কাকার দোকানের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদনে কোনদিন এতটুকু শিথিলতা প্রকাশ করে নাই। বরং খাতা লেখা ছাড়াও খরিদ-বিক্রী বা মাল-চালানী কাজে, শ্রীধর তাহাকে যখন যাহা বলিয়াছে সে তাহা

নিপুণভাবে সম্পন্ন করিয়াছে। মাল আমদানীর তদ্বির করিতে গিয়া কার্য্য সম্পাদন অন্তে ব্যাপারীরা খুসী হইয়া কখনও কখনও তাহাকে দু' পাঁচ টাকা জোর করিয়া হাতে গুঁজিয়া দিয়াছে। সে বাটী পৌছিয়া তখনই তাহা খাতায় জমা করিয়া শ্রীধরকে ফিরাইয়া দিয়াছে। আজ এই একটি বছর, এই ছেলেটি যে বিপুল অধ্যবসায় যত্ন ও পরিশ্রমে এই কারবারটি চালাইয়া আসিয়াছে, শ্রীধরের নিকট তাহা কল্পনাতীত। এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, বিশ্বাসী সহকর্ম্মী আজকালকার দিনে মাসিক একশত টাকা বেতনেও সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

এতদিন পরে, সেই কিশোর দোকান ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইবে কথাটা ভাবিতেই শ্রীধরের বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। উচ্চ শিক্ষার প্রতি তাহার যথেষ্ট বিতৃষ্ণা থাকিলেও, এই ছেলেটি যে আর পাঁচজন হইতে স্বতন্ত্র, বরং লেখাপড়া শিখিলে একটা কিছু যে করিতে পারিবেই এ বিশ্বাস তাহার হইল। তাই কিশোরের অনুপস্থিতিতে তার যথেষ্ট ক্ষতি ও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সে আর মুখে বাধা দিল না; বিশেষ চ্যাটার্জ্জী সাহেবের মত ধনবান শিক্ষিত ব্যক্তি যেখানে তাহার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছে। সুতরাং কলিকাতা রওনা হইবার প্রার্থনা জানাইতেই শ্রীধর নিঃশব্দে অনুমতি দিল।

কিন্তু যে কৃষ্ণপ্রেয়সী এতদিন কিশোরকে দূরে পাঠাইয়া লেখাপড়া শিখাইবার জন্য নিজে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া প্রস্তাব করিয়া আসিয়াছে—আজ সত্যই কিশোরের অদৃষ্টে সে সুযোগ আসিল দেখিয়া সে নিজে দুঃখ ও বেদনায় কাতর হইয়া পড়িল। কিশোর তাহা হইলে সত্যই চলিয়া যাইবে? তাহার যাইবার দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, সে নীরবে ততই চোখের জল ফেলিতে লাগিল। কিশোর জানে না, তাহাকে ঘিরিয়া তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সীর দিনগুলি কত আনন্দে

কত সুখে কাটিয়াছে। সন্তানহীনা নারী-হৃদয়ে যে বুভুক্ষা একদিন জ্বলিয়াছিল—এই সৌম্য-দর্শন আনন্দময় বালকমূর্ত্তিকে সেই স্থানে কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সীর জীবনে যে কী পরিপূর্ণতা আসিয়াছে—নির্ব্বোধ বালক যদি তাহা জানিত, হয়ত এমন করিয়া আঘাত দিয়া চলিয়া যাইতে পারিত না। শ্রীধর জানে, নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতাপ্রযুক্ত যে স্নেহ, তাহাই হয় ত' কৃষ্ণপ্রেয়সী এতদিন অন্তরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সে স্নেহ যে কত গভীর, হৃদয়কে ছাপাইয়া তাহার উৎস সে অন্তরের কত গভীরতম প্রদেশে গিয়া বাজিতে সুরু করিয়াছে, বৃদ্ধ শ্রীধর তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিল না। সে কেবল জানিল, পরের ছেলেকে এতদিন মানুষ করিলাম, তার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ এতদিন পর ভগবান খুলিয়া দিলেন। এখন সে তাহারই আহ্বানে সাড়া দিতে চলিয়াছে। কিন্তু সেই পরের ছেলে যে আর একটি অপুত্রক জননীকে ঘিরিয়া—নিজের ছেলের বাড়া করিয়া তুলিয়াছে—তাহার পরিচয় শুধু কৃষ্ণপ্রেয়সীর অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহই বুঝিল না।

কিশোরের চলিয়া যাইবার আর চার পাঁচ দিন মাত্র বাকী আছে। একদিন সে কৃষ্ণপ্রেয়সীকে বলিল :—

"খুড়ীমা, এই কয়টা দিন আর ভাত রাঁধতে পারিনে। দু' বেলা তুমি লুচি ভেজে দিও !"

বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে সেই প্রথম কিশোরের মনে হইল—এই নারীর প্রতি সে একদিন অবিচার করিয়াছে। এমনই এক সন্ধ্যায়, আর একজনের স্নেহের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া সে অভুক্ত থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। আজ বিদায়ের পূর্ব্বে তাহারই একটা প্রতিকার করা দরকার।

কৃষ্ণপ্রেয়সী চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে লুচি ভাজিতে গেল।

দুই দিন কৃষ্ণপ্রেয়সী তাহাকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলে তৃতীয় দিন সে কিশোরকে বলিল—

"দু' বেলা লুচি খেলে যে তোর অসুখ কোরবে বাবা, আজ তুই ভাত রাঁধ।"

কিশোর অসুখ শুনিয়া একটু হাসিল। কিন্তু রাঁধিতে যাইবার কোন উৎসাহই দেখাইল না। কৃষ্ণপ্রেয়সী ভীতা হইল। কহিল—"কী রে রাঁধ্‌বিনে?"

"ভাতই তুমি রাঁধগে যাও না, খুড়ীমা—"

কিন্তু একথা শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী শিহরিয়া উঠিল। কিশোর বলে কী আজ! বালক হইলেও যে এতদিন ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত স্বপাকে আহার করিয়া নিজের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, শূদ্রের কন্যা হইয়া, আজ জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিবে!

কৃষ্ণপ্রেয়সী নড়ে না দেখিয়া কিশোর আবার কহিল—

"বিশ্বাস হোল না বুঝি খুড়ীমা। আচ্ছা তুমি রেঁধো না, দেখতে পাবে খ'ন—লুচি আজ আমি কিছুতেই মুখে তুলচি নে!"

"পাগল ছেলে কোথাকার! ভগবান কী সে পথ রেখেছেন বাপ্—নে ওঠ্ আর দেরী করিস নে।"

কিশোর কৃষ্ণপ্রেয়সীর মুখের দিকে তাকাইল!

আর দু'দিন পরে সে চলিয়া যাইবে। তবে কেমন করিয়া সে একটি নারীর প্রাণে এমন করিয়া আঘাত দিয়া যাইবে। খানিকক্ষণ কী ভাবিল সেই জানে। তারপর নিজেই উদ্যোগী হইয়া আপন মনে ভাত চড়াইতে গেল!

বিদায়ের দিন কৃষ্ণপ্রেয়সী পুরোহিত ডাকাইয়া ষোড়শ উপচারে গৃহ-দেবতার পূজা করিলেন। নির্ম্মাল্য তুলসী তাহার মাথায় দিল। কপালে দধির টিপ দিয়া শিরশ্চুম্বন করিল। শ্রীধর সেদিন প্রাতেই ভিন্ন গ্রামে নিজে হাঁটিয়া গিয়া, হাট হইতে নবকিশোরের জন্য একটি ছিটের কোট ও একজোড়া চটি জুতা আনিয়া দিল।

যাইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কৃষ্ণপ্রেয়সী কিশোরকে একটু নিরালায় ডাকিয়া হাতে একটি ছোট ন্যাকড়ার পুঁটলী দিয়া কহিল—

"বাবা, এইটুকু তোকে নিতেই হবে আজ—সব জিনিষে তুই চিরটাকাল 'না' বোলে এসেছিস, আজ কিন্তু কিছুতেই ফেরাতে পারবিনে—"

নবকিশোরের চোখ দিয়া সেই প্রথম জল গড়াইয়া পড়িল। মনে হইল সে একবার কোন গতিকে মুখ ফুটিয়া বলে—যে জিনিষ মানুষ ইচ্ছা কোরলেই ফিরিয়ে দিতে পারে—তার মূল্য কতটুকুই বা খুড়ীমা; কিন্তু যে জিনিষ আজ আমার রক্তমাংসের সঙ্গে, প্রতি শিরায় শিরায়, অস্থিতে অস্থিতে মিশিয়ে দিয়েছ—তা' কেমন কোরে ফিরিয়ে দেব?

নবকিশোর নতমস্তকে আজ তার খুড়ীমার স্নেহের দান বুক পাতিয়া লইল।

"এখন তবে আসি খুড়ীমা!"

হায় রে সন্তান! তবু যাইবার আগে, মুখ ফুটিয়া একটিবারও মা বলিয়া ডাকিতে পারিল না। বুক-ভাঙ্গা অশ্রু লইয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী দ্বার বন্ধ করিল—

নবকিশোরের গরুর গাড়ীখানি তখন দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়া ষ্টেশন অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

•

কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা লইয়া কিশোর কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু সহর দেখিয়া তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

শৈশবে আর একবার সে এখানে শ্রীধরের সহিত আসিয়াছিল। কিন্তু বাল্যের সে স্মৃতি এখন তাহার ভাল করিয়া মনে পড়ে না।

ইহারই নাম কলিকাতা—জীবনে উন্নতির পথে পাথেয় সংগ্রহ করিতে এখানেই নাকি মানুষ আসিয়া জুটে! সে চিড়িয়াখানার কথা কেতাবে পড়িয়াছিল। মনে হইল এ সহরটিও যেন ইট-পাথরের চিড়িয়াখানা! কত রকমের ঘর বাড়ী, কত লোকজন। কত যান-বাহন এখানে চলা ফেরা করে, কিশোরের একটুও ভাল লাগিল না। মনে হইল ফেরত গাড়ীতেই দেশে ফিরিয়া যায়। সব যেন তার বুকের উপর চড়াও হইয়া দম বন্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। পল্লী-লক্ষ্মীর অঙ্গন ঘিরিয়া যে শান্ত-সুষমা, তার আকাশ বাতাস, ধানের ক্ষেত, নদ-নদী-উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে যে মাধুর্য্য, তাহারই মধুর স্মৃতি আজ তার সারা দেহ-মন-প্রাণ ঘিরিয়া যে আনন্দের নীড়টুকু রচনা করিয়া চলিয়াছে—এ দৈত্যপুরীতে পা দিয়া, প্রথম পদস্পর্শেই, সে স্মৃতি হঠাৎ যেন আজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

কতগুলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কিশোর যে চ্যাটার্জ্জী সাহেবের ভবনে আসিয়া পৌঁছিল—তাহা, শুধু তা'র অন্তর্য্যামীই লক্ষ্য করিলেন।

তাহারপর আর এক বিস্ময়—তার চ্যাটার্জ্জী সাহেবের বাড়ী।

ইহারই একটি খোপ আশ্রয় করিয়া তাহার পাঠ্য-জীবন আরম্ভ করিতে হইবে।

সহরে কোন এক রাজ অট্টালিকা সে চোখে দেখিয়াছিল কিন্তু এ যেন তাহাকেও উপহাস করে। বিলাসের কী কী উপকরণ দিয়া গৃহ সাজাইলে তাহা পূর্ণাঙ্গ হয়, ক্ষুদ্র বালক তাহা জানিত না। এই বিরাট অট্টালিকার যে দিকেই চোখ চায়, গৃহের উপকরণ, সজ্জার সুরুচি, সুমার্জ্জিত রূপ—তাহার চক্ষুকে যেন অন্ধ করিয়া দিল।

গাড়ী বারান্দায় একখানি মোটার দাঁড়াইয়া ছিল। কিশোর তাহার পাশে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ একটি সৌম্য-দর্শন নবীন কিশোর—দেখিলে বালক বলিয়াই মনে হয়। বয়স সতের আঠারো বৎসরের বেশী হইবে না, পাশ হইতে তাহার স্কন্ধে হাত রাখিতেই কিশোর চমকিয়া উঠিল। সেই ছেলেটি কহিল—

"আপনিই বুঝি নবকিশোরবাবু?"

কিশোর জবাব দিতে পারিল না। অপরিচিতের মুখের দিকে উদাস ভাবে তাকাইয়া রহিল। অগত্যা বাধ্য হইয়া সেই ছেলেটিই আবার প্রশ্ন করিল—

"বুঝেছি আপনিই সেই। দেশ থেকে এই মাত্র এলেন বুঝি? তা, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন যে, ভেতরে চলুন। বাবা আমায় আপনার কথা বলে গেছেন। তিনি এখন কোর্টে গেছেন। বিকেলে ফিরবেন!"

ইতিমধ্যে সাতাশ আঠাশ বছরের একটি মেয়ে মোটারে আসিয়া উঠিল।

হঠাৎ দরজার গোড়ায় নবকিশোরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, মেয়েটি প্রশ্ন করিল—"ছেলেটি কে-রে সৌম্য?"

"এ সেই নবকিশোরবাবু বড়দি'। আমাদের বাড়ী থেকে কলেজে পড়বেন।"

"তা' বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, তোমরা ভেতরে যাও"—বলিয়া তিনি মোটার চালাইবার জন্য ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করিলেন।

সৌম্য তাহার সঙ্গীকে বলিল—"উনি আমার বড়দিদি। আমার নাম সৌম্য।'

নবকিশোর তখন সেই পরিচিত বন্ধুটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতরে আসিয়া পৌছিল।

সৌম্য তাহাকে ঘরে আনিয়া বসাইয়া এক মুহূর্ত্তেই তাহার সহিত ভাব করিয়া লইল।

বলিল—"নবকিশোরবাবু, এই আপনার ঘর। এইখানে আপনি শোবেন, ঐ টেবিলে আপনি পড়বেন।"

আহারের পূর্ব্বে নবকিশোরকে একবার তাহার কুশাসনখানি বাহির করিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের জন্য পাতিবার আয়োজন করিতে দেখিয়া সৌম্য একেবারে হাসিয়া কুটিকুটি—সে আপন মনেই বলিল,—

"এইবার আমার বড়দিদির চ্যালা হবে ঠিক! এই রকম সন্ধ্যা আহ্নিক রোজ করেন বুঝি—দেখবেন বড় দিদির সঙ্গে আপনার ঠিক মিলবে—"

কিশোর কি বুঝিল সেই জানে। সেদিনকার মত সংক্ষেপে নিত্যকর্ম্ম সারিয়া লইল।

"নবকিশোরবাবু, আপনার খাবার মাটিতে দেবে, না টেবিলে?"

নবকিশোর ভাবিল সৌম্য উপহাস করিতেছে। বলিল—"টেবিলে কেন, টেবিলে বুঝি মানুষ খায়?" নবকিশোর বোধ হয় ভাবিতেও পারিল না, মনুষ্য নাম-ধারী কোন জীব টেবিলে বসিয়া আহার করিতে পারে!

সৌম্য বলিল—"আমরা সবাই রোজ মাটিতে খাই, কখনও কখনও বাবার সঙ্গে টেবিলে বসে খাই। আপনি চলুন না টেবিলে বসে খাবেন। আমি পাশে বসে গল্প কোরব'খন।"

নবকিশোর দেখিল তাহা হইলে সৌম্য ঠাট্টা করিতেছে না! বোধ করি সে সেই প্রথম বুঝিল কলিকাতার হয় ত' ইহাই আর এক বিচিত্র ব্যবস্থা। তাহার পর কিশোরকে ধরিয়া আনিয়া যখন খাবার ঘর দেখাইয়া দিল—তখন সত্যই তাহার ঘৃণায় অন্তর বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সে শুনিয়াছিল—চ্যাটার্জ্জী সাহেব বিলাত ফেরত হইলেও ব্রাহ্মণ, কিন্তু এ

বাটীতে আহারের যে এমন ম্লেচ্ছের মত ব্যবস্থা তাহা সে বোধ করি কল্পনাও করে নাই।

কিশোরের অবস্থা দেখিয়া সৌম্য বুঝিল—এ ব্যবস্থা তাহার মনঃপুত হয় নাই। পাড়াগাঁর ছেলে নতুন কলিকাতায় আসিয়াছে, সুতরাং না হইবারই কথা। তাই সেখান হইতে ঠেলিয়া কিশোরকে সে উপরে তুলিল। উপরের রন্ধনশালার বারান্দায় আনিয়া ঠাঁই করিয়া দিল। তৎপর সৌম্যের নির্দ্দেশে উড়িষ্যাবাসী এক ব্রাহ্মণ আসিয়া আহারীয় দিয়া গেল। কিশোর দেখিল—ব্রাহ্মণ বটে, গলায় যজ্ঞোপবীত ঝুলিতেছে। তখন কোন প্রকারে সে আহার সমাধা করিল।

তারপর সৌম্য আর এক কাণ্ড করিয়া বসিল। মা মা বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে বারান্দার একপাশ হইতে আর এক পাশে ছুটাছুটি সুরু করিয়া দিল।

ইতিমধ্যে পাশের বারান্দা-সংলগ্ন একটি ঘর হইতে, একটি বর্ষীয়সী মহিলা বাহির হইয়া তাহাদের সম্মুখে পড়িলেন।

"অত ডাকাডাকি করছিস কেন রে?"

"দেখবে এস মা, কে এসেচে। এই কিশোর, যার কথা বাবা আজ সকালে বলছিলেন।"

একটা স্নিগ্ধ হাসি মহিলাটির মুখে ভাসিয়া উঠিল। তখন কিশোরের প্রায় আহার বন্ধ হইয়াছে। তাহার মা আর একটু নিকটে আসিতেই সৌম্য দুরন্ত শিশুটির মত তার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া দোল দিতে লাগিল—

"সৌম্য ছাড় বলছি, সব সময় ছেলে মান্‌ষি করিস নি।"

"তোমার খাওয়া হয়েচে বাবা"—বলিয়া সৌম্যের জননী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কিশোরের মুখের দিকে তাকাইলেন।

কিশোর দেখিল আর একটি নারী তাহার দিকে প্রসন্ন মুখে চাহিয়া

আছেন। তখন কোন প্রকারে সে আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিয়া আসিল। একবার বোধ করি একটু ইতস্ততও করিল, তারপর ভূমিষ্ঠ হইয়া সৌম্যের জননীকে প্রণাম করিল।

সৌম্য তাহার মাতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"জানেন নবকিশোর বাবু, একে আমরা সবাই মা বলি—কিন্তু আসলে এ আমাদের একটি সৎ-মা।"

"আবার দুষ্টামি আরম্ভ করলি—"বলিয়া সৌম্যের আলিঙ্গন হইতে তাহার জননী নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

কিশোর দেখিল সৌম্য শুধু চঞ্চল নয়। বড্ড ছেলেমানুষ। এত বয়স হইয়াছে, তবুও তাহার মাতার সহিত ছেলেমানুষী করে।

"তুই আজ কলেজে গেলি না কেন রে সৌম্য ?"

"তা জাননা বুঝি In honour of নবকিশোরবাবু, আজ আমার ছুটি।"

"তোর ছুটি বের করছি—"বলিয়া তাহার জননী পুত্রের ঘাড় ধরিয়া দরজার দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিলেন।

"আঃ ছাড় বলচি। আজ আমার একটা মাত্র Period সেই তিনটার সময়।"

"তবে তুই কিশোরকে এখানে রেখে কলেজে যা। আমি যা হয় ব্যবস্থা করছি।"

অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সৌম্য কিশোরকে তাহার জননীর হাতে ছাড়িয়া দিয়া উধাও হইল।

"এস বাবা—"বলিয়া সৌম্যের জননী অর্থাৎ মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী কিশোরকে তাঁহার শয়ন কক্ষে লইয়া চলিলেন।

"তোমার শোবার ঘর দেখেচ, কোন কিছুর অসুবিধা হয় নি ত', যদি কিছু হয় আমায় বোলো।"

কিশোর এ প্রশ্নের কী জবাব দিবে! রাজবাড়ীতে আসিয়া রাজার সুখে থাকিয়া যদি অভাব বোধ করিতে হয়, তাহা হইলে বোধ করি সুখের মুখ স্বর্গে গেলেও দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার মনে হইল, এতটা জাঁকজমক, এতটা বিলাস ব্যসন না হইলেই ভাল হইত। তথাপি সৌম্য ও তাহার জননীকে তাহার ভালই লাগিল। ইহারা এতটা বড় লোক, এতবড় বাড়ী, এত লোকজন দাসদাসী—তথাপি তাহার মত রাস্তার ভিক্ষুককে বাড়ী আনিয়া বিন্দুমাত্র অবহেলা করিল না।

কিশোর জননীর সহিত দু'একটা মামুলী কথাবার্ত্তার পর নীচে আসিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে বিশ্রাম করিতে চলিল। ট্রেনে আসায় খানিকটা পরিশ্রমও হইয়াছিল। তাহার উপর তাহার খুড়ীমাকে ছাড়িয়া, পল্লীর সেই চিরপরিচিত নীড়টুকু ছাড়িয়া আসিয়া অন্তরে অন্তরে ব্যথা বোধ করিতেছিল, এতক্ষণ পরে একাকী এই নিরালা ঘরটিতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিল।

ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে জানে না—হঠাৎ সৌম্যের ডাকাডাকিতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চোখ মেলিয়া দেখিল তাহারই কয়েকটি ভাইবোনের কলরবে ঘরখানি ভরিয়া গিয়াছে।

সৌম্য বলিল—"সন্ধ্যা হয়ে এল যে কিশোরবাবু, উঠুন এবার চা খাবেন, বাবার সঙ্গে দেখা কোরবেন চলুন।"

সৌম্যের কথায় নবকিশোর হাত মুখ ধুইয়া তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

তাহার পরদিন চ্যাটার্জ্জী সাহেবের নির্দ্দেশ মত—সে একটি প্রাইভেট কলেজে ভর্ত্তি হইল। কয়েকটি বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তক সে ইতিমধ্যেই শেষ করিয়াছিল, তাই আই-এ না পড়িয়া আই-এস-সি ক্লাশে ভর্ত্তি হইল।

প্রথম কলিকাতার মাটিতে পা দিয়া তাহার যতটা খারাপ লাগিতেছিল

আজ আর ততটা মন্দ লাগিল না। কলেজের নামই সে শুনিয়াছিল, কিন্তু কোন দিন চাক্ষুষ দেখে নাই। এত বড় বাড়ী, হাজার হাজার ছেলে সেখানে পড়ে। মনে হইল যেন তাহাদের গ্রামের সারা স্কুলে যতগুলি ছাত্র, এখানকার কলেজে যেন একটি ক্লাশেই ততগুলি ছেলে পড়ে। পড়াইবারই বা কি বিচিত্র ব্যবস্থা, শিক্ষক যে কতগুলি তাহা গুণিয়া শেষ করা যায় না। আর ছেলেরা? এখানে সবাই বোধ করি ধনী। বেশীর ভাগই, বাড়ীর গাড়ী বা মোটরে আসে। পল্লীর সেই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে পাঠ্য-জীবন ইহার তুলনায় যেন নিতান্তই প্রাণহীন। ইহারই মাঝে যেন সে আজ নূতন করিয়া নব-জীবনের সন্ধান পাইল। কাল যাহা তিক্ত বোধ হইতেছিল, আজ তাই পরিপাক যোগ্য বলিয়া বোধ করিল।

দু' চারদিন কলেজে যাওয়া আসা করিতে করিতে, রাস্তাটিও তাহার পরিচিত হইয়া গেল। এ কয়দিন চ্যাটার্জ্জী সাহেবের বাড়ীর একটি মালী, তাঁহারই নির্দ্দেশ মত, কিশোরকে কলেজে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিত।

সে ক্লাসে আসিয়া, হলের সর্ব্বশেষ বেঞ্চিতে ঘাড় গুঁজিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত এবং নিঃশব্দে লেকচার শুনিত।

একদিন রসায়ণের এক অধ্যাপক, একটি বিশিষ্ট বিষয় ছাত্রদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার পর, সকলে কে কেমন বুঝিয়াছে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রথম হইতে পর পর অনেকগুলি ছাত্রকে প্রশ্ন করায়, কেহই বিষয়টি বুঝাইয়া বলিবার জন্য দাঁড়াইল না। অধ্যাপকেরও রোখ বাড়িয়া গেল। রেজেষ্ট্রী ধরিয়া এক একটি ছাত্রের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে নবকিশোরের নাম উল্লিখিত হইবামাত্র, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর বিশুদ্ধ ইংরাজিতে, অতি সুন্দর করিয়া প্রশ্নটির জবাব দিল। অধ্যাপক

কৌতূহলবশতঃ আরও দু একটি প্রশ্ন করিতেই বুঝিলেন, ছেলেটি জিজ্ঞাসিত বিষয়টি ছাড়া রসায়ণ শাস্ত্রের আরও অনেকগুলি অধ্যায় আয়ত্ত করিয়াছে। অভিজ্ঞ রাঁধুনী যেমন হাঁড়ির একটি ভাত টিপিলেই বুঝিতে পারে অবশিষ্টের কি অবস্থা, তেমনি একটিমাত্র প্রশ্ন করিয়াই তিনি কিশোরের বিদ্যাবুদ্ধির সম্যক পরিচয় পাইলেন। সেই দণ্ডেই তিনি কিশোরকে, শেষ বেঞ্চি হইতে একেবারে সামনের বেঞ্চে, তাঁহার সম্মুখে উঠিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। কিশোর অতি সঙ্কোচের সহিত কর্ত্তব্য পালন করিল।

তারপর কয়েকদিন ধরিয়া এই অধ্যাপকটি ক্লাসে আসিয়াই নবকিশোর রায়ের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কোন একটি নূতন বিষয় পড়াইলেই তিনি সর্ব্বপ্রথম নবকিশোরকে জিজ্ঞাসা করিতেন—সে বুঝিয়াছে কি না! নবকিশোর ভাল করিয়া বুঝিয়া না থাকিলে তিনি আবার বুঝাইতেন, কিন্তু সে বুঝিয়াছে বলিলে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতেন না।

এইভাবে যে এতদিন অধ্যাপকের সতর্ক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া, শেষ বেঞ্চির এক কোণে বসিয়া, নিরিবিলিতে অধ্যয়ন স্পৃহা মিটাইতেছিল, রসায়ণ শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রফেসর ব্যানার্জ্জী একদিন তাহাকেই যেন অকস্মাৎ এই ঘটনার মধ্য দিয়া সকলের সাথে পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইহার পর সে ক্লাসে আসিলে 'নবকিশোর রায়' এই নামটি অস্ফুটস্বরে অনেকের কণ্ঠেই উচ্চারিত হইতে শুনিত।

ইংরাজী সাহিত্যের সবগুলি পুস্তক তাহার ছিল না। একদিন নবকিশোর তাহার এক সহপাঠীর পাঠ্য-পুস্তক চাহিয়া লইয়া, কলেজের কমনরুমে বসিয়া তাহারই অংশ বিশেষ নকল করিতে লাগিয়া গেল।

উপর্য্যুপরি দু'দিন একই পুস্তক চাহিয়া লইতে দেখিয়া, পুস্তকদাতা

বিস্মিত হইয়া নবকিশোরকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। নবকিশোর কোন জবাব না দিতে, ছেলেটির কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। শেষে একদিন সে leisureএর সময় নবকিশোরের অনুসন্ধান করিতে করিতে—তাহাকে কমনরুমের এক অংশে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল, দেখিল তখন সে নিবিষ্ট-চিত্তে, তাহারই পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে পৃষ্ঠা আগাগোড়া নকল করিয়া যাইতেছে।

নবকিশোরের সহপাঠী তাহার বন্ধুর কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, খাতাখানি হাতে করিয়া তুলিতেই দেখিল, প্রায় তিন শত পাতা একটি ইংরাজী কাব্যের বই সে প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী নকল করিয়া ফেলিয়াছে।

"নবকিশোর বাবু ?"

সলজ্জ হাসিতে নবকিশোর মুখ লুকাইল।

"আগাগোড়া এই বইখানা নকল কোরছেন"—কেন নকল করিতেছে তাহা অবশ্য প্রশ্ন কর্ত্তার জানিতে বাকী রহিল না।

"এই বইখানার দাম কত জানেন ? দু' টাকা ছয় আনা। এই দু টাকা ছ' আনার জন্য আপনি যে পরিশ্রম কোরলেন—এর থেকে একটা প্রাইভেট্ টিউশনি কোল্লে ঢের বেশী পেতেন। দিন আমার বইখানা, আমি আপনাকে এমন কোরে সময় নষ্ট কোরতে দেব না।" বলিয়া সত্যই সে বইখানা নবকিশোরের হাত হইতে টানিয়া লইল।

নবকিশোর ভাবিল, তাহার বন্ধুটি ত' তাহা হইলে নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই, আর তাহা ছাড়া সে এমন কর্ম্মভোগই বা করিতেছে কেন ? চ্যাটার্জ্জী সাহেব কালই ত' তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, তাহার পাঠ্য পুস্তক যখন যেমন দরকার হয় সে যেন কিনিয়া লয়। এই বইখানির কথা তখন তাহার মনে হয় নাই। আর চাহিলেই ত' সে পাইত।

তারপর নবকিশোরের মনে পড়িল—আসিবার সময় তাহার

কৃষ্ণপ্রেয়সী তাহাকে একটা ন্যাকড়ার পুঁট্‌লি দিয়াছিলেন। ট্রেণে সে খুলিয়া দেখিয়াছিল, তাহাতে ঠাকুরের কতকগুলি নির্ম্মাল্য আছে এবং কুড়িটি টাকা। দরকার হইলে, সে স্বচ্ছন্দে এই টাকা হইতে কিছু খরচ করিয়া বইখানি কিনিতে পারিত।

কিন্তু সে অত অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া এ কার্য্য সুরু করে নাই। ফার্ষ্টইয়ার ক্লাসে প্রথম প্রথম পড়াশুনা বড় কম থাকে, এক একটি ঘণ্টার পরেই, এক ঘণ্টা অবসর। একখানি খাতা লিখিয়া যদি সে অবসর মুহূর্ত্তগুলি কাটানো যায় তবে মন্দ কী। এইখানি ত' আর কিনিতে হইবে না। কিন্তু তাহার বন্ধুটি আসিয়া সব গোলমাল করিয়া দিল।

তারপর প্রাইভেট্ টিউশনির কথায় নবকিশোরের কী মনে হইল, সে তাহার সহপাঠিকে প্রশ্ন করিল—"চেষ্টা কোরলে কী একটা ছেলে পড়ানোর কাজ পাওয়া যায়!"

প্রশ্ন শুনিয়া তাহার বন্ধুটি হাসিল। বলিল—"পাওয়া হয় ত' খুব সহজ নয়, কিন্তু আপনার পক্ষে কঠিন হবে না। এখন চলুন ক্লাসে যাই—" বলিয়া দুই বন্ধু গল্প করিতে করিতে ক্লাসে চলিয়া গেল।

তারপর তিনটা দশে ক্লাস ভাঙ্গিতেই, নবকিশোর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কলেজের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গেটের কাছে আসিয়া পড়িল। গেটের বাইরে এক পা বাড়াইয়াছে, হঠাৎ এক পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে গেল। দেখিল তাহার সদ্য পরিচিত সহপাঠি বন্ধুটি নবকিশোরের স্কন্ধে হাত রাখিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছে "ও কী ওদিকে নয়, ওদিকে নয়—একেবারে এই দিকে—"

নবকিশোর দেখিল সামনে একটি খোলা মোটর দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই ভিতর জোর করিয়া তাহার সহপাঠি নবকিশোরের দেহের অর্দ্ধেক প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। কোথায় লইয়া যাইবে, কেন যাইবে

কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়াই, নবকিশোরকে যেন অকস্মাৎ গাড়ীর ভিতরে বন্দী করিয়া ফেলিল।

"তারপর বাড়ী কোন দিকে ?"

নবকিশোর জানাইল সে ভবানীপুরে থাকে। রাস্তার নাম জিজ্ঞাসা করিতেই তাহার খট্‌কা লাগিল, কিছুতেই রাস্তার নামটি মনে হইল না। তার বন্ধুটি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কলিকাতায় এই নূতন আসা বুঝি ?"

নবকিশোরও হাসিল কিন্তু জবাব দিল না।

ভবানীপুরের দিকে মোটর চালাইতে চালাইতে সে আবার বলিল—

"কোন মেসে থাকেন বুঝি ?"

"না, চ্যাটার্জ্জী সাহেবের বাড়ীতে"।

"কোন চ্যাটার্জ্জী সাহেব ?" তারপর নাম করিতেই তাহার সহপাঠির সব সংশয় দূর হইল। কিন্তু সে অন্তরে অন্তরে পরম বিস্ময় বোধ করিল—চ্যাটার্জ্জী সাহেবের মত একজন নামজাদা ধনীর পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে, পাঠ্যপুস্তক নকল করিয়া বিদ্যা চর্চ্চা করা সম্ভব কি না। ইচ্ছা হইল নবকিশোরকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, চ্যাটার্জ্জী সাহেবের সহিত তাহার পারিবারিক সম্বন্ধের ইতি কথাটি জানিয়া লয়। কিন্তু সদ্য আলাপী, বিশেষ করিয়া এতখানি মুখচোরা কোন ছেলেকে, সে প্রশ্ন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বিব্রত করা উচিত মনে করিল না।

তারপর চ্যাটার্জ্জী সাহেবের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতেই নবকিশোরের বন্ধু তাহাকে নামাইয়া দিবার পূর্ব্বে ইংরাজী কাব্যের সেই বইখানি নবকিশোরকে গছাইয়া দিয়া বলিল—"বইখানি নিয়ে নামতে হবে—ও কী না না, আমি কোন কথা শুনবো না। না নিলে নামতে দেবনা।"

কিশোর বোধ করি জীবনে এত বিপদে কখনও পড়ে নাই। এ কী গায়ে পড়া উপদ্রব। সে কোনগতিকে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বলিল—

"বইখানি আমাকে দিলে আপনার পড়াশুনা কী ক'রে হ'বে ?"

ছেলেটি হাসিল। বলিল "আপনাকে কী আর আমি একেবারে দিচ্ছি, শুধু পড়তে দিচ্ছি। ভাবছেন কি, দরকার হোলেই নেব'খন।"

"ঠিক নেবেন কিন্তু ?"—বলিয়া নবকিশোর অগত্যা বইখানি তাহার বন্ধুর হাত হইতে নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্বে গ্রহণ করিল, কিন্তু বাটী পৌঁছিয়া নিজের ঘরে বইগুলি গুছাইয়া রাখিতে গিয়া দেখিল, তার নকল করা অসমাপ্ত কেতাবখানি সঙ্গে আনে নাই। সে বুঝিল তাহা আত্মসাৎ করিয়াছে। ✓

নবকিশোর বাটী পৌঁছিয়া হাত মুখ ধুইয়া আহার করিল, তাহার পর নিকটবর্ত্তী একটি পার্কে খানিকক্ষণ একাকী বেড়াইয়া আসিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, সে প্রতিদিনকার মত আসনখানি পাতিয়া নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিল। তারপর বিছানায় উঠিয়া আসিয়া, খানিকক্ষণ অলসভাবে দেহটি শয্যার উপর বিছাইয়া দিয়া, মনে মনে এ কয়টা দিন জীবনে কী পরিবর্ত্তন আনিয়াছে, তাহারই ইতিহাস আওড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার খুড়ীমা কৃষ্ণপ্রেয়সীর চিন্তা আসিয়া তাহার সুখময় বর্ত্তমানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমস্ত স্মৃতিই ওলট-পালোট করিয়া দিয়া গেল। সে একখানি কাগজ লইয়া তাহার খুড়ীমাকে পত্র লিখিতে বসিল।

আসিয়াই তাড়াতাড়িতে সে কৃষ্ণপ্রেয়সীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ মত একখানি পোষ্টকার্ডে তাহার নিরাপদে পৌঁছান সংবাদ দিয়াছিল। তাহার পর ইহাই তাহার দ্বিতীয় পত্র। আজ অবসর পাইয়া, একটা দিনের অভিজ্ঞতার কাহিনী, বেশ গুছাইয়া সে তাহার খুড়ীমাকে লিখিতে সুরু করিল।

ইতিমধ্যে সৌম্য আসিয়া পড়িল। তাহার মাতাঠাকুরাণী নবকিশোরকে ডাকিতেছে শুনিয়া সে অসমাপ্ত পত্রখানি বন্ধ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই সৌম্য বলিল—"কাকে চিঠি লিখ্ছেন অত যত্ন কোরে!"

নবকিশোর জানাইল—আসা অবধি বাড়ীতে ভাল করিয়া খবর দেওয়া হয় নাই, তাই সব কথা গুছাইয়া লিখিতেছে।

সৌম্য জানিত নবকিশোর পিতৃমাতৃহীন, তাহার আত্মীয় বলিতে কেহ নাই। তবে বাড়ীতে কাহার নিকট এত যত্ন করিয়া সে পত্র লিখিতেছে। সে বালসুলভ কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। তাহাকে প্রশ্ন করিল—

"সেখানে ত' শুনি আপনার কেউ নেই, তবে চিঠি লিখ্ছেন কাকে?"

নবকিশোর এ প্রশ্নের কী জবাব দিবে? সৌম্য জানে, চ্যাটার্জ্জী সাহেব জানে, তার পরিচিত যে দু'চারজন আছে এবং বোধ করি নবকিশোর নিজেই জানে সত্যই ইহসংসারে আপনার বলিতে, রক্তের সম্বন্ধ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা তাহার নাই! কিন্তু তার অন্তর জুড়িয়া যে একটি প্রসন্ন নারীমূর্ত্তি আজ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সত্যই সে কী তার কেহ নয়? ইহাই যদি না-থাকা হয় তবে সত্যই তাহার কেহ নাই। সৌম্যকে সে কী করিয়া বুঝাইবে যে ভগবান তাহাকে পার্থিব সুখসম্পদ, ঐশ্বর্য্যের দিক হইতে একেবারে নিঃস্ব ভিখারী করিলেও—হৃদয়কে শ্মশান করে নাই। তাহারই আশে পাশে অনুসন্ধান করিলে হয় ত' এমন একটি প্রাণের উৎস মিলিবে—স্নেহ ও করুণার ফল্গুধারায় যাহা নিয়তই সরস হইয়া আছে।

আত্মীয়হীন, স্বজনহীন, বন্ধুহীন, বান্ধবহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার বোধ করি এইখানেই তাহার একমাত্র সার্থকতা।

তাই নবকিশোরের প্রশ্নের নিরুত্তর জবাবে সৌম্য কী বুঝিল সেই জানে। দ্বিতীয়বার আর বাক্য ব্যয় না করিয়া তাহাকে মায়ের কাছে টানিয়া লইয়া চলিল।

পরদিন কলেজে পৌছিয়াই নবকিশোর তাহার পূর্ব্বদিনের পরিচিত সহপাঠিকে দেখিবামাত্র মধুর হাসিয়া প্রথমেই তাহাকে সম্বোধন করিল—"অরুণবাবু—"

"বাঃ এই যে দিব্বি নাম ধাম জানা হয়ে গেছে এর মধ্যে।"

নবকিশোর জবাব দিল—"আপনি দান কোরে নাম কিনতে চান, আর আমি সে দান গ্রহণ কোরে দাতাকে চিনব না—এও কী সম্ভব? তারপর কখন এলেন বলুন ত' ?"

নবকিশোরের বন্ধু অরুণকুমার বুঝিল বইখানির লেন-দেন হইতেই তাহার নামের রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। নবকিশোর যে তাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া সে খুসীই হইল।

তারপর দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া সেদিনকার লেকচার শুনিল। নির্দ্দিষ্ট সময় ছুটির ঘণ্টা পড়িতেই অরুণ তাহাকে বলিল—

"আপনার পড়াবার একটা কাজ জোগাড় করেছি। একটি ছোট মেয়েকে পড়াতে হবে, সকালে বা সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা—" বলিয়া তাহাকে একটা ঠিকানা লেখা কাগজ দিল—Mr. N. C. Bose, ৫০ রায় ষ্ট্রীট।

বলিল—"এই ঠিকানায় কাল সকালে যাবেন। মিষ্টার বোস সব ঠিক কোরে দেবেন।"

নবকিশোর ধন্যবাদ দিয়া কাগজখানি গ্রহণ করিল।

পরদিন যথাসময়ে মিষ্টার বোসের ভবনে পৌছিতেই দেখিল একটি

প্রফুল্ল বদন বৃদ্ধ ভদ্রলোক চোখে চশমা আঁটিয়া, সামনের ঘরটিতে বসিয়া কাগজপত্রে কি লিখিতেছেন।

নবকিশোরকে দেখিয়া বোধ করি ভদ্রলোকটি চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, "তোমারই নাম নবকিশোর রায়। আমি তোমার কথা শুনেছি বাবা সব। তুমি চ্যাটার্জ্জী সাহেবের বাড়ীতে থাক, নয় ?"

নবকিশোর ঘাড় নত করিয়া নীরবে সায় দিল।

বলিলেন—"কাল থেকে তুমি আমার মঞ্জু মাকে পড়াবে। এটি আমার ছোট মেয়ে, গার্ল স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে।"

পরে "মঞ্জু" বলিয়া ডাকিতেই একটি ফ্রক পরা ফুলের মত সুন্দর মেয়ে পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার বাবার কোলটির কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

মিষ্টার বোস সস্নেহে মেয়ের কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা একবার নাড়িয়া দিয়া কহিলেন—"মঞ্জু মা, ইনিই তোমার মাষ্টার নবকিশোর বাবু, কাল থেকে এঁর কাছে তুমি পড়বে, কেমন।"

বালিকা এতক্ষণ উৎসুক দৃষ্টিতে নবাগতকে দেখিতেছিল। বোধ করি শিক্ষক-নির্ব্বাচন তাহার প্রীতিপ্রদ হইল। সে মধুর হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। "তোমার বইগুলো তা হ'লে এবার মাষ্টার মশাইকে দেখাওগে যাও—"

বালিকা নবকিশোরকে সঙ্গে লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

তার পর দিন সকাল বেলা সৌম্য জানিল নবকিশোর একটি প্রাইভেট টিউশনী জোগাড় করিয়াছে।

তাহার জননী মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী এ কথা শুনিয়া বলিলেন—"বাবা, প্রাইভেট পড়িয়ে তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হবে না ত ?"

নবকিশোর সানন্দে জানাইল, না। চ্যাটার্জ্জী সাহেবও কথায় কথায়

এ সংবাদ পাইয়া সুখীই হইলেন। গরীবের ছেলে আশ্রয় পাইয়াও যে সর্ব্ব রকমে পরের গলগ্রহ না হইয়া স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা করে—ইহাতে তিনি ছেলেটীর কর্ত্তব্যবোধ ও মহত্ত্বেরই পরিচয় পাইলেন।

একদিন তাহার কলেজের রসায়ণের অধ্যাপক মহাশয় তাহাকে দুইখানি বই পড়িতে দিতে চাহিলেন। কিশোর তারপর এক ছুটীর দিনে ডাক্তার ব্যানার্জ্জীর বাড়ীতে বই দুইখানি আনিতে গেল। বাড়ীখানি চ্যাটার্জ্জী সাহেবের বাটীরই নিকটবর্ত্তী। কিন্তু বাড়ী পৌছিয়াই দেখিল—সামনের এক ক্ষুদ্র লনে সৌম্যের বড়দিদি একখানি ডেক চেয়ারে বসিয়া মালির সাহায্যে গাছগুলিতে জল দেওয়াইতেছেন ও বাগানের এক কোণে সৌম্য একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর শিশু ক্রোড়ে তুলিয়া একটি দড়ির দোলনায় দোল খাওয়াইতেছে।

নবকিশোর ভাবিল বাড়ী ভুল করিয়া ঢুকিয়াছে, কিন্তু ফটকের গোড়ায় তাকাইয়া দেখিল—সত্যই এক পিত্তল ফলকে লেখা আছে—Dr. Jogesh Chandra Banerji, D. Sc.

সৌম্যের এদিকে নজর পড়িতেই সে নবকিশোরের নাম ধরিয়া ডাকিল। নবকিশোর সে দিকে তাকাইতে প্রশ্ন করিল—"কাকে খুঁজছেন নবকিশোরবাবু?"

নবকিশোর বলিল—"স্যরকে।"

"কোন স্যর? ডক্টর ব্যানার্জ্জী?"—বলিয়াই সৌম্য হাসিয়া ফেলিল।

নবকিশোর বলিল—"এটা তাঁর বাড়ী নয়?"

সৌম্য আবার হাসিল। পরে তার দিদিকে দেখাইয়া বলিল—"নাঃ এটা আমার বড়দির বাড়ী।"

"আর জ্বালাসনি সৌম্য। কিশোর তুমি এদিকে এস ত'—তোমার

মাষ্টার মশাইকে খুঁজছ বুঝি? ঐ ঘরে গিয়ে একটু বোস, এক্ষুনি আসবেন, বাজারে গেছেন।”

বড়দিদির কথায় কিশোরের মনে কেমন যেন একটা সংশয় জাগিল। সে অনুমান করিল—মাষ্টার মহাশয় নিশ্চয়ই ইহাদের আত্মীয়, কিন্তু সে আত্মীয়তা যে কী প্রকারের তাহা জানিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর একটা টু-সিটার বেবী অষ্টিন গাড়ীতে, স্বয়ং চালাইয়া মাষ্টার মশাই অর্থাৎ ডাক্তার যোগেশ ব্যানার্জ্জী বাজার করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

গাড়ীখানি বাড়ীর ফটকে ঢুকাইয়া মাষ্টার মশাই ডাকিলেন —“করুণা?”

নবকিশোর দেখিল এ ডাকে সাড়া দিতে, সৌম্যের বড়দিদি আগাইয়া গেল। তখন তার বুঝিতে বাকী রহিল না—ইনিই মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী। কিন্তু এ কথা ত' সৌম্য একদিনও তাহাকে বলে নাই।

নবকিশোর মাষ্টার মহাশয়কে প্রণাম করিয়াই তাঁহারই ইঙ্গিতে সামনের এক আসনে বসিল।

সৌম্য গাড়ী হইতে অনেক দ্রব্য বোঝাই ঠোঙা তুলিয়া মাছ তরকারী অন্যান্য জিনিস নামাইয়া লইল।

তারপর নবকিশোরকে বলিল—“জামাইবাবু বুঝি আপনাদের পড়ান? হ্যাঁ জামাইবাবু, আপনি বুঝি এদের মাষ্টার?”

সৌম্যের প্রশ্ন করার ধরণে ডাক্তার ব্যানার্জ্জী ও তাঁহার পত্নী উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন।

তারপর সৌম্য নবকিশোরকে বলিল—“বড়দি'র বাড়ীতে রোজ রোব্‌বার সকালে নেমন্তন্ন, জানেন? আপনারও আজ এখানে নেমন্তন্ন, না বড়দি?” বলিয়া চোখের একটা অপূর্ব্ব ইসারা করিয়া “আমি এক্ষুনি

মাকে ফোন্ কোরে দিচ্ছি”—বলিয়া সৌম্য ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। তারপর পাশের ঘর হইতে টেলিফোন সহযোগে সে তাহার মাতাকে চীৎকার করিয়া বলিল—“আজ দুপুরে নবুদাও এখানে খাচ্ছে।”

নবকিশোর ভাবিল ব্যাপার হইল মন্দ নয়। অধ্যাপকের বাড়ীতে বই চাহিতে আসিয়া এ কী ফ্যাসাদের সৃষ্টি! গৃহকর্ত্তা বা গৃহকর্ত্রীর অনুমতির জন্য একটিবারও সে জিজ্ঞাসাবাদ করিল না। সেই এখানকার যেন সর্ব্বময় কর্ত্তা সাজিয়া নবকিশোরকে সেদিনকার মধ্যাহ্ন আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া বসিল।

নবকিশোর কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। সে এই অল্পদিনেই বুঝিয়াছে, সকলের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব; বরং তাহার খুড়ীমা কৃষ্ণ-প্রেয়সীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধও সে এড়াইয়াছে কিন্তু এ দুরন্ত বালকটির হাত হইতে তাহার নিস্তার পাইবার কোন উপায়ই নাই। তাই সে হাল ছাড়িয়া দিয়া, মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সৌম্যের দিদি করুণাময়ী বলিলেন—“সৌম্য বাজার থেকে খানিকটা মাংস আন্‌তে পারবি?”

“এক্ষুনি” বলিয়া সৌম্য এক নিমেষেই বাড়ী হইতে বেবী অষ্টিন গাড়ীখানা ঠেলিয়া বাহির করিয়া ষ্টার্ট দিয়া বসিল—

“পাগল ছেলের কাণ্ড দেখ”, বলিয়া করুণাময়ী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন—“কোথাকার মাংস। ক’সের আনতে হবে, কত দাম লাগবে, কিছু জিজ্ঞাসা করা নেই, অমনি ছুটলেই হোল।”

সৌম্য দেখিল সত্যই হিসাবে একটু ভুল হইয়া গিয়াছে, সে নামিয়া সকল জিজ্ঞাসা সমাধা করিয়া মোটর ছুটাইয়া বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার ব্যানার্জ্জীকে করুণা 'মাষ্টার মশাই বলিয়া ডাকিত। কারণ পাঠ্যাবস্থায় সেও নাকি, এককালে ইঁহারই ছাত্রী ছিলেন। আজ উভয়ের সম্বন্ধ নিকটতম হইলেও সকলের সম্মুখে স্বামীর নামের উল্লেখ করিতে হইলে তিনি পূর্ব্ব সম্বোধনই বজায় রাখিতেন।

কিশোর অতিশয় মেধাবী, তাহার উপর দরিদ্র বলিয়া মাষ্টার মহাশয় তাহাকে প্রথম হইতেই করুণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার শ্বশুর মহাশয়ের অনুগ্রহে তাঁহারই আশ্রয় লাভ করিয়া এই বালকটিই যে কলিকাতার মত সহরে থাকিয়া পাঠ্যজীবন সুরু করিবার অবকাশ পাইয়াছে, ইহা জানিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে পুলকিতই হইলেন। কিশোরকে তিনি শুধু দরিদ্র বলিয়াই জানিতেন, কোন দিন তাহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিবার সুযোগ হয় নাই, আবশ্যকও ছিল না। আজ সে তাহার শ্বশুরালয়ের গণ্ডীর ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে জানিয়া তিনি তাহার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ইতিহাস জানিয়া লইলেন। পরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়াও যথাসময়ে কলেজে ভর্ত্তি না হওয়ার দরুণ এক বৎসর নষ্ট করায় সে যে জলপানির প্রাপ্য নষ্ট করিয়াছে ইহার কাহিনী শুনিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অন্তরে যথেষ্ট দুঃখবোধ করিলেন।

মাষ্টার মহাশয়ের বাটীর ব্যবস্থা দেখিয়া কিশোর যেন কেমন একটু হতাশ হইল। চ্যাটার্জ্জী সাহেব আধা-বাঙালী, আধা-সাহেব। বাটীর ব্যবস্থাও তার দো-আঁশলা প্যাটার্ণের। ইংরাজী ব্যবস্থাও আছে। হিন্দুয়ানীরও অভাব নাই। বাটীর ভিতর মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী যেখানে সংসারের কর্ত্রী সেখানে পাতা পাতিয়া সকলে আহারে বসে, মাঝে মাঝে পুরোহিতের সাহায্যে সত্যনারায়ণের পূজাও হয়। বাটীর বাহিরে কিন্তু অন্যরূপ ব্যবস্থা। সেখানে চ্যাটার্জ্জী সাহেবের পিয়াদা, খানসামা এবং

বার্ব্ব,র্চ্চির দল তাঁহার সাহেবীয়ানা রক্ষা করিয়া চলে কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীটি সর্ব্বদিক দিয়াই অদ্ভুত ধরণের। অন্দরে ও বাহিরে করুণাময়ীই এখানকার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। বাড়ীতে একটি ভৃত্য ও একটি দাসী ছাড়া, রসুই করা ব্রাহ্মণের উৎপাত নাই। করুণাময়ী ও সৌম্য চ্যাটার্জ্জী সাহেবের প্রথম পক্ষের ছুটি ছেলে মেয়ে। তাঁহার প্রথমা পত্নী রত্নময়ী বহুকাল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান পত্নী মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে ইহারা তাঁহার সপত্নী সন্তান। সৌম্যই কেবল মাঝে মাঝে তাহার বিমাতাকে রাগাইবার জন্ত 'সৎমা' কথাটির উল্লেখ করিত। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী তাহা কখনও গায়ে মাখিতেন না। এই সৌম্য যখন ছুধের শিশু তখনই তাহার জননী-বিয়োগ হয়। তাহার পর মাতৃহীন বালকটিকে এমন করিয়া তাহার বিমাতা মানুষ করিয়াছিলেন যে জ্ঞান হইবার বহুকাল পরেও সে জানিতে পারে নাই যে তাহার জননী-বিয়োগ হইয়াছে।

সেই করুণাময়ী ধনীর কন্যা, স্বামীও রোজগার করেন কম নয় কিন্তু কেমন নিরহঙ্কারী। দেখিলে বুঝিবার উপায় মাত্র নাই, সাধারণ গৃহস্থ বধূ অপেক্ষা ইহার আচারে-ব্যবহারে বিন্দুমাত্র আভিজাত্যের জৌলুষ আছে।

বাটীখানির দিকে তাকাইলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। সামনে ছোট্ট একটী মাঠ, তার চারিদিকে বেশীর ভাগই দেশী ফুলের গাছ। সামনের ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাষ্টার মহাশয়ের বসিবার ঘর। এককোণে একটি টেবিল ও লিখিবার চেয়ার। মাষ্টার মহাশয় তাহা কদাচিৎ ব্যবহার করেন। বাটীতে যতক্ষণ থাকেন, দিবসের অবশিষ্ট সময় তিনি ঘরের ঢালা ফরাসটিতে শুইয়া বসিয়া কাটাইয়া দেন। বাটীর যে দিকেই চোখ যায়, আসবাবের বাহুল্য নাই, যে ছু'চারটি আছে তাহা গৃহের শোভা বর্দ্ধনই করিয়াছে, অনাবশ্যক বাহুল্য প্রকাশ করে নাই।

ছোট্ট একতলা বাড়ী। বসিবার ঘরখানি পার হইলেই একটি বারান্দা বাটীর তিনদিক ঘিরিয়া প্রসারিত হইয়াছে। ভিতরে একটি ছোট্ট উঠান, মধ্যে তুলসীমঞ্চ। পাশে স্নান করিবার কল ও কলঘর। এবং বারান্দারই একটি ধারে করুণাময়ীর রান্না করিবার জায়গা। কাঠের খড়খড়ি দিয়া তাহার তিন দিক বন্ধ! ভিতরের উঠানের চারদিকে উঁচু প্রাচীর ও খিড়কী দরজা। সুতরাং আলো ও রৌদ্র প্রচুর পরিমাণে আসিলেও রাস্তা হইতে বাটীর ভিতর দেখা যায় না। সুতরাং আবরু নষ্ট হইবার যো নাই।

ভিতরে তিনখানি শোবার ঘর একখানি ভাঁড়ার ও একখানি পূজার ঘর লইয়া মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীটি সম্পূর্ণ। দালানের ধারে ধারে গোটা দশ বারো বইয়ের আলমারী, কাপড় রাখিবার আলনা। এমন সুন্দর পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা আছে যে, সেদিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র একটা স্নিগ্ধ শ্রীতে অন্তর ভরিয়া উঠে। কোথাও ধূলা লাগিয়া নাই, আলমারীর কার্ণিস বা পিছনে পর্য্যন্ত একবিন্দু ময়লা খুঁটিয়া পাইবার উপায় নাই। মনে হয় যেন তাহা নিয়তই ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হয়।

চারিদিকের যে পরিপূর্ণ শ্রী লইয়া মাষ্টার মহাশয়ের এই ছোট্ট গৃহখানি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে নবকিশোরের বুঝিতে বাকী রহিল না করুণাময়ী শুধু নারী নয়—সত্যই লক্ষ্মী। মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই তিনি সুখী কি দুঃখী। দিন রাত তিনি শুধু তাঁহার কলেজ লইয়া, ছাত্র লইয়া, পরীক্ষার খাতা লইয়া এবং পাঠ্যপুস্তক লইয়া মশগুল হইয়া থাকেন। আর করুণাময়ীকে দেখিলে মনে হয় যেন করুণাময়ী নামটি সার্থক করিবার জন্যই এ ধরাধামে তিনি জন্ম লইয়াছেন। শান্তি ও আনন্দ, স্নেহ ও করুণা বিতরণ করিবার জন্যই তাঁহার জন্ম।

চ্যাটার্জ্জী সাহেবের পরিবারে ছেলেমেয়ে সকলেই শিক্ষিত।..কিশোর শুনিয়াছিল করুণাময়ী বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সন্তান পালন বা সাংসারিক অভিজ্ঞতা ছাড়া তাঁহার অপর কিছু বিদ্যা-জ্ঞান আছে।

চ্যাটার্জ্জী সাহেবের জামাতা কলিকাতায় বিজ্ঞানের এক্ষণে একজন নামজাদা অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ব্যবহারিক রসায়ণের মৌলিক গবেষণা করিয়া ডি-এস-সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সরকারী কলেজে উচ্চ বেতনের অধ্যাপকের পদ পাইলেও স্বেচ্ছায় তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে প্রাইভেট কলেজে অধ্যাপনা করাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

লেখাপড়া ছাড়া অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র যে কখনও আর কিছু ভাবেন, দেখিলে তাহা মনে হয় না। আহার বিহারাদি সম্বন্ধে খবর দালালী ছাড়াও, সময়ে ক্ষৌর কর্ম্ম, বেশ পরিবর্ত্তনাদি ব্যাপারে করুণাময়ীকে নিয়তই এই আপন-ভোলা অধ্যাপকটিকে সজাগ রাখিতে, তাহার দিবসের খানিকটা সময় ব্যয় করিতে হয়।

যোগেশচন্দ্র ও করুণাময়ীর একটি মাত্র পুত্র সন্তান আজ তৃতীয় বর্ষে পড়িয়াছে। ইহাই তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর নয়নের নিধি। সৌম্য স্ব-ইচ্ছায় তাহার নাম করিয়াছে ‘ললিত চন্দ্র’, আদর করিয়া সকলে তাহাকে ‘লালু’ বলিয়া ডাকে। অধ্যাপক জীবনে যোগেশচন্দ্রের পাঠানুরাগ ও সাধনার মধ্যে আজ এক বৎসর হইতে এই ক্ষুদ্র শিশু যা কিছু ওলোট-পালোট সুরু করিয়াছে। বস্তুত এইখানেই যোগেশচন্দ্রকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। অপরাধ করিলে তিনি ছাত্রদের তিরস্কার করিতে জানেন, শাস্তি দিতে জানেন, করুণাময়ী স্নান আহারাদি বিষয়ে বিরক্ত করিলে

তিনি স্বাগ্র করিতে জানেন, কিন্তু ক্ষুদ্র লালুর শত অত্যাচার, শত জ্বালাতনেও তাহাকে নিবৃত্ত করিবার ভাষা তিনি খুঁজিয়া পান না। যোগেশচন্দ্র যখন পরীক্ষার খাতা দেখে, লালু তখন পাশে বসিয়া অপরিক্ষীত খাতাগুলি নির্ব্বিবাদে চর্ব্বণ করিতে সুরু করে। শেষে যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টি পড়িতে তিনি দেখেন, মুখের লালা ও দন্তাঘাতের চিহ্নে তাহা একেবারে কার্য্যের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তখন অগত্যা লালুকে কোলে তুলিয়া করুণার নাম ধরিয়া হাঁক ডাক করিয়া এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাকে মাতার হেফাজতে রক্ষা করিয়া তবে আরব্ধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার অবকাশ পান। যে হতভাগ্য ছাত্রের অপরিক্ষীত খাতার উপর দিয়া শ্রীমান লালুর দস্যুবৃত্তি সম্পূর্ণতা লাভ করে, সে বেচারী অবশ্য তাহার জন্য দণ্ডভোগ করে না। যোগেশচন্দ্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাকে বেশ ভাল নম্বর দিয়াই পাশ করাইয়া দেন। লালু আসিতে আজকাল এই বে-হিসাবী, শৃঙ্খলাহীন মানুষটিকে সাবধান করিবার একটা সহজ উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায়, করুণাময়ী মনে মনে খুসীই হইয়াছেন।

সৌম্য Bengal Technical Instituteএ পড়ে। পড়াশুনায় তাহার কোনদিনও খোঁজ নাই, ভালও লাগে না, বাপ মা ও দিদির অত্যাচারে কলেজে যাইতে হয়, যায়। ইহা অপেক্ষা, আজ কোথায় ফুটবল খেলা হইবে, ক্রিকেট ম্যাচ ও হকি টুর্ণামেণ্ট হইবে, কোথায় কোন ভাল বায়োস্কোপ আসিয়াছে, ইহারই তত্ত্ব রাখিতে তাহার সময়গুলি কাটে ভাল। সৌম্য চঞ্চল, সৌম্য অস্থির। দোষ করিয়া তিরস্কৃত হইলে সে মুখভার করিতে জানে না। সেই দণ্ডেই দোষ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে। আবার দুই দিন যাইতে না যাইতে সেই অপরাধই করিয়া বসে। তিরস্কৃত হইলে সে দুঃখ প্রকাশ করে না, কথা বলিয়া, সেই দণ্ডেই পালন

করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, আবার সে প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিতেও সে কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করে না—এমন মানুষকে বকিয়া-ঝকিয়া কি হইবে। তথাপি হাজার অপরাধ করিলেও সৌম্যকে সবাই ভালবাসে। সৌম্যের ভিতরে যে প্রাণ আছে, যৌবন-দেবতা তাহার স্বভাব ধর্ম্মে তাহাকে ঘিরিয়া যে উদ্দাম-লীলা সুরু করেন—তাহারই ছোঁয়াচ লাগিয়া সারা-গৃহ আনন্দ চঞ্চল হইয়া উঠে। সৌম্য একদিন কলেজে না আসিলে তাহার বন্ধুরা ভাবে আজ ক্লাসটাই বৃথা গেল, বড়দিদির যতটুকু আশা, যতটুকু আকাঙ্ক্ষা, সবটুকু যেন সৌম্যকে ঘিরিয়াই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে চাহিত। এই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ছেলেটী কখন কি করিয়া বসে—তাহার বিমাতাকে সর্ব্বদাই সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। তাহাকে পড়াইবার জন্য দুইজন মাষ্টার আছে, কিন্তু তাহার উপর সত্যকারের মাষ্টারী করিতে পারিত, একমাত্র তাহার বিমাতাই।

শ্রীমান্ লালুর মুখে যখন আধ আধ ভাষায় কাকলী ফুটিল, তখন সর্ব্বপ্রথম সে যে কথাটি উচ্চারণ করিল, তাহা হইতেছে—মামু।

তাহার পর হইতেই শ্রীমান্ লালুর সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জন হইল তাহার মামু—সৌম্য!

লালু বোধ করি তাহার বাবা-মাকে না দেখিলেও ঠাণ্ডা থাকিতে পারিত, কিন্তু দিনান্তে একবার তাহার এই ছোট্ট মামুটির কোলে না উঠিলে সে অস্থির হইয়া উঠিত।

তাই আজকাল সৌম্যের একটা কাজ বাড়িয়াছে। কলেজের রুটিন সে কোনদিন মানিত না, গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিত না। কিন্তু শত কর্ম্ম, শত কার্য্যের মধ্যেও, শ্রীমান্ লালুর দিনান্তে একবার করিয়া খবর দালালী করা তাহার জীবনে সেই প্রথম যেন বাঁধা রুটিনের সামিল হইয়া দাঁড়াইল।

নবকিশোর সেদিন তাহার মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে বড় আনন্দেই আহার সমাধা করিল। আহারের উপকরণ সামান্য এবং আহারীয় বস্তু অপ্রতুল হইলেও ক্ষতি ছিল না। অন্তর যার নিত্য সুধার ভাণ্ডার, সে হাতে করিয়া ক্ষুদ তুলিয়া দিলেও ভোক্তার মুখে তাহা অমৃত বলিয়াই অনুমিত হয়। করুণাময়ীর হাতে বাড়া অন্নের প্রতি কণাটি পর্য্যন্ত আজ নবকিশোরের কাছে মধুময় হইয়া উঠিল।

সৌম্য লালুকে কোলে করিয়া আহারে বসিল। সে কতক লালুর মুখে দিল, কতক নিজে খাইল, কতক বা চারিদিকে ছিটাইয়া ফেলিল।

মাষ্টার মহাশয় আহারের সময় কথা বলেন কম, নির্ব্বিবাদে খাইয়া যান। কোনটি ভাল লাগিল, কোনটি লাগিল না এবং কোনটি ফুরাইলে কতখানি দিতে হইবে, তাহার হিসাব মাষ্টার মহাশয় বড় একটা রাখিতেন না, বোধ করি সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু করুণাময়ীকে সেদিকে হুঁস রাখিয়া চলিতে হইত। তাই মনের ভুলে হয় ত' পরীক্ষা বা ছাত্রদের কথা ভাবিতে ভাবিতে, আধ-পেটা আহার করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের উঠিবার উপায় ছিল না। করুণাময়ীর ছাড়পত্র ছাড়া আহারাদি বিষয়েও মাষ্টার মহাশয়ের স্বাধীনতা ছিল না।

সৌম্য জানে, বাহিরে জামাইবাবু ছাত্রদের উপর মাষ্টারী করিলেও অন্দরে তাহার উচ্চবাচ্য করিবার উপায় নাই। এখানে দিদিই তাহার মাষ্টারের উপর মাষ্টার। যোগেশচন্দ্র তাই মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিলেও তাহার ইহ-সংসারে কাহারও নিকট নালিশ করিয়া সুবিচারলাভ করিবার উপায় নাই। .তাই, এ আপীলহীন আদালতে, হাকিমের হুকুমের উপর নির্ভর করিয়াই, তাঁহাকে নির্ব্বিবাদে মুখ বুঁজিয়া দিন কাটাইতে হয়, এ রাজ্যে সৌম্যই একমাত্র সুখী। সংসার পরিচালনা ব্যাপারে তাহার দিদির শাসন-দণ্ড এইখানেই নিশ্চল হইয়া আছে। গৃহস্বামিনী ও

গৃহস্বামীকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া সে পাগল করিতে জানে, কিন্তু নিজে ধরা দিয়া কখনও পরাভব স্বীকার করে না। সৌম্যকে জব্দ করিতে পারে না বলিয়া করুণাময়ীর মনেও খানিকটা গ্লানি আছে! তাই এ বিজয়িনী নারীর পরাভবের দুঃখ দেখিয়া মনে মনে বিজেতা যোগেশচন্দ্র তৃপ্তিই পাইতেন। অন্ততঃ একজনের কাছেও যে করুণাময়ীর দম্ভ সকল দিক দিয়া হার স্বীকার করিয়াছে—অধ্যাপক যোগেশচন্দ্রের ইহাতেই আনন্দ।

নিতান্ত অনিচ্ছায়, অপ্রত্যাশিত ভাবে, নবকিশোর আজ এই বন্ধনের মধ্যে মাথা গলাইল। সে দরিদ্র, উপেক্ষা করিবার শক্তি তাহার নাই। কিন্তু অযাচিত অনুগ্রহের উপরেও তার প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু আজ সে চ্যাটার্জ্জী সাহেবের পরিবারের মধ্যে অলক্ষিতে প্রবেশ করিয়া, ধীরে ধীরে যেভাবে শাখাপল্লব বিস্তার করিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া তাহার অন্তর শঙ্কিতই হইল। এমনি ভাবে বাঁধাবাঁধি করিতে, তাহার খুড়ীমা কৃষ্ণপ্রেয়সীও তাহাকে একদিকে আটকাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার উপর করুণাময়ী। নবকিশোর তাহার কথা যতই ভাবে, কোন দিক দিয়াই কিনারা করিতে পারে না। কতটুকুই বা তিনি তাহার দেখিয়াছেন, আর কতটুকুই বা জানেন? তথাপি যেন মনে হয়, অতুলনীয়া বুদ্ধিমতী এই নারী, যেন নিমেষেই তাঁর অন্তরের সমস্ত অংশটুকু দর্পণের মত দেখিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার আকর্ষণ যে কতখানি, নবকিশোর তাহা স্বীকার না করিলেও, সে তাহার বিবেককে ঠেকাইতে পারিল না। মূর্খ সৌম্য যাহা আকণ্ঠ পাইয়াও পান করিতে জানিল না, নবকিশোর বোধ করি আজ তাহারই এককণা পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল।

আহারান্তে বিদায় লইবার সময় সৌম্য তাহার বড়দিদিকে শুনাইয়া বলিল—"নবুদা আবার রোব্‌বারে আসবে বড়দি'।"

বড়দিদি হাসিয়া বলিলেন—"শুধু রোববারে কেন, তোমার নবুদা' ত' রোজই আসতে পারেন।"

নবকিশোর মনে ভাবিল আজ যে পুণ্যতীর্থের সে যাত্রী হইল, রোজই হয় ত' এখানে আসা, কিছুই বিচিত্র নয়। কয়েক হপ্তা হইতে তাহার জীবনাংশে যে ভোজবাজী সুরু হইয়াছে, তাহার রেশ্ কোথায় গিয়া সমাপ্তি লাভ করিবে, সে নিজেই তাহার কিছু জানে না।

বিদায়ের পূর্ব্বে সে তাহার অধ্যাপক মহাশয় এবং অধ্যাপক-পত্নীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। মাষ্টার মহাশয় তাহাকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বই দু'খানি দিলেন এবং বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যখনই তাহার কোন কিছু বিষয়ে বুঝিবার আবশ্যক হইবে, সে যেন নিশ্চয় এখানে চলিয়া আসে।

বন্ধুবর অরুণকুমারের সুপারিশে, মিষ্টার বোসের কন্যা মাধুরীকে পড়াইবার যে কার্য্যটি সম্প্রতি নবকিশোর যোগাড় করিয়াছে, তাহা সে যথানিয়মে প্রত্যহই নির্ব্বিচারে সমাধা করিতে লাগিল। নবনিযুক্ত শিক্ষকের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সময়ানুবর্ত্তিতার পরিচয় পাইয়া মনে মনে মাধুরীর পিতা খুসীই হইলেন।

নবকিশোর দেখিল, মাধুরী বয়সে নিতান্ত বালিকা হইলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। ছাত্রী উপযুক্ত হইলে শিক্ষকের পড়াইয়াও আনন্দ। মাধুরীকে শিক্ষাদান কার্য্যে নবকিশোরের সেই আনন্দই লাভ হইল। পাঠ্য-বিষয় একবার বুঝাইয়া দিলে মাধুরী তাহা সহজেই বুঝিতে পারে। নবকিশোর তাই স্কুলের নির্দ্ধারিত পাঠ্য-বিষয় ছাড়াও মাধুরীকে, অনেক নূতন নূতন বিষয় শিখাইতে লাগিল। বালিকা বেশ ভাল অঙ্ক কষিতে পারে, নবকিশোর তাহাকে মন দিয়া শক্ত শক্ত অঙ্ক শিখাইতে লাগিল।

স্কুলের পাঠ সাঙ্গ হইলে, কখনও কখনও তাহাকে ইতিহাসের বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিষয় গল্প করিয়া বুঝাইত। মাধুরী গল্প শুনিতে বড় ভালবাসে। স্কুলের নির্দ্দিষ্ট পাঠ সাঙ্গ হইলে, মাষ্টার মহাশয়ের মুখে গল্প শুনিয়া সে বিশেষ পুলকিত হইত।

ইতিমধ্যে নবকিশোর একদিন চ্যাটার্জ্জী সাহেবের বিশেষ একটি কাজে ব্যস্ত থাকায় মাধুরীকে পড়াইতে আসিতে পারিল না। পরদিন আসিতেই মাধুরী বলিল—"দাদা, কাল যে এলেন না বড় ?"

বালিকার মুখে দাদা সম্বোধন শুনিয়া নবকিশোর চমকিত হইল। আজকাল প্রায়ই সম্বোধন করিবার আবশ্যক হইলে মাধুরী তাহাকে দাদা বলিয়া থাকে। নবকিশোর তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু কেন? সে ত' সত্যই বালিকাটির শিক্ষক। ইহাদের সহিত এমন কিছু ঘনিষ্ঠতা জন্মিবার কোন কারণই ত' ঘটে নাই। নবকিশোর সেদিন আর কৌতুহল দমন করিতে পারিল না। এই ভাবে সম্বোধন করিবার কারণ কী তাহা বালিকাটিকে শুধাইল। মাধুরী জানাইল তাহার দাদা তাহাকে 'নবুদা' বলিয়া ডাকিতে বলিয়া দিয়াছেন।

মাধুরীর দাদার কথা উঠিতেই নবকিশোর বলিল—"কই তাঁকে ত' একদিনও দেখতে পাইনে।"

মাধুরী বলিল—"আপনি পড়িয়ে ফেরবার পর তিনি আসেন।"

নবকিশোর সাত পাঁচ কী ভাবিতে ভাবিতে তাহাকে পড়াইতে সুরু করিল।

আজকাল কলেজে গেলেই অরুণ নবকিশোরকে তাহার নূতন ছাত্রীটীর কথা জিজ্ঞাসা করিত। সে প্রত্যহ পড়াইতে যায় কী না, কতক্ষণ পড়ায়, কখন ফেরে সব খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া প্রশ্ন করিত। নবকিশোরও যথাসম্ভব উত্তর দিত।

একদিন কী ভাবিয়া নবকিশোর বলিল,—"আপনিও ত' তাঁদের পরিচিত, তবে আপনি মাঝে মাঝে সেখানে যান না কেন ?"

অরুণ নবকিশোরের প্রশ্নে হাসিয়া জবাব দিল—"সময় হয় না।"

একদিন মাধুরীকে পড়াইতে পড়াইতে নবকিশোর শুনিল, পাশের ঘরে মিষ্টার বোস অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে একজনকে বলিতেছেন—"বাবা অণুকে আজ বিকেল বেলা বোর্ডিং থেকে নিয়ে এস।" দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রশ্নের জবাবে জানাইল—"আচ্ছা।"

নবকিশোর জবাবদাতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সন্দিগ্ধ হইল। ইহা ত' অরুণেরই কণ্ঠস্বর। সে আর কৌতুহল দমন করিতে পারিল না। তাহার ছাত্রীকে শুধাইল—"ও ঘরে কে মাধু ?"

"বাবা, আর বড়দা'।"

"তোমার বড়দা'র নাম কী বল দেখি ?"

মাধুরী এবার মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া ফেলিল। সে জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পরে নবকিশোর দেখিল, সত্যই অরুণ যেন পলাতকের মত ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া পাশের দরজা দিয়া বাহির গেটের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

"অরুণ, অরুণবাবু।" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেই অগত্যা বাধ্য হইয়া অরুণকে থামিতে হইল। নবকিশোর অরুণকে গেটের কাছে গিয়া গ্রেপ্তার করিল।

"বড় যে সাড়া না দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন—"

অরুণ বলিল—"মিষ্টার বোস ডেকেছিলেন, তাই একটা কথা শুনতে এসেছিলুম।"

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—"মিষ্টার বোস ডেকেছিলেন না বাবা

ডেকেছিলেন ?” প্রশ্নের রকম শুনিয়া অরুণ ও মাধুরী উভয়েই হাসিয়া ফেলিল।

“এই হতভাগা মেয়েটা বুঝি বল্লে ?” বলিয়াই অরুণ মাধুরীর পৃষ্ঠে একটি কীল বসাইয়া দিল।

মাধুরী কীল খাইয়া বলিল—“বারে, আমি কোন দিন নবুদা'কে তোমার নাম বলেছি, তুমিই ত' ও ঘরে বাবার সঙ্গে জোরে জোরে কথা কইতে গেলে।”

অনেক দিনের একটা গুপ্ত রহস্য হঠাৎ নিজেরই দোষে ফাঁস হইয়া গেল দেখিয়া অরুণকুমার এবার কতকটা লজ্জিত হইল।

নবকিশোর এবার সুযোগ পাইয়া বলিল—“ছোট বোনটিকে দাদা বোল্‌তে শিখিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু নিজের বাপকে বাবা বোলতে শেখেন নি।”

অরুণ বলিল—“বাপকে আমি কোন দিনই বাবা বলি না, বাবাই আমাকে বাবা বলে, বিশ্বাস না হয় মাধুকেই জিজ্ঞাসা করুন।”

ভাই-বোনের মধুর কলহ সেদিন এখানেই নিষ্পত্তি হইল। নবকিশোর সেদিন বিদায় লইবার পূর্ব্বে মাধুরীকে খানিকটা সস্নেহ তিরস্কার করিল। বলিল—“তাহার দাদার পরিচয়টা বহু পূর্ব্বেই জানানো উচিত ছিল।”

যাইবার পূর্ব্বে সেদিন মিষ্টার বোস নবকিশোরকে একখানা বন্ধ করা খাম দিলেন। নবকিশোর সেখানা কোন দরকারী চিঠি ভাবিয়া পকেটে করিয়া বাড়ী লইয়া আসিল। বাড়ী আসিয়া খাম খুলিয়া দেখিল, তাহার ভিতর দশ টাকা ও পাঁচ টাকার একখানি করিয়া নোট ও তাহারই সঙ্গে পিনে আঁটা এক খণ্ড কাগজে পরিষ্কার করিয়া লেখা আছে—“মাধুরীর মাষ্টার মহাশয়ের পারিশ্রমিক, মাসিক ত্রিশ টাকা হিসাবে পনের দিনের পনের টাকা।

নবকিশোর বুঝিল, সে মাসের মাঝ হইতে মাধুরীকে পড়াইতে সুরু করিয়াছিল, তাই মাস অন্ত হইতেই, অদ্য মিষ্টার বোস তাহাকে পনের দিনের বেতন দিয়াছেন।

এই শিক্ষকতা ব্যাপারে অরুণের লুকোচুরী, তাহার উপর এই বেতন প্রাপ্তিতে নবকিশোর তাহার বন্ধুর উপর বিলক্ষণ চটিয়া গেল। ইহা তাহার কৃতকর্ম্মের ন্যায্য পুরস্কার কিম্বা অনুগ্রহ নবকিশোর তাহা অনুধাবন করিতে পারিল না। গোড়া হইতে অরুণ তাহার ভগ্নীর কথা গোপন না রাখিয়া এই কার্য্যটি দিলে সে কী অস্বীকার করিত। কিন্তু অরুণ এমন সব লুকাইয়া রাখিল কেন? কলেজে সেই তার একমাত্র অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। এ কয়দিনের ঘনিষ্ঠ মেশামেশিতে তাহাদের ভিতরে যথেষ্ট সদ্ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল।

সেদিন নবকিশোরের মনটা কেমন যেন অস্থির হইয়া উঠিল। কলেজের পড়া তাহার ভাল লাগিল না। শেষ এক ঘণ্টার লেকচার না শুনিয়াই, সে অরুণের হাতে একখানা বন্ধ চিঠি দিয়া, কোন মতে বাড়ী চলিয়া আসিল।

অরুণ চিঠিখানা খুলিতেই তাহার মধ্যে দু'খানি নোট ফেরৎ পাইল সঙ্গে একখানা পত্র। নবকিশোর সেই পত্রে অরুণকে মাত্র দুই ছত্র লিখিয়াছে :—

"পিতাঠাকুর মহাশয়কে বলিবেন, ছোট ভগ্নীকে পড়াইয়া বড় ভায়ের অর্থ গ্রহণ করিবার রীতি নাই।"

তার পর দিন কলেজে আসিলে অরুণ নবকিশোরকে একটু একান্তে পাইয়া তাহার দুটি হাত ধরিয়া বলিল—"মাধুকে যখন ছোট বোন বোলেচ আমি তখন তোমার ভাই। রাগ কোরে টাকা ফেরৎ দিয়েচ, কিন্তু রাগ কোরে যেন পড়ানো বন্ধ কোরো না ভাই।"

অরুণের একটা কথাতেই নবকিশোরের সব অভিমান কাটিয়া গেল শেষে আবার নিয়মিত মাধুরীকে পড়াইতে লাগিল।

নবকিশোর আজকাল কৃষ্ণপ্রেয়সীকে খুব ঘন ঘন পত্র দেয়। দু'চার দিন যাইতে না যাইতেই গ্রামের ডাক-হরকরার আগমন-প্রতীক্ষায় কৃষ্ণপ্রেয়সীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিত।

নবকিশোর আজকাল পত্রযোগে কৃষ্ণপ্রেয়সীকে অনেক কথাই গুছাইয়া লেখে। যে নবকিশোর কাছে থাকিলে কথাটি পর্য্যন্ত কহিতে জানিত না, প্রশ্ন করিলে মাত্র তাহারই জবাব কোন গতিকে দিত, সে আজ দূরে থাকিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সীকে বড় বড় চিঠি লেখে। চিঠি পাইয়া কৃষ্ণপ্রেয়সীর অন্তর আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। সে ভাবিয়াছিল বেচারী নবু বিদেশে গিয়া কত কষ্টই না পাইবে। হয় ত' সময়ে তাহার আহার হইবে না, কোন কিছুর জন্য অভাব বোধ করিলে কেহ জিজ্ঞাসা মাত্র করিবে না। হঠাৎ অসুস্থ হইলে কাছে বসিবার কাহাকেও পাইবে না। কিন্তু তাহা ত' হইল না। নবুকে যে সবাই ভালবাসিতে সুরু করিয়াছে। সৌম্য নামে তাহার একটি দুরন্ত ছোট ভাই মিলিয়াছে। সহপাঠী অরুণ তাহাকে ঘনিষ্ঠতার আবরণে বাঁধিয়াছে। অধ্যাপক মহাশয়ের পড়ার প্রতি অযাচিত অনুগ্রহ। অধ্যাপক-পত্নী তাহার বড়দিদির স্থান অধিকার করিয়াছে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। নবকিশোর অবকাশ পাইলেই তাহার এ বিদেশের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনীগুলি অকপটে কৃষ্ণপ্রেয়সীর গোচর করে। কৃষ্ণপ্রেয়সী পড়িয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে থাকে। নবু তাহা হইলে বিদেশে গিয়া বেশ সুখে শান্তিতে পড়াশুনা করিতেছে।

নবুর মত ছেলেকে যে দেখিবে, সে-ই ভালবাসিবে। তাহাকে অবহেলা করিবার উপায় নাই—আহা সে ভাল থাকুক, এমনি চিরটাকাল

সকলের আদর কাড়িয়া পরকে আপন করিয়া, আপনাকে পরের জন্য নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া বড় হইয়া উঠুক—দিনরাত তার ইষ্টদেবতার চরণে কৃষ্ণপ্রেয়সী এই প্রার্থনাই জানাইতেন। শ্রীধর মাঝে মাঝে স্ত্রীর নিকট নবকিশোরের খোঁজ লইতেন এবং সে ভাল আছে এবং ভালভাবে পড়াশুনা করিতেছে জানিতে পারিলেই সুখী হইতেন।

কৃষ্ণপ্রেয়সী লেখাপড়া না জানিলেও একেবারে বর্ণহীন নিরক্ষরা ছিলেন না, কোন প্রকারে জোড়াতালি দিয়া মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করিতে জানিতেন। সে পত্রের পাঠ উদ্ধার করা অবশ্য সকলের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু নবকিশোর তাহা পারিত। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেয়সীর মনে প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও সে নবকিশোরের মত বড় বড় পত্র লিখিতে পারিত না। মসী ও লেখনীর সহিত দু' তিন ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়া সে কোন প্রকারে যে পত্রখানি খাড়া করিত—তাহাতে দু' চারিটি মামুলী খবরাখবর ছাড়া, মনের কথা প্রকাশ পাইবার সুযোগ পাইত না। কিন্তু সে অপটু হস্তের রচনা-ভঙ্গীর মাঝে, নবকিশোর কৃষ্ণপ্রেয়সীর অন্তরখানি দর্পণে প্রতিবিম্বের মত দেখিতে পাইত।

সে ভাবিত খুড়ীমা শিক্ষিতা হইলে, ভালমত লেখাপড়া জানা থাকিলে তাহার সহিত পত্রযোগে মনের কথা কেমন অকপটে আদান প্রদান করিতে পারিত। তথাপি কৃষ্ণপ্রেয়সীর অক্ষমতায় নিরুৎসাহ হইত না। সে জানিত যতটুকু পাইয়া সে খুসী হইয়াছে, ঠিক ততটুকু দিয়া তাঁহাকে খুসী করা যাইবে না। অন্তরে যাহার একবার বোধনের বাদ্য সুরু হইয়াছে, সামান্য কাঁসর-ঘণ্টার রোলে তাহার তৃপ্তি হওয়া সম্ভব নয়। তাই কৃষ্ণপ্রেয়সীর অক্ষম অপটু হস্তের রচনা, সহস্র বর্ণাশুদ্ধি অতিক্রম করিয়াও নবকিশোর অন্তরে যেটুকু আনন্দের খোরাক জোগাইত, কৃষ্ণপ্রেয়সী তাহারই বিনিময়ে সাতপাতা চিঠি পাইয়াও যেন সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারিত

না। যে চিঠি একবার পড়িলে কিশোরের আদ্যপান্ত মুখস্ত হইয়া যায়, শতবার পড়িলেও আর একজনের অন্তরে তাহারই মাধুর্য্য চিরনূতন হইয়া রহিল। তাই কৃষ্ণপ্রেয়সীর আজকাল চিঠি লেখার কাজ যত না বাড়িয়াছে, চিঠি পড়ার কাজ বাড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ! দিবসের সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য অন্তে নিত্য অভ্যাস মত সে যখন পুরানো কৃত্তিবাসী রামায়ণখানা খুলিয়া বসিত—তখন দেখিত তাহারই ছত্রে ছত্রে, পত্রে পত্রে, ভাষায় ভাষায়, হরফে হরফে কিশোরের পত্রখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে—পুরাণের সে পুণ্যকাহিনী কোন্ অতীতের কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছে।

কি অপ্রত্যাশিত ঘটনার মধ্য দিয়া, নবকিশোরের সহিত অনিমার সাক্ষাৎ ও পরিচয় সাঙ্গ হইল।

অনিমা মাধুরীর বড় ভগ্নী এবং অরুণের দুই এক বৎসরের কনিষ্ঠ।

বড়দিনের ছুটিতে স্কুলের বোর্ডিঙ হইতে বাড়ী আসিয়া অনিমা মাধুরীর মুখে তাহার নূতন মাষ্টার মহাশয়ের পরিচয় পাইল। দাদার টেবিলের উপর দেখিল নবকিশোরের হাতের লেখা একখানি খাতা, নবকিশোর যাহাতে ইতিপূর্ব্বে কাব্য সম্বন্ধীয় একখানি পাঠ্য-পুস্তক কপি করিয়াছিল।

অরুণের পিতা সেদিন অফিস হইতে গৃহে ফিরিলে সে টাকা সমেত খামখানি নিবারণবাবুকে ফিরাইয়া দিল।

"ব্যাপার কি অরুণ?"

"সে ঐ খামখানি দেখলেই বুঝতে পারবে।"

অনিমা খামখানি লইয়া খুলিতেই টাকা চিঠি উভয়ই বাহির হইয়া পড়িল। দ্বিতীয় প্রশ্নের আর দরকার হইল না, রহস্য আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িল।

নিবারণবাবু হাসিয়া বলিলেন—"তুই জোচ্চুরি কোরতে গেলি কেন?"

অরুণ বলিল—"এখানে পড়াবার কথা বোললে সে মাষ্টারী নিতে কখনও রাজী হোত না।"

দাদার প্রশ্ন শুনিয়া অনিমা বলিল—"তবে বিনা পারিশ্রমিকে তার অনুগ্রহই বা আমরা নেব কেন?"

অরুণ বলিল—"মাধুরীটা দাদা বোলে ডেকেই সব গোলমাল কোরে দিলে নইলে হয় ত' এ টাকা ফিরিয়ে দিতে পারত না।"

অনিমা বলিল—"দাদা, তুমি তোমার বন্ধুকে ডেকো। আমি এ টাকা তাকে ফিরিয়ে দেব।"

"তুই পারবি?"

"না পারি অন্ততঃ চেষ্টা কোরে একবার দেখব।"

ঠিক এই ঘটনার পর নবকিশোরের সহিত অনিমার সাক্ষাৎ হইল। আজকাল নবকিশোর পড়াইতে আসিলে অরুণের অন্যত্র যাইবার আবশ্যক করে না।

নবকিশোর তখন মাধুরীকে পড়াইতেছিল। ইতিহাসের ক্ষুদ্র একটি গল্প বুঝাইতে বুঝাইতে নবকিশোর এমনি তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিল যে, সেখানে হঠাৎ একটি অপরিচিতার সহিত অরুণ প্রবেশ করিয়াছে—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা জানিতেও পারিল না।

অনিমা জানিল ইনিই নবকিশোর। গায়ে তার জামা ছিল না, একটি মোটা খদ্দরের চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। মুখে কি অপরিসীম স্নিগ্ধ কান্তি, চোখ দিয়া যেন প্রতিভার জ্যোতি ঠিকারিয়া পড়িতেছে। কেমন করিয়া এ ছেলেটি পড়াইতেছে, কি অপূর্ব্ব এর পদ্ধতি, কথাগুলি যেন হৃদয়ের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিতেছে। অনিমা তাহার দাদাদের দেখিয়াছে, দাদার অনেক বন্ধুদের দেখিয়াছে কিন্তু ইতিপূর্ব্বে বোধ করি এমন ধারা কোন যুবকের পরিচয় পায় নাই। সে সুপুরুষ, তার দাদাও

সুন্দর দেখিতে। কিন্তু কেমন করিয়া বেশভূষা করিলে, প্রসাধন করিলে, মুখখানি ঘসিয়া মাজিয়া পরিচ্ছন্ন করিলে তাহা মানায় ভাল, Smart বলিয়া মনে হয়—এ ছেলেটি দেখিতেছি তাহার কিছুই জানেনা। আগাগোড়া সমান করিয়া চুল ছাঁটা। চুলে বোধ করি কখনও চিরুণী পড়ে না। বেশভূষায় বাহুল্য মাত্র নাই। গায়ে জামাটি পর্য্যন্ত দিতে ভুলিয়াছে। তথাপি সে ত' অপরিচ্ছন্ন নয়। পরিষ্কার কাপড়খানি পরিয়াছে। শুভ্র খদ্দরের উত্তরীয়খানি সারা গায়ে আঁটিয়া বসাইয়াছে। দরিদ্র সে ত' নিশ্চয়ই কিন্তু ধনীদের লজ্জা দিবার জন্যই বোধ করি এ বেশ। সম্পূর্ণ সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। কোন দিকে দৃষ্টি দিবারও বোধ করি ইহার অবসর নাই। অনিমা মনে মনে পীড়িতা হইল।

"নবু ?"

নবকিশোর চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল—অরুণ ও আর একটি অপরিচিতা তন্বী। অনুমানে বুঝিল অরুণেরই ভগ্নী।

খানিকটা সঙ্কোচ আসিলেও—"আসুন, আসুন" বলিয়া সে একটু সরিয়া গিয়া ইহাদের বসিবার স্থান করিয়া দিল। নবকিশোরের সহিত দৃষ্টি মিলিতেই অনিমা দুই হাত জড়ো করিয়া নমস্কার করিয়াছিল। নবকিশোর প্রতি-নমস্কার করিতেই অনিমা স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল—"আমরা এসে পড়ার বুঝি বিঘ্ন করলুম।"

নবকিশোর বলিল—"একটুখানি। কিন্তু তা হোক আমি বিকেলে এসে বাকীটা বুঝিয়ে দেব'খন।"

অরুণ অনিমার সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিল। বলিল—"এটি আমার মেজ বোন—অণু। আচ্ছা বল দেখি নবু, একে দেখ্‌লে আমার বড় বোলে মনে হয় না ?"

অরুণের প্রশ্ন করার ধরণ দেখিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অরুণ বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল—"তুমি জাননা নবু, এটা চিরকালই এমনি বুড়ী, ওকে আমরা সবাই ভয় করি।"

অনিমা বিদ্রোহের সুর তুলিয়া কহিল—"কেন মিছে কথা কইছ দাদা, তুমি আমায় ভয় কর?"

অরুণ অম্লানবদনে কহিল, "আমি করি, বাবা করেন এবং মাধুরীর মুখে শুনেচি স্কুলের যত টিচার ও মেয়ে সবাই তোকে ভয় করেন।"

"ওমা, আমি আবার সে কথা তোমায় কবে বল্লুম"—বলিয়া মাধুরী প্রতিবাদ করিল।

অরুণের কথা শুনিয়া অনিমার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। একজন বাহিরের লোকের সামনে সে আরম্ভ করিয়াছে কী! আলাপ-আলোচনার মধ্যেও একটা সংযমের সীমা থাকা দরকার।

অরুণের আলোচনায় কিন্তু বিরামের লক্ষণ দেখা গেল না। সে এবার নবকিশোরকে এ প্রসঙ্গের মধ্যে টানিয়া বলিল—"আচ্ছা নবু, অণুকে দেখে তোমার ভয় করে?"

এবার কিন্তু নবকিশোর সত্যই হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"কতটুকুই বা ওঁকে দেখেচি; কিন্তু এখন ত' ভয় কোরছে না।"

অরুণ মুখখানাকে অসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিল—"এখন না করুক, আর পাঁচবার দেখলে তোমারও ভয় কোরবে।"

অনিমা কৃত্রিম ক্রোধের অভিনয় করিয়া বলিল—"কক্ষণো কোরবে না, সব্বাই ত' আর তোমার মত ভীতু নয়—"

শেষের কথাটি উচ্চারণ করিতেই অনিমার গাম্ভীর্য্য আর বজায় রহিল না। মধুর হাসিতে তার মুখখানি ভরিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে—"কে ভীতু নয় মা?" বলিতে বলিতে নিবারণবাবু পাশের ঘর হইতে সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। বোধ করি ইনি

নেপথ্যে থাকিয়া ইহাদের আলোচনার খানিকটা রেশ ধরিতে পারিয়াছিলেন।

বাবাকে দেখিয়া অনিমা আবার বিদ্রোহের সুর তুলিল। অনুযোগের সুরে বলিল—"দেখনা, বাবা, নবকিশোর বাবুর সামনে দাদা আমার নামে যা' তা' বোলতে সুরু কোরেছে। সেদিন আমাদের বোর্ডিংএ গিয়ে মিস্ দাসকে বোলে এল, "আমি আমার বড়দিদির সঙ্গে দেখা কোরতে এসেচি।" বোর্ডিংএর মেয়েরা সবাই জানে আমি ওর বড়দি'।"

অরুণ প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"কিন্তু তোকে ত' আমি ছেলেবেলা থেকেই বড়দি বোলে ডাকি, অণু।"

"কেন ডাক ?"

অরুণ এবার মুখ বিকৃত করিয়া জবাব দিল—"কেন ডাকি জান না, তুমি ? তোর মত প্যাঁচামুখী মেয়েকে কেউ কখনও ছোট বোন বোলে পরিচয় দিতে পারে ? সবাই আমায় মিথ্যুক ভাববে না ?"

নিবারণবাবু সস্নেহে কন্যার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে নবকিশোরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"অনু ছেলেবেলা থেকেই বড় গম্ভীর কিনা, অরুণ তাই যখন তখন আমার মাকে বিরক্ত করে!"

অরুণ বলিল—"সাধে কি করি, ও যেখানে থাকে আমি সেখানে যাই না। প্রাণ খুলে কোনদিন হাসতে জানে না, কথা কইলে জবাব দেয় না—"

অনিমা বলিল—"সকাল থেকে শুধু মিছে কথাই কইছ দাদা, কোনদিন আমি তোমার কথা শুনি না।"

অরুণ বলিল—"আচ্ছা, তুই বাবার সামনে বল, দেড় মাস বাড়ীতে থাকবি, বোর্ডিংএ যাবি না—তবে বুঝবো কেমন কথা শুনিস।"

অনিমা বলিল—"তুমিই ত' আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়েছ দাদা,

দিনরাত খেলা, গান আর গল্প নিয়ে থাক্‌লে পড়াশুনা হয় ? আমাদের বোর্ডিঙের ডিসিপ্লিন্ কী রকম জান ?"

অরুণ গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিল—"কী রকম ?"

"পরীক্ষার তিন মাস আগে থেকে নোটীশ দেওয়া হয়, এক্‌জামিন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গান-বাজনা খেলাধূলা একদম বন্ধ।"

অরুণ বলিল—"তাত হবেই। প্যাঁচার আড্ডার ডিসিপ্লিন্ ঐ রকমই হয় কিন্তু মানুষের বোর্ডিঙ হ'লে অন্য রকম হোত।"

অরুণের শেষ জবাব শুনিয়া, হাসি দমন করা সকলের পক্ষেই কঠিন হইয়া পড়িল। নবকিশোর এতক্ষণ ইহাদের ভ্রাতা-ভগ্নীর কথা কাটাকাটির মাঝে বেশ কৌতুক উপভোগ করিতেছিল।

এবার নিবারণবাবু অরুণের কথার উত্তরে বলিলেন—"কিন্তু তোরা যাই বলিস, মেয়েরা তোদের মত আড্ডাধারী নয়।"

অরুণ বলিল—"সেটা কিছু আর প্রশংসার কথা নয়। ওদের অক্ষমতা। জীবনকে যারা ভোগ কোরতে জানে না, জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা তাদের বিড়ম্বনা। ঐ সব বইয়ের পোকা মেয়েদের দেখলেই গায়ের ভিতর ঘিন্ ঘিন্ কোরতে থাকে"—বলিয়া অরুণ সত্যই হাত পা নাড়িয়া বিরক্তির অভিনয় করিল।

বৃদ্ধ নিবারণবাবু এবার স্নিগ্ধ হাস্যে বলিলেন—"তুই কি কোরতে বলিস্ ?"

অরুণ বলিল—"আমি যা' কোরতে বলি, তা তোমাদের ধিঙ্গী মেয়ে শুনবে কি ? কিন্তু আমার দিব্বি রইল বাবা, মাধুকে বোর্ডিঙে পাঠাতে পাবে না। যত সব অকম্মার ধাড়ী।"

বস্তুতঃ ঐ মেয়েদের বোর্ডিঙটার উপরেই যেন অরুণের জাতক্রোধ। খাঁচার পাখী পুষিয়া মানুষ যেমন তা'র স্বাধীনতা নষ্ট করে, অরুণের

ধারণা অভিভাবকরাও তেমনি মেয়েদের স্বাধীনতা ঘুচাইবার জন্যই হোষ্টেল বা বোর্ডিংে ভর্ত্তি করাইয়া দেয়। অনিমার বোর্ডিংে ভর্ত্তি হইবার ব্যাপার লইয়া অরুণ কত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল কিন্তু সন্তানবৎসল পিতা, কন্যার ঐকান্তিক আগ্রহাতিশয্য লক্ষ্য করিয়া তাহার স্বাধীন ইচ্ছায় বাদ সাধেন নাই। অনু ভাল করিয়া পড়াশুনা করিতে চায়, শৈশব হইতেই সে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্য কোমর বাঁধিয়া লড়াই করিয়াছে। পাঠের প্রতি তাহার একটু অসাধারণ অনুরাগ এই সব লক্ষ্য করিয়া পিতা তাহাকে নিজ আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি নিজ সন্তানদের স্বাধীন ইচ্ছায় কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাই প্রসঙ্গ বদলাইবার জন্য তিনি কন্যার পক্ষ সমর্থন করিয়া অরুণকে প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা অরুণ, তুই কি ক'র্‌তে কলেজে যাস্। কখনও পড়িস ?"

অরুণ অম্লানবদনে জানাইল ছেলেরা তাহাকে পড়িতে দেয় না! তাহাদের ডিবেটিং ক্লাব, ম্যাগাজীন, জিমনাষ্টিকের আখড়া ইত্যাদি সামলাইবার উপযুক্ত লোকের অভাব।

অনিমা বলিল—"তুমি পড়তে চাও না সেই কথাই বলনা কেন দাদা।"

"তবে আমার হয়ে বুঝি তুই পরীক্ষাগুলো পাশ করিস ?"

অনিমা বলিল—"তুমি কেমন কোরে পাশ কর, তা তুমি আর তোমার মাষ্টাররাই জানেন। কিন্তু আমাদের স্কুল হলে তোমায় কি কোরত জান? বেঞ্চির উপর দাঁড়া করিয়ে দিত।"

"ছোট বোন হ'য়ে তুই আমায় এত বড় কথা বলিস্ ?"

অনিমা বলিল—"বোলব না? তুমি বাপ-মার পয়সা নষ্ট কোরে স্কুলের বদনাম কোরবে, পড়াশুনা কোরবে না।"

অরুণ কিন্তু এ অভিযোগে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল—"আচ্ছা

দেখছি তুই কত বড় গুরুমহাশয় হয়েছিস—কি কি অঙ্ক শিখেছিস বিকেলবেলা দেখবো।" বস্তুতঃ অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা অঙ্ক জিনিষটা অরুণ একটু ভালই জানিত—আর এই বিদ্যেটাতেই অনিমা কাঁচা ছিল। তাই ভগ্নীর উপর আস্ফালন করিয়া বিদ্যার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে সে যখন তখন তাহার অঙ্কের পরীক্ষা লইতে বসিত।

"আচ্ছা, আচ্ছা দেখো"—বলিয়া হাসিয়া অনিমা উঠিবার উপক্রম করিতেই নবকিশোর উঠিয়া পড়িল।

"ওমা, এতখানি বেলা হয়েচে, একবাটী চা' দিতে পারলি না পোড়ারমুখী, শুধু বকিয়ে মারলি।"

"তাই ত' দাদা, তুমি যে আবার যখন তখন চা খাও। আনিগে যাই"—বার বার নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া অনিমা বলিল—"আপনি চা খাবেন ?"

নবকিশোর জানাইল সে কখনও চা খায় না।

"তবে আপনার ও বাবার জন্য সরবৎ আনিগে"—বলিয়া ইহাদের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া অনিমা চলিয়া গেল।

কথায় কথায় বেলা বাড়িয়া গেলেও, ছুটীর সকাল বলিয়া কেহ গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না।

অনিমা চা' ও সরবৎ তৈয়ার করিয়া আনিল। নিবারণবাবু কিন্তু অত বেলায় আর সরবৎ খাইলেন না, স্নানের সময় হইয়াছে বলিয়া তিনি কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। নবকিশোর ও অরুণ সরবৎ ও চা পানে মন দিল।

মাঝে হঠাৎ কি ভাবিয়া অরুণ বলিল—"অনু আজ পিকচার প্যালেসে একটা ভাল ছবি আছে ; বিকেলে যাবি ?" নবকিশোরকেও অনুরূপ প্রশ্ন করিল।

নবকিশোর জানাইল—মাধুরীর পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী। সকালবেলা ভাল করিয়া পড়ানো হইল না। বিকেলবেলাটা আবার নষ্ট করিবে।

অরুণ বলিল—"একবেলা ছবি দেখলে যদি পড়া নষ্ট হ'য়ে যায়। তবে এ বছর আর ওর পরীক্ষা দিয়ে কাজ নেই।"

এ মন্তব্যের পর অবশ্য আর নবকিশোরের প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা রহিল না।

সে বিদায় সম্ভাষণ অন্তে গৃহমুখে পা বাড়াইল। অনিমাও ছুটি পাইল এবং কক্ষান্তরে চলিয়া গেল, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে স্মরণ হইলেও সে নবকিশোরকে তাহার প্রত্যার্পিত পারিশ্রমিকের পনেরটি টাকা গ্রহণ করাইবার কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। টাকাটি তাহার নিকটেই রহিয়া গেল।

নবকিশোর বাসায় ফিরিতেই সৌম্য জানাইল, বড়দি' তাঁহাকে ডাকাইবার জন্য দুইবার লোক পাঠাইয়াছেন, আজ লাল্লুর জন্মদিন। সেই উপলক্ষে সেখানে তাহার রাত্রে নিমন্ত্রণ।

নবকিশোর বলিল—"রাত্রে নিমন্ত্রণ, তবে সকালে ডাকতে পাঠিয়েছেন কেন?"

সৌম্য বলিল—"কী জানি নবুদা' বড়দির বিশেষ দরকার। তুমি খেয়েই তাঁর ওখানে যেয়ো।"

বড়দি'র আহ্বান উপেক্ষা করিবার মত শক্তি তাহার ছিল না। সুতরাং সে যথাসম্ভব ত্বরার সহিত মধ্যাহ্নের আহার সমাপ্ত করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের গৃহাভিমুখে রওনা হইল।

নবকিশোর আসিতেই করুণাময়ী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, বলিলেন—"নবুভাই, তোমায় মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে এখুনি একবার বেরুতে

হবে, কতকগুলো দরকারী বাজার আছে। উনি যে ভোলামানুষ—একলা গেলে হয় ত' তাড়াতাড়িতে পাঁচটা জিনিষ ভুলে আসবেন।"

নবকিশোর তৎক্ষণাৎ মাষ্টার মহাশয়ের সহিত বাজার করিতে বাহির হইল। করুণাময়ী যে তাহাকে ডাকিয়া আপন ছোট ভাইটীর মত হুকুম করিতে পারেন ইহাতে সে মনে মনে প্রফুল্ল হইল।

নতুন বাজারে পৌছিলে মাষ্টার মহাশয় তাহার হাতে টাকা দিয়া যথাসত্বর আবশ্যকীয় জিনিষগুলি কিনিয়া আনিতে উপদেশ দিলেন। আলস্যবশতঃ তিনি আর গাড়ী হইতে নামিলেন না। নিকটবর্ত্তী একটা হকারের নিকট হইতে একখানি কমদামী বিলাতী খবরের কাগজ কিনিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

নবকিশোর পাঁচ দোকান ঘুরিয়া লিষ্টমত বাজারের সেরা সেরা জিনিষগুলি কিনিয়া যথাসত্বর ফিরিল। মাষ্টার মহাশয়ের সহিত বাড়ীতে ফিরিয়াই কিন্তু তাহার মনে হইল, সেদিন বিকালে অরুণদের সহিত বায়োস্কোপে যাইবে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে। সে কথা এতক্ষণ কাজের ঝঞ্ঝাটে তাহার মনে ছিল না। ঘড়ির দিকে নজর পড়িতেই মনে হইল, তাহার সকলের সহিত মিলিত হইবার নির্দ্দিষ্ট সময় বুঝি অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে রাত্রে এখানে আহার করিতে আসিবে প্রতিশ্রুতি দিয়া করুণাময়ীর নিকট বিদায় লইয়া নিবারণবাবুর বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

সেখানে পৌছিয়াই নিবারণবাবুর এক ভৃত্যের মুখে শুনিল, অরুণ তাহার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে নিরাশ হইয়া সে মাধুরীকে লইয়া একাই বায়োস্কোপে গিয়াছে।

বিফলমনোরথ হইয়া নবকিশোর সেখান হইতে ফিরিবার উপক্রম করিতেই হঠাৎ অনিমার ডাক কানে আসিল, উপরের গাড়ী বারান্দা হইতে সে নবকিশোরের নাম ধরিয়া আহ্বান করিল।

অনিমা নীচে নামিয়াই নবকিশোরকে বলিল—"দাদা সেই কতক্ষণ আপনার জন্য বসেছিলেন। আপনি এলেন না দেখে, রাগ কোরে মাধুকে নিয়ে ছবি দেখতে চলে গেল। নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন যে, চলুন ওপরে চলুন।"

নবকিশোর খানিকটা ইতস্তত করিয়া অনিমার পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া আসিল। উপরে হলঘর সংলগ্ন এক বারান্দায়, আসন বিস্তৃতই ছিল ; উভয়ে আসিয়া সেখানে বসিল।

নবকিশোর বলিল—"সময়ে না আসতে পেরে আপনাদের আনন্দটাই মাটি করলুম, আমায় ক্ষমা কোরবেন।"

"ভুলে গিয়েছিলেন বুঝি ?"

নবকিশোর বলিল – "ভুলে যেতুম না। বড়দি' আজ আমাকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর খোকার আজ জন্মদিন। এই ফিরলুম সেখান থেকে। বাড়ী ফিরেই এখানে আসবার কথা মনে পড়ল। কিন্তু এসেই শুনলুম অরুণ চলে গেছে।"

অনিমা বলিল—"আপনার বড়দি' এখানে থাকেন বুঝি ?"

নবকিশোর সংক্ষেপে করুণাময়ীর পরিচয় দিয়া বলিল—"তিনি আমার আপন বড়দি' নন। মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী।" পরে মাষ্টার মহাশয়ের নাম প্রকাশ হইতেই, তাঁহার পত্নীর পরিচয় পাইয়া অনিমা বলিল—"মিসেস্ ব্যানার্জ্জীকে আমি চিনি। আমার এক মাসীর সঙ্গে ডায়ে'সিসনে পড়তেন। আচ্ছা উনি খুব ভাল গান গাইতে পারেন নয় ?"

নবকিশোর এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিল না, শুধু জানাইল কোনদিন তার গান শুনিবার সৌভাগ্য তাহার হয় নাই। বস্তুতঃ স্ত্রীলোক ছেলেদের মতই আজকাল লেখাপড়া শেখে, স্কুল কলেজে পড়ে ইহা সে পূর্ব্বে না দেখিয়া থাকিলেও শুনিয়াছিল। কলিকাতা আসিয়া অবশ্য সে ইহা হাতে

কলমে প্রত্যক্ষ করিতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু তাহারা যে গানবাজনার চর্চ্চা করিয়া থাকে, ইতিপূর্ব্বে নবকিশোর তাহার পরিচয় পায় নাই।

তাই নবকিশোরকে নিরুত্তর দেখিয়া অনিমা বলিল—"আপনি জানেন না, উনি যখন মিস্ চ্যাটার্জ্জী ছিলেন, ওর অনেক গান আমরা Congressএ শুনেচি। আচ্ছা আপনার বড়দি' আপনাকে খুব ভালবাসেন—"

নবকিশোর অনিমার মুখে হঠাৎ এ প্রশ্ন শুনিয়া কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে ইহার জবাব কি দিবে খুঁজিয়া পাইল না। ম্লান হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অনিমা মনে মনে ভাবিল, ইঁহাকে কেহ ভালবাসে কিনা বোধ করি তিনি ইহা বুঝিতেও পারেন না।

অগত্যা সে প্রসঙ্গ বদলাইবার জন্য বলিল—"অনেক ঘোরাঘুরি কোরে এসেছেন, একটু চা কোরে দি'।"

নবকিশোর বলিল—"চা ত' আমি খাইনে—"

"হ্যাঁ, সে কথা আমার মনে ছিল না, তা'হলে একটু খাবার আনি—, ঘোরাঘুরি কোরে ক্ষিদেও ত' পেয়েচে।"

"কিন্তু আমি ত' এখুনি বাড়ী ফিরব—"

অনিমা হাসিয়া বলিল—"তারই বা দরকার কি নবকিশোরবাবু? এটা আপনার বন্ধুরই বাড়ী। বন্ধু নেই, কিন্তু বন্ধুর বোন এখানে আছে। সুতরাং অতিথি সৎকারের ত্রুটি হবে না" বলিয়া তাহাকে বারান্দায় রাখিয়া অনিমা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

কিন্তু নবকিশোর কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক কেহ নাই। প্রায় তাহারই সমবয়সী আর একটি সুন্দরী মেয়ে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। কথাবার্ত্তা বা আচার ব্যবহার দ্বিধাশূন্য। কোথায়ও আড়ম্বর বা কৃত্রিমতার গন্ধমাত্র

প্রকাশ পাইবার উপায় নাই। মাত্র আজ সকালে তাহার সহিত আলাপ, কথাবার্ত্তাও বিশেষ কিছুই হয় নাই। তথাপি কিশোরের কেমন যেন বোধ হইল। সে তার দাদার সহপাঠী ও ভগিনীর গৃহ-শিক্ষক হইলেও পুরুষ ত' বটে। সে এই সব সমাজের হালচালের সহিত অভ্যস্ত নয়। অনিমার ব্যবহারে কুত্রাপি সঙ্কোচের লেশমাত্র ফুটিয়া না উঠিলেও সে কিন্তু মনে মনে পীড়িত বোধ করিল। সকলের অনুপস্থিতিতে এই ভাবে আহ্বান এবং আলাপ-আলোচনা যত নির্দ্দোষই হউক—সে ইহা সুস্থমনে গ্রহণ করিতে পারিল না। তথাপি অনিমা যে ভাবে আহারের কথা উত্থাপন করিয়া, অতিথির অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল, তাহাতে সে ফিরিয়া আসা না পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে। আর উপায়ই বা কি? কলিকাতায় আসিয়া সব বাড়ীতেই দেখিতেছে এই প্রকার বিচিত্র ব্যবস্থা। সে মনে মনে ভাবে, এখানকার লোকাচার বোধ করি এই প্রকারই হইবে। সে যেখানে যায়, কেহ তাহাকে আমলই দেয় না, পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়াছে বলিয়াই কি এই উপদ্রব। নবকিশোর ভাবে সব জায়গায় নীচু হইয়া, এই ভাবে পরাভব স্বীকার করা আর চলিবে না! তাহাকে একটু শক্ত হইতে হইবে। কিন্তু শক্ত হইবে কাহার কাছে! সমবয়সী বন্ধুদের উপর শক্ত হওয়া চলে। মাতৃ-স্থানীয়া মহিলাদের অত্যাচারে জেদ্ করা চলে—কিন্তু বন্ধুর ভগ্নী, তাহার প্রায় সমবয়সী, একটি সুন্দরী নারীর কথায় প্রতিবাদ করিয়া, জেদ্ বজায় রাখা শক্ত। তাহার উপর আজ সকালেই অরুণ এবং তাহার পিতা এই নবাগতা তরুণীটির আচার ব্যবহার ও মনের যেটুকু পরিচয় জাহির করিয়াছে, তাহাতে তাহাকে মনে মনে সম্ভ্রম করিতেই হয়। এতখানি নিষ্ঠার সহিত যে ছাত্রীজীবনের সাধনা রক্ষা করিয়া চলে—স্ত্রীলোক হইলেও সে কাহারও অপেক্ষা কম নয়। কিন্তু যাহাকে সকলে এক বাক্যে গম্ভীর বলিয়া রায়

দিয়া গিয়াছে, তাহার আচরণে হয় ত' গাম্ভীর্য্য কিছু ফুটিয়া উঠিলেও তাহা ত' একেবারে কোমলতা বর্জ্জিত নহে। সে সত্যই ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল। বাজার হইতে ফিরিবার পর বড়দির বাড়ীতে সে অপেক্ষা করে নাই। অপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই তিনি কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু এখানে আসিয়া সে ত' কিছুই প্রকাশ করে নাই। তবে তাহাকে খাইতে দিবার জন্য অনিমাই বা হঠাৎ কেন এতটা চঞ্চল হইয়া পড়িল। নবকিশোর এই সব সাত পাঁচ ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে একটি শ্বেত পাথরের রেকাবীতে অনিমা নানাপ্রকারের খাবার সাজাইয়া এক গ্লাস জল হস্তে সেখানে প্রবেশ করিল।

"অনেকক্ষণ একা বসিয়ে রাখলুম, কিছু মনে কোরবেন না।"

নবকিশোর এবার অন্তরে খানিকটা জোর সঞ্চয় করিয়া বলিল—"আপনার উপর এবার আমি রাগ কোরবো।"

অনিমা বলিল—"রাগ কোরবেন কেন?"

"আপনারা সবাই মিলে অত্যাচার সুরু কোরেছেন—"

অনিমা হাসিয়া বলিল—"খাবারগুলো আগে শেষ কোরে নিন। তারপর প্রমাণ কোরে দেব—এ অত্যাচারের গোড়াপত্তন আপনিই সুরু কোরেছেন, আমরা নয়।"

নবকিশোর অনিমার প্রশ্নে বিস্মিত হইল, সে আহার সুরু করিয়া বলিল—"কেমন কোরে?"

"কেমন কোরে, সে কথা বোললে আপনার বিশেষ কিছু সুবিধা হবে না কিশোরবাবু, সুতরাং তাতে আর কাজ নেই।"

নবকিশোর বলিল—"আমার সুবিধা কোন জায়গায়ই হবে না সে আমি জানি। খাবারগুলো আমি প্রায় শেষ করেছি—কিন্তু আপনাকে এবার কারণটি বলতে হবে।"

অণিমা বলিল—"নবকিশোরবাবু, ছোটদের জেদ্ করা একটা স্বভাব কিন্তু তাই বোলে তাকে আমি ভাল বোলতে চাইনে—বড় ভাই হবার জোরে যারা ছোট বোনদের অভিভাবকদের উপর অত্যাচারের পরোয়ানা জারী কোরতে ভয় পায় না, জানবেন দরকার হ'লে সেই অভিভাবকরাও তার প্রতিফল দিতে জানে।"

"কিন্তু আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছিনে—"

"বড় ভাইরা তা' পারে না। কিন্তু ছোট বোনরা তা' পারে বোলেই কোনদিন ভুলতে পারে না। অত্যাচারীদের তাই তারা সাজা দিতে ভয় পায় না।"

অনিমার কথা শুনিয়া নবকিশোরের আহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সে পাংশু মুখে বলিল—"কিন্তু সত্যই যদি না জেনে কোন অপরাধ কোরে থাকি ..."

"তারই ত' শাস্তি দিচ্ছি নবকিশোরবাবু, কিন্তু যাই বলুন, আপনি একেবারে হোপ্‌লেস্" বলিয়া সারা মুখে কৌতুকের হাসি ছড়াইয়া বলিল—"আচ্ছা সত্যি, কী কোরে আপনি পাশ কোরেছিলেন, একটা স্কলারশিপও নাকি পেয়েছিলেন শুনি ?"

নবকিশোর এতক্ষণে বুঝিল, অনিমা এইবার বিদ্রূপ স্থরু করিয়াছে, সেও তাই হাস্যতরল কণ্ঠে কহিল—"হ্যাঁ, মাষ্টাররা একবার ভুল কোরে দিয়েছিল বটে কিন্তু তা আমার ভোগে আসে নি।"

অনিমাও সামনে আসিয়া জবাব দিল—"এই মাথা নিয়ে যারা স্কলারশিপ্ পায়, বৃত্তির টাকা তাদের ভোগে না আসাই উচিত।"

নবকিশোর বলিল—"কিন্তু আপনি যে অত্যাচারের কথা বললেন্ তাই বা' আমি করলুম কখন, এবং শাস্তিই বা আপনি কি দিলেন, একবার দয়া কোরে বলুন না—"

অণিমা বলিল—"শাস্তি যদি আজ না দিতে পারতুম্ এতক্ষণ আপনার গলা দিয়ে খাবারের একটা টুকুরোও নামতো না। কিন্তু সে কথা নয়, আপনি রাগ কোরবেন না নবুবাবু, আপনি বড় বোকা। ব্যূহ রচনা করবার বিদ্যাটি আপনি জানেন—কিন্তু বেরিয়ে যাবার পথ জানেন না। হয় ত' একথা আপনাকে কোনদিন বোলতুম না—কিন্তু না শুনেও আপনি ছাড়চেন না। বড় ভাই হবার দাবীতে যে ছোট বোনকে পড়িয়ে, পয়সা রোজগার করা অপমান বোলে মনে করে সেই ছোটবোনের দল যদি কিছু খেতে দেয়—তাকে অত্যাচার বোলে ঠেকিয়ে রাখতে চান্ আপনি কোন সাহসে? কিন্তু থাক্ সে কথা, আজ আমি আপনার কোন কথা শুনবো না। ডিসের প্রত্যেক টুক্‌রোটি পর্য্যন্ত আপনাকে গুণে গুণে খেতে হবে—"

"কিন্তু আমি যে আর সত্যিই খেতে পারছিনে—"

"তবে আমায় প্রতিশ্রুতি দিন, বেয়াদবি আর জীবনে কখনও কোরবেন না?"

নবকিশোর আর কি উত্তর দিবে, এই বিজয়িনীর প্রত্যেকটি কথা আজ শাণিত ছুরিকার মত তাহার বুকে বিঁধিতে সুরু করিয়াছে। একটা বাহ্যিক ঘনিষ্টতা সহজ করিবার জন্য যে সম্বন্ধের সূত্রপাত—তাহারই রেশ টানিতে টানিতে এই বুদ্ধিমতী নারী আজ তাহাকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে। বিরাট হস্তীমূর্খ সে! নতুবা অরুণের নির্দ্দেশে মাধুরী তাহাকে যখন প্রথম দাদা বলিয়া ডাকিতে সুরু করে, তখন গোড়াতেই সে এই মায়াজাল ছিন্ন করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া সে তাহা গায়ে মাখিয়া লইয়া কী বিপদেরই সৃষ্টি করিল। টাকা কয়টা না হয় লইলেই হইত? একটা খেলার সম্বন্ধ—শুধু খেলা বলিয়া উড়াইয়া দিলে, অনিমা তাহাকে আজ এমন করিয়া জব্দ করিবার অবকাশ পাইত না।

অরুণ তাহার সহিত লুকাচুরী খেলিতে গিয়া তাহাকে খেলো করিয়াছিল বলিয়াই, রাগ করিয়া সে অরুণের ছেলেমানুষীর প্রতিশোধ লইয়াছে, আজ তাহারই দুর্ব্বলতার সুযোগে একটি নারীর কাছে সে চরম পরাজয় স্বীকার করিল। তাহার তূণে এমন একটি অস্ত্রও আর অবশিষ্ট রহিল না, যাহা প্রয়োগ করিয়া সে এই বিজয়িনীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারে।

অনিমা এতক্ষণ কিশোরের অবস্থান্তর লক্ষ্য করিয়া অন্তরে অন্তরে বিশেষ কৌতুক বোধ করিতেছিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সে আবার বলিল--"সন্ধি ছাড়া আর উপায় নেই, কেমন? এবার আমি আপনাকে নিস্কৃতি দিলুম—কিন্তু দেখবেন যেন ভবিষ্যতে আর নিজ মূর্ত্তি ধরবেন না।"

নবকিশোরকে এবার মুখ ফুটিয়া স্বীকার করিতেই হইল। বলিল—"না, ভুল আর হবে না। কিন্তু আপনার দাদার কথাটা আজ এতক্ষণে আমার সত্যি বোলে মনে হচ্ছে।"

অনিমা মধুর হাসিতে মুখখানি ভরাইয়া বলিল—"তা, হলে এতক্ষণে বুঝেছেন, কেন আমায় সবাই ভয় করে। আজ আমার ভীতু ভক্তদের দলে আপনার নাম লিখিয়ে নিলুম।"

নবকিশোর এবার সত্যই সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল—"এ কথা সবাইকে বল্‌বেন নাকি?"

"ওমা, একথা আবার বোলবো না? আমার এত বড় বিজয়ের কাহিনী কি কারু কাছে লুকিয়ে রাখতে পারি?"

নবকিশোর এবার দৈন্যের সুরে বলিল—"কিন্তু আমি ত' বোলেছি, আর বেয়াদবী কোরবো না।"

অপরূপ ভঙ্গীতে হাসির লহর তুলিয়া অনিমা আবার বলিল—"তা'

ব'লে আপনাকে অপদস্থ করবার বাসনা আমার নেই। কিন্তু একটি condition, বলুন—যখন তখন, ক্ষিধে পেলে চেয়ে খাবেন—"

নবকিশোর হাসিয়া "আচ্ছা" বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা, অরুণ মাধুকে নিয়ে ছবি দেখতে গেল—আপনি সঙ্গে গেলেন না কেন?"

অনিমা আবার হাসিয়া কৌতুকের ভঙ্গীতে বলিল—"তা' হ'লে আপনাকে জব্দ কোরতুম কি কোরে। এমন গোমড়া মুখ নিয়ে ত' আর বাড়ী যেতে পারতেন না।"

নবকিশোর উত্তরে বলিল—"আপনি আমায় বিশ্বাস করুন, আমি আজ মন খারাপ কোরে বাড়ী যাচ্ছি না। আনন্দে আমার মন আজ কানায় কানায় ভরে উঠেচে। সত্যি বলছি আমি তা' প্রকাশ কোরতে পারছি না—"

অনিমা বলিল—"তা হ'লে আপনিও জানবেন, ছোট বোনরা অত্যাচার কোরে যতটুকু খুসী না হয়—অত্যাচার পেয়ে তার চতুর্গুণ খুসী হয়। আবার কাল সকালে আসবেন?"

"আসব" বলিয়া নবকিশোর হাসিমুখে বিদায় লইল।

কৃষ্ণপ্রেয়সীর নিকট পত্র লিখিতে এতদিন নবকিশোর কোন কথাই গোপন করে নাই। সবই অকপটে জানাইয়াছে। কিন্তু আজ পরিচিতের সংখ্যা তাহার আর একটি বাড়িয়াছে। সে তরুণী অনিমা। তাহার সহিত কেমন করিয়া আলাপ হইল, ইতিমধ্যে সে কি করিয়া নবকিশোরের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহার প্রতি ধীরে ধীরে অধিকারের দাবী বসাইতে সুরু করিয়াছে—এ সব কাহিনী কৃষ্ণপ্রেয়সীকে লিখিয়া জানাইতে সতাই তাহার বড় লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। নবকিশোর এ সকল কথা যতই

তলাইয়া ভাবিতে লাগিল, লিখিবার প্রবৃত্তি ততই তাহার লোপ পাইতে সুরু করিল। আজ এই কয়টি মাস, এই বিদেশে তাহাকে ঘিরিয়া যে সুখের নীড়টুকু গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে সে সহায় সম্বলহীন নিরাশ্রয় নয়। স্নেহ ও ভালবাসার প্রাচুর্য্যে সেখানে অপার্থিব সম্পদের সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে—কয়েকমাস আগে নবকিশোরের অদৃষ্টে যাহা নিতান্ত দুর্লভ ঠেকিত—আজ তাহাই তাহাকে দেহে ও মনে সকল দিক দিয়া শক্তিমান, ঐশ্বর্য্যবান্ করিয়া তুলিয়াছে। দু'দিন আগে যে অভাব তাহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল আজ তাহা ভাবিলেও স্বপ্নাতীত বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু সৌম্য ও অরুণ, করুণা ও মাষ্টার মহাশয়কে আশ্রয় করিয়া, আজ সে জীবনের যাত্রাপথে যে পাথেয়ের সন্ধান পাইয়াছে, মিত্রতার আবরণে, সখ্যতার বন্ধনে, স্নেহ ও ভালবাসার প্রাচুর্য্যে তাহা তাহার অন্তরকে কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়াছে। বিন্দুমাত্র ফাঁক বোধ করিবার সেখানে অবকাশ নাই। আজ তাহারই ছিদ্রপথে, কেমন করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে আর একটি নারী আসিয়া বাসা বাঁধিল, নবকিশোর কৃষ্ণ-প্রেয়সীকে পত্র লিখিতে বসিয়া সেই কথাই বারংবার ভাবিতে লাগিল। অনিমার আচার ব্যবহার নিতান্তই সংশয়হীন অনাড়ম্বর ঠেকিলেও—সে যেন নবকিশোরের কাছে একটি প্রহেলিকা। গাম্ভীর্য্য যাহার প্রকৃতিগত বলিয়া তাহার আত্মীয়স্বজন রায় দিয়াছে, তাহারই অন্তরালে যে কত বড় সুধার ভাণ্ডার লুকাইয়া আছে, নবকিশোর কতটুকুই বা তাহার সন্ধান পাইয়াছে। তথাপি যেটুকুর সে পরিচয় পাইয়াছে। তাহাতে নবকিশোর বুঝিয়াছে যে, তাহা মানুষকে তৃপ্ত করিবার পক্ষেই যথেষ্ট নয়—দরকার হইলে তাহাকে পাগল করিবারও শক্তি রাখে। বস্তুতঃ এখানেই সে করুণাময়ী বা কৃষ্ণপ্রেয়সী হইতে স্বতন্ত্র।

তাই আজ পত্র লিখিতে বসিয়া নবকিশোর যদি মনের অজ্ঞাতসারে অনিমার সেই রূপটাই মসী ও লেখনীর সাহায্যে কালো করিয়া ফুটাইয়া তোলে, তবে বোধ করি কৃষ্ণপ্রেয়সীর কাছে তাহার লজ্জার সীমা পরিসীমা থাকিবে না।

তথাপি নবকিশোর ভাবে, ফুটন্ত নব-মল্লিকার মত রূপ লইয়া যে জন্মিয়াছে, বর্ষার শিশির ধোয়া ফুলের মতই যার কান্তি, সুন্দর আয়ত নয়নের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া যে হৃদয় দেখিতে শিখিয়াছে,—জন্মে জন্মে ইহাই বোধ করি নারীর সেই শাশ্বত রূপ, যাহার প্রেরণা পাইয়া কবির কাব্য, শিল্পীর ছবি, ভাস্করের মূর্ত্তি, ছন্দে ছন্দে, গাঁথায় গাঁথায় তুলির টানে ও রংয়ের খেলায় সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে সেই নারী এই অনিমা—আকাশের সুখতারার মত দীপ্তি লইয়া সন্ধ্যামণির স্নিগ্ধ ছটায় ধরার বুকে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নারীর সৌন্দর্য্য লইয়া আলোচনা করিবার অবকাশ নবকিশোরের জীবনে ঘটে নাই—হয়ত ঘটিবেও না। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য যখন সূর্য্যের উত্তাপের মতই হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছে, সে চক্ষুষ্মান, হৃদয়বান হইয়াও তাহার প্রভাব অস্বীকার করিবে কি করিয়া? সম্প্রতি যে তনুহীন দেবতা তার অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, যৌবনের রুদ্ধ দুয়ারে মৃদু মৃদু ঘা দিতে সুরু করিয়াছে, বালক নবকিশোর তাহা তুচ্ছ করিলেও যুবক নবকিশোর তাহা অবহেলা করিতে পারিল না।

তাই, তোড়জোড় করিয়া পূর্ব্ব অভ্যাস মত কৃষ্ণপ্রেয়সীকে পত্র লিখিতে বসিলেও আজ তাহার কলম চলিল না। হস্ত শিথিল হইয়া লেখনী খসিয়া পড়িল।

পরদিন নবকিশোর, মাধুরীকে পড়াইতে গিয়া দেখিল, অনিমা অরুণকে বড় বিপদে ফেলিয়াছে। গত রাত্রি হইতে সে বীজগণিতের একটা শক্ত

অঙ্ক কষিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বারবার চেষ্টা করিয়াও সে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাই আজ সকালবেলা অঙ্কটি কষিয়া দিবার জন্য সে দাদাকে ধরিয়া পড়িয়াছে।

অরুণ পরম উৎসাহে খাতা খুলিয়া অঙ্কটি কষিতে বসিল। কিন্তু কষিতে বসিয়াই প্রথমে মনে পড়িল, সংখ্যাগুলি সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য যে আবশ্যকীয় 'ফরমুলার' দরকার তাহা তাহার মনে নাই। Algebra বই খুলিয়া দরকারী ফরমুলাগুলি দেখিয়া লইল, কিন্তু আধঘণ্টা ধরিয়া নানা প্রকারের চেষ্টা করিয়াও সে অঙ্কটি উদ্ধার করিতে পারিল না, কেবল গলদঘর্ম্ম হইয়াই মরিল।

ইতিমধ্যে নবকিশোর সেখানে উপস্থিত হইয়াই দেখিতে পাইল ভাই-বোনে মিলিয়া পরম নিবিষ্টমনে লেখাপড়া করিতেছে।

নবকিশোরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই অরুণ খাতা ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। অনিমা কৌতুকের সুরে কহিল—"কি দাদা উঠলে যে?"

"এ সব গাধার অঙ্ক বুঝলি, অনি, দেড় ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করলুম মিললো না।"

অনিমা হাসিতে হাসিতে খাতাখানি তুলিয়া লইয়া নবকিশোরের দিকে আগাইয়া দিল। পরে কহিল—"নবকিশোরবাবু, দাদা এটা গাধার অঙ্ক বোলে কষতে পারলে না, আপনি কোষে দেবেন?"

নবকিশোর খাতাখানির দিকে চোখ বুলাইয়া হাসিয়া কহিল—"আপনি পারেন নি?"

"আমি পারলে কি আর দাদার খোসামোদ করি?"

"আপনি কি করেছেন দেখি"—বলিয়া কসা অঙ্কটির উপর চোখ বুলাইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল একটি সংখ্যা ভুলক্রমে দুইবার যোগ করা হইয়াছে। সেই সংখ্যাটি পেনসিল দিয়া কাটিয়া, পূর্ব্ব

জেরের সহিত যোগ দিতেই তাহার ফলাফল নিমেষেই কেতাবে লিখিত ফলাফলের সহিত মিলিয়া গেল। তখন নবকিশোর অনিমার দিকে খাতা-খানি আগাইয়া দিয়া বলিল—"আপনার ঠিকই হয়েছিল। ভুলক্রমে এক সংখ্যা দু'বার যোগ করা হ'য়েছিল ?

অনিমা নিজের ত্রুটির পরিচয় পাইয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইল। পরে দাদার দিকে ফিরিয়া কহিল—"এই সামান্য ভুলটা তোমার নজরে পড়ে নি।"

অরুণ জবাব দিবার পূর্ব্বেই নবকিশোর হাসিয়া কহিল,—"ওসব ভদ্রলোকের অঙ্ক নয় বোলেই অরুণের নজরে পড়েনি। নয় অরুণ ?"

অরুণ পরম বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—"Exactly so. ওসব অঙ্ক কষে ইস্কুলের নীচু ক্লাসের কচি কচি ছেলেরা। যাদের মাথা ভাল, তারা অত Patience নিয়ে ঐ সব গাধার অঙ্ক কষে না।" অনিমা দাদার কথা শুনিয়া পরম কৌতুকভরে কহিল—"তা' হলে দাদা আমায় বরং দু'টো বুদ্ধির অঙ্ক কোষে দিও আমি কাল দুটো প্রবলেমে হাত দিয়েছিলুম—আজও কষে উঠতে পারিনি।"

মুখপোড়া মেয়েটা আজ কী বিপদেই ফেলিল। অরুণের হাতে তখন যথেষ্ট কাজ। বড়দিনের ছুটির মধ্যে একটা থিয়েটার হইবে কলেজে। আজ হইতে তাহাকে মহলা বসাইতেই হইবে, ইহার মধ্যে এই সব অঙ্ক কষা-কষির উৎপাত সুরু হইলে, মানুষের প্রাণ বাঁচে !

তাই অনিমার প্রশ্নে তাচ্ছিল্যভরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"আমার সময় কোথা অণু ? তুই বরং নবুকে নিয়ে কষিয়ে নিস্। ওটা অঙ্ক করে ভাল।"

নবকিশোরের নামোচ্চারণেই সে অজ্ঞতার ভান করিয়া কহিল—"বুদ্ধির অঙ্ক কি আমি পারবো ! বরং দু' চারটা গাধার অঙ্ক দিলে···"

অরুণ আর শেষ পর্য্যন্ত শুনিল না। যেন তাহার অনর্থক এতটা দরকারী সময় নষ্ট করার দরুণ, সে অগ্নিময় দৃষ্টি দিয়া নবু ও অনিমাকে ভস্ম করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

নবকিশোর এই ব্যাপারের পর ভাবিল—এটা অনিমার একটা অভিনয়। সে অঙ্ক কষিতে পারে ভাল এবং ভুল করিবার সম্ভাবনাও কম, নতুবা আগাগোড়া ঠিক কষিয়া শেষের দিকে অনর্থক দুইবার যোগ বসিত না। ভাবিল হয় ত' অরুণকে জব্দ করিবার ইহাও আর একটি ফন্দী।

কিন্তু সেদিন যখন মাধুরীর পড়া চুকিলে অনিমা সত্যই আবার অঙ্কের খাতাখানি আনিয়া নবকিশোরকে বুঝাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল তখন সে সত্যই বিস্মিত হইল!

"আচ্ছা আপনি সত্যই তখন ও অঙ্কটা কষতে পারেন নি?"

অনিমা হাসিয়া কহিল—"আপনার কি মনে হয়!"

আমার মনে হয়, "আপনি অরুণকে অনর্থক খানিকটা হায়রান্ কোরেছেন!"

অনিমা কহিল—"না। আমি সত্যই ভুলটা ধরতে পারিনি।"

পরে 'প্রোপোরস্যান্' সংক্রান্ত দুটো শক্ত 'প্রবলেম' সল্‌ভ করিবার সহজ কৌশল বুঝাইয়া দিবার অনুরোধ করিলে নবকিশোর কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল—"আপনি কি কোরে জানলেন, আমি এ অঙ্ক কষতে পারবো?"

"দাদা যে বলে গেল।"

"দাদার কথার উপর আমায় অতবড় Certificate দেবেন না। কিন্তু আমি জানি আপনিও চেষ্টা করলে এটা কষতে পারবেন। আমায় অনর্থক কষ্ট দিচ্ছেন।"

অনিমা কহিল—"প্রবলেমের আঁক আমি ভাল কষতে পারিনে, নবুবাবু বিশেষ এই দুটো অঙ্ক"—বলিয়া দুটা নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক দেখাইয়া দিল !

নবকিশোর কহিল—"আপনি আমার সাম্‌নে বসুন।"

অগত্যা অনিমা বাধ্য হইয়া নবকিশোরের পাশে বসিয়া আঁক কসিতে সুরু করিল। প্রথমটা তাহার অবশ্য একটু সঙ্কোচ বোধ হইল, কিন্তু এই আজন্ম সংস্কারশূন্য বুদ্ধিমতী নারী সহজেই সে দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে পারিল। পরে গভীর মনোযোগের সহিত আঁকটি কষিতে আরম্ভ করিতেই নবকিশোর, আঁকটি কোন্ দিক হইতে আরম্ভ করিলে সহজসাধ্য হইবে তাহার একটা কৌশল মুখে মুখে বলিয়া দিল। বলা বাহুল্য, নবকিশোরের পদ্ধতিতে ঢালিয়া সাজিতেই অঙ্কটি অনিমার পক্ষে খুবই সহজসাধ্য হইয়া উঠিল। এই ভাবে পরস্পর মিলিয়া দু' চারটি আঁক কষা হইলে—অনিমা মিনতির সুরে কহিল—"আমি যে ক'দিন এখানে আছি, আমায় দু'চারটে আঁক দেখিয়ে দেবেন ?"

নবকিশোর কহিল—"আমার মনে হয় আপনাকে দেখিয়ে দেবার দরকার হবে না। আপনার শুধু অঙ্কের উপর একটা ভয় আছে—ক্রমাগত প্র্যাকটিস্ করলে সে ভয় থাকবে না।"

অঙ্ক করা সমাপ্ত হইলে, অনিমা কহিল—"আচ্ছা নবকিশোরবাবু, ম্যাট্রিকে আপনি অঙ্কে কোন লেটার পেয়েছিলেন ?"

নবকিশোর হাসিয়া সবিনয়ে জানাইল—"হ্যাঁ !"

"Optional ও Compulsory দুটোতেই—"

নবকিশোর বলিল, "হ্যাঁ।"

"ইংরাজীতে ?"

নবকিশোর বলিল—"ইংরাজীতেও পেয়েছিলুম।"

"আর কিছুতে ?"

নবকিশোর হাসিয়া কহিল—"বাঙলাতেও একটা পেয়েছিলুম। কিন্তু আপনিও ত' আসচে বার ম্যাট্রিক দেবেন—আপনিও সব কটাতে পাবেন, এবং আমার থেকে বেশী পাবেন।"

অনিমা সকৌতুকে কহিল, "কী করে জানলেন ?"

নবকিশোর গম্ভীর ভাবে কহিল—"হাত গুণতে জানি কিনা। দরকার হয় আমি বাজী রাখতে রাজী আছি।"

অনিমা এবার হাসিয়া কহিল—"তবে জেনে রাখুন, সে বাজী আপনি হেরে বসে আছেন, আপনার মত প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে 'লেটার' আমি কখনো পাব না।"

নবকিশোর এবার জোর করিয়া কহিল—"আপনি নিশ্চয়ই পাবেন।"

অনিমাও সমান জোরে কহিল—"কক্ষনো নয়।"

"যা অসম্ভব তা নিয়ে আমি ঝগড়া করিনে"—বলিয়া নবকিশোর উঠিবার উপক্রম করিল।

অনিমা কহিল, উঠছেন যে বড়ো। আমি না বললে আপনি উঠতে পাবেন না। আবার বিকেলে আসবেন ?"

নবকিশোর কহিল, "না, সামনের বুধবারে আমাদের বড়দিনের ছুটী—সেদিন আমি বাড়ী যাবো! তাই ভাবচি আজ কয়েকটা জিনিষ পত্তর কিনবো।"

"মাধুর পরীক্ষা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোরবেন না ?"

"তার পরীক্ষা বুধবারে শেষ হবে এবং সে ভালভাবেই পাশ কোরবে, আপনারা কিছু ভাববেন না।"

এতক্ষণ অনিমা উৎসাহের সহিত কথা কহিতেছিল হঠাৎ সে ছুটীতে বাড়ী যাইবে শুনিয়া অনিমার সমস্ত উৎসাহ নিভিবার উপক্রম হইল। কি ভাবিয়া সে আবার কহিল—"বাড়ীতে আপনার কে আছেন, নবকিশোরবাবু ?"

ম্লানকণ্ঠে নবকিশোর বলিল—"আপনার কেউ নেই গ্রাম সমাজে এক গোলাদার খুড়া ও খুড়ীমা ছাড়া।"

"বাবা, মা?"

"নাঃ। ওসব পাঠ জমাবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ"—বলিয়া সে ম্লান হাসি হাসিল।

"তবে বাড়ী যাবেন কেন, নবকিশোরবাবু?"

নবকিশোর তখন কৃষ্ণপ্রেয়সীর কথা বলিতে সুরু করিল। কহিল তাহার খুড়ীমা হয়ত' ছুটির খবর শোনা পর্যান্ত প্রত্যহ ষ্টেশনে খোঁজ লইতে সুরু করিবেন এবং সেখানে ভালভাবে না পৌছানো পর্য্যন্ত সুস্থির হইতে পারিবেন না।

"তিনি আপনাকে বড্ড ভালবাসেন বুঝি?"

"বড্ড বেশী।"

"তবে আর তাঁর মনে ব্যথা দেবেন না। আপনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন।"

ইহা শুনিয়া কিশোর অনিমার মুখের দিকে তাকাইল। দেখিল সমবেদনায় তাহার চোখ দুটিও ভার হইয়া আসিয়াছে।

"বাড়ী গিয়ে আমাদের কথা মনে কোরবেন?"

নবকিশোর এবার হাসিল। মনে করিল—বলে 'না'। কিন্তু বিদ্রূপ করিতে গিয়া অপর কী একটা ক্যাসাদের সৃষ্টি হইবে ভাবিয়া সে থামিয়া গেল। কেবল মুখে কহিল—"আপনার কী মনে হয়?"

অনিমা জবাব দিল না, সে কী ভাবিতে লাগিল। নবকিশোর এবার অনিমার মুখের দিকে তাকাইয়া সহজেই বুঝিতে পারিল, সে এই সহজ সমস্যার মীমাংসা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না। সে এবার মরিয়া হইয়া কহিল—

"অনিমা দেবী, হঠাৎ মনে রাখবার মত মানুষ পাওয়াও যেমন সহজ নয়, মনের মানুষকে তেমনি হঠাৎ ভুলে যাওয়াও কঠিন। আপনারা আমায় দয়া কোরে মনে করেন বোলেই, আমার পক্ষে চেষ্টা কোরে ভুলে যাওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বোলবো। রাগ কোরবেন না।"

"আমি কখনও রাগ কোরবো না, আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।"

"আমার মত হতভাগ্যকে আপনারা সবাই মিলে এত অনুগ্রহ কোরতে সুরু কোরেছেন কেন? জানেন, পাঁচমাস আগে, আমার এক খুড়ীমা ছাড়া, আমার আপনার বোলতে একটি প্রাণীও ছিল না। ভগবান আমায় এ সব দিক দিয়ে একেবারেই নিঃস্ব কোরেছিলেন—কিন্তু আমি তার জন্য, অভাবও বোধ করিনি, দুঃখও পাইনি কোন দিন। কিন্তু আজ বাড়ী যাবার আগে, আমার শূন্য ভাণ্ডার আপনারা এমন কোরে পূর্ণ কোরতে সুরু কোরেছেন যে হয় ত' যে অভাব, যে বেদনা বোধ করবার আমার দরকারই ছিল না, আজ আপনাদের বিচ্ছেদে তাই বোধ কোরতে সুরু কোরবো। বেদনা আজ আমার এত বেশী জমে উঠেছে যে তা আমার গোপন করবারও সামর্থ্য নেই। কিন্তু আজ আমি উঠি, অনেক কথা কোয়ে ফেললুম। যদি অপরাধ কিছু কোরে থাকি, ক্ষমা কোরবেন।"

অনিমা এতক্ষণ পাষাণের মত নিশ্চল হইয়া নবকিশোরের কথা শুনিতেছিল, কথা শেষ হইলে নবকিশোর বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, সে শত চেষ্টা করিয়া একটি কথারও জবাব দিতে পারিল না। শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে সামনের প্রসারিত পথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যে লোকটি কথা কহিতে জানেনা বলিয়াই অনিমার ধারণা ছিল,

অথচ কথা কহিলে ভাল লাগে—সে যে আজ সামান্য একটি প্রশ্নের আঘাতে এমন করিয়া জবাব দিয়া পরকে মরিয়া করিয়া তুলিতে পারে, অনিমা বোধ করি তাহা ধারণাও করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহা যদি পারিত, হয় ত' সে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বিব্রতও করিত না, নিজেও যাচিয়া যে সন্দেহ সে অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতেছিল, তাহাকে এমন করিয়া নির্ম্মম ভাবে সত্য করিয়া তুলিবার সুযোগ দিত না।

তথাপি কিশোরের উচ্ছ্বাস ও স্বীকারোক্তির মাঝে, আত্মসমর্পণের যে গোপন ইঙ্গিতটুকু আজ প্রকাশ হইয়া পড়িল—অনিমার অন্তরে ইহাইত' ছিল তার চিরন্তণ কামনা। যে আকাঙ্ক্ষা সে এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া সন্দেহ দোলায় তুলিতেছিল, তাহাই আজ আচম্বিতে সত্য ও সহজ হইয়া উঠিল। নির্ব্বাক নিস্পন্দ অনিমা, অন্তরকে সচেতন করিয়া তুলিয়া যখন এই সত্যটিকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিল—নবকিশোর তখন দৃষ্টির বাহিরে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বস্ব দান করিয়া সে আজ তাহারই সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তি লইয়া চলিয়া গেল—সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া তাহারই একজন আজ বুকভরা অন্ধকারের মাঝে নির্ম্মল আলোক রশ্মির সন্ধান পাইবাও তাহা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে নবকিশোর Periodical পরীক্ষা দিয়াছিল। ছুটির পূর্ব্বে তাহার ফল বাহির হইল। সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় কলেজের চির-প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এক বৎসরের বেতন হইতে অব্যাহতি পাইল। চ্যাটার্জ্জী সাহেব ও চ্যাটার্জ্জী গৃহিনী খুসী হইলেন—আর খুসী হইল করুণা।

এই সামান্য কলেজের পরীক্ষা। কৃতকার্য্যতার ফল বন্ধু বা আত্মীয়

নহলে জাহির করিবার মত নহে। নবকিশোর সেই কারণে কাহারও কাছে কথাটি প্রকাশ করে নাই, কিন্তু ছুটীর পূর্ব্বে কলেজে বেতন দিবার নির্দ্দিষ্ট সময় আগত হইলে কিশোর মাহিনা লইবার জন্ত আসিল না দেখিয়া মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কিশোর তাঁহার নিকট আসিতেই সে চ্যাটার্জ্জী সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে জানাইল—সম্প্রতি এক বৎসরের মাহিনার টাকা সে বৃত্তি পাইয়াছে সুতরাং আপাততঃ তাহার আর টাকার আবশ্যকতা নাই।

পরে সে ধীরে ধীরে বাটী যাইবার কথা উল্লেখ করিল।

চ্যাটার্জ্জী সাহেব সানন্দে অনুমতি দিয়া বলিলেন—"যাবার আগে যদি টাকাকড়ির কিছু দরকার হয়, চেয়ে নিও বাবা, কিছু লজ্জা কোরো না যেন।"

বাড়ী যাইবার একদিন আগে কিশোর করুণাময়ীর সহিত দেখা করিতে আসিল। করুণাময়ী কিশোরকে দেখিয়া রাগ করিলেন। সে ক্লাশের পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিয়া এক বৎসরের মাহিনা বৃত্তি পাইয়াছে এ খবর মাষ্টার মহাশয় যথাসময়ে করুণাময়ীকে জানাইয়াছেন—কিন্তু বোকা ছেলে একদিনও তাহাকে সে খবরটি দেওয়া দরকার মনে করিল না।

কিশোর ঘাড় নীচু করিয়া দোষ স্বীকার করিল। তখন করুণাময়ী প্রসঙ্গ বদলাইয়া বলিলেন—"বাড়ী যাবার আগে আজ একবার বাজারে যাও। একজোড়া কাপড় কিনবে, দুটো জামা কিনবে আর একটা ছোট এটাচী কেস কিনবে, বুঝলে?"

"কার মাপ মত জামা কাপড় কিনবো?"

"তোমার নিজের মত—এসব তোমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে।"

"আমার ত জামা কাপড় আছে, বড়দি।"

করুণাময়ী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—“না। একটা মোটা কোট আর একটা চাদর আজ তুমি ক' মাস ধরে এখানে পরছো। পরণের কাপড়ও তোমার ছিঁড়ে গেছে—ধর টাকা, নাও”—বলিয়া তিনি দশ টাকার একখানা নোট তাহার হাতে দিলেন।

কিশোর কিন্তু মনে মনে জানে, বড়দি এবার জুলুম করিতে সুরু করিয়াছেন। কাপড় তাহার সত্যই ছিঁড়িয়া গেলেও সে তাহা ইতিমধ্যে নিপুণভাবে সেলাই করিয়াছে। কোট ও চাদর এক একখানি হইলেও সে তাহা দু' একদিন অন্তরই স্বহস্তে সাবান দিয়া কাচিত। বড়দি আজ জামা, কাপড় কিনিবার জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করিলেও কিশোর মনে করিল এ সব না হইলেই ভাল হইত, যাহা আছে তাহাতে আরও চার পাঁচ মাস এমনি করিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে। কিন্তু বড়দির কথার উপর কথা কহিয়া তাঁহার অসম্মান করিবার মত সাহস কিশোরের হইল না। এ কয়মাস এখানে থাকিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়াছে—তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করিবার মত সাহস এক সৌম্য ছাড়া আর কাহারও নাই। কিন্তু সৌম্য যাহা করে তাহা কিশোরের করা সাজে না। তাই নতমস্তকে বড়দির দান তাহাকে গ্রহণ করিতে হইল।

“জিনিষগুলো সব আমাকে দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো, কিশোর।”

কিশোর করুণাময়ীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিবে জানাইয়া বিদায় লইল।

বাজারে গিয়া কিশোর করুণাময়ীর প্রদত্ত টাকায় নিজের জন্য এক জোড়া খদ্দরের ধুতি, দুটি খদ্দরের সার্ট ও একটি ক্যানভাসের এটাচি কেস কিনিল। পরে কি মনে করিয়া কালীঘাটে গিয়া, কৃষ্ণপ্রেয়সীর প্রদত্ত অর্থ হইতে কিছু খরচ করিয়া শ্রীধরের জন্য একখানি অল্পদামের সিল্কের নামাবলী, কৃষ্ণপ্রেয়সীর জন্য একটি বড় পাথরের জানবাটী ও

একখানি কালীঘাটের পট এবং বড়দির খোকা লালুর জন্য কিছু কাঠের খেলনা কিনিল। পরে কালী দর্শনে গিয়া একজোড়া খুব বড় জবাফুলের মালা ও খুব বড় ফুটন্ত গোলাপ কিনিল। আদি গঙ্গায় স্নান করিয়া, নববস্ত্র পরিয়া মালা ও ফুল হস্তে সে মাতৃ-দর্শনের জন্য মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। মাতার চরণে অঞ্জলি দিয়া, মালা হইতে কয়েকটি প্রসাদী জবা ও একটি গোলাপ লইয়া সে বাহির হইল। তাহার পর প্রথমেই করুণাময়ীর বাটীতে গিয়া প্রসাদী মিষ্টান্ন, সিন্দূরলিপ্ত একটি বিল্বপত্র ও কয়েকটী জবা ফুল তাঁহার হস্তে দিল। নিজের এটাচি কেসের মধ্যে তাঁহার খুড়ীমা কৃষ্ণপ্রেয়সীর জন্য দুটি প্রসাদী জবা ও একটি বিল্বপত্র রাখিয়া দিল এবং গোলাপ ফুলটি লইয়া চ্যাটার্জ্জী সাহেবের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে আসিয়া দেখিল অরুণ তাহার ঘরে বসিয়া সৌম্যের সহিত মহা আনন্দে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে।

নবকিশোরকে আসিতে দেখিয়া অরুণ হাসিয়া বলিল—"কতক্ষণ তোমার এখানে বসে আছি জান? সৌম্যবাবু না থাকলে কখন বাড়ী চলে যেতুম। তারপর অনু তোমায় অনুরোধ করে পাঠিয়েছে তুমি আজ বিকেল বেলা ওখানে খাবে।"

নবকিশোর ইহাই এতক্ষণ ভয় করিতেছিল। অনিমা সম্প্রতি তাহাকে লইয়া যে সব ব্যাপার সুরু করিয়াছে তাহাতে বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে এই রকম একটা কিছু ঘটিবে ইহা সে আশঙ্কা করিতেছিল।

খাওয়ার কথা উঠিতেই সৌম্য হঠাৎ অরুণকে বলিয়া বসিল—"নবুদা' কত বড় Orthodox জানেন না বুঝি? উনি টেবিলে খান না, আসন পাতা চাই। রান্না একেবারে খাঁটি বামুনের হওয়া চাই। পৈতাওয়ালা বামুন!" বলিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বস্তুতঃ আজকালকার দিনে কলেজে-পড়া কোন ছেলে-মেয়ের এন

সংস্কার আছে বা থাকিতে পারে তাহা অরুণ কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাই সে সৌম্যের প্রশ্নে সন্দিগ্ধ হইয়া নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিল—"সত্যি ?"

নবকিশোর দেখিল, কথায় কথায় সৌম্য সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছে। অনিমা এখনই এ কথা শুনিবে, হয় ত' তাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্খা নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। হয় ত কিছু না বলিলে, সে কৌশলে অদ্যকার এ নিমন্ত্রণ এড়াইয়া চলিতে পারিত। যাহা হউক, অরুণ বিব্রত হইয়াছে জানিতে পারিয়া সে তাহাকে নিস্কৃতি দিবার জন্য কহিল—"ও সব কিছু নয়, অনিমা আমায় আর একদিন খাইয়েছিলেন তুমি তাঁকে গিয়ে বোলো—আমি যথাসময়ে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ কোর্‌ব।"

কিন্তু এ আশ্বাসেও অরুণের সন্দেহ কাটিলনা, পরে সে দু' একটি প্রশ্ন করিতেই চঞ্চল সৌম্য, গুপ্তস্থান হইতে তাহার কোসাকুসি পূজার আসন এবং গঙ্গাজলের ঘটি বাহির করিয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে, সে যাহা বলিয়াছে তাহার এক বিন্দুও মিথ্যা নয়। নবু সত্যই পূরাপূরি orthodox.

তখন সে নৈরাশ্যের সুরে কহিল—"তবে আর কি হবে ভাই আমি যাই।"

নবকিশোর সৌম্যের উপর রাগ করিয়া কহিল—"তুমি ও-সব কথা অনিমাকে কইতে পাবে না। আমি রাতে সেখানে সত্যিই খাবো!"

"কিন্তু আমি ত' শুধু আজ তোমায় জলখাবার খাইয়ে ছেড়ে দেবোনা, ভাই।"

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—"আমি শুধু সেখানে জলখাবার খেতে যাবো, এ কথা তোমায় কে বল্‌লে ?"

"কিন্তু এত সব জানা-জানির পর তার হাতের রান্নাই বা তোমায় আমি খেতে দেবো কেন ?"

নবকিশোর দেখিল সামান্য একটু ব্যাপার হইতে বড় রকম বিবাদের সূত্রপাত হইল। সে কোন প্রকারে এড়াইবার জন্য বলিল—"যা যা' খাওয়া চলে, তাও ত' তিনি রাঁধতে পারেন—"

"তাই দেখিগে"—বলিয়া অরুণ বিরস বদনে উঠিবার উপক্রম করিতেই সৌম্য বলিল—"আর আমি বুঝি বাদ যাবো অরুণবাবু?"

অরুণ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—"আজ সবে নতুন আলাপ, তায় আপনারা বড় লোক—কোন্ লজ্জায় আর গরীবের বাড়ীতে খাবার কথা বোলতে সাহস পাই বলুন। তবে যদি নিজগুণে পায়ের ধুলো দেন তবে সত্যিই বড় খুসী হবো।"

"আচ্ছা, সে আর একদিন দেখা যাবে" বলিয়া সৌম্য অরুণকে গেট পর্য্যন্ত আগাইয়া দিল। নবকিশোর চিন্তিতমুখে খানিকটা পথ চলিতে চলিতে অরুণকে বলিল—"ও সব কথা তুমি অনিমাকে কিছু বোলোনা, অরুণ। তিনি শুনলে কষ্ট পাবেন। বরং তিনি ইচ্ছামত যা হোক রাঁধুন, আমি আজ তাই খেয়ে যাব।"

"যদি জাত যায় তাতে?"

"গঙ্গার উপর তাতে দোষ হবে না"—বলিয়া নবকিশোর হাসিল। কিন্তু সে হাসি তৎক্ষণাৎ কল্পনাপ্রবণ অরুণের প্রাণে শেলের মত বিঁধিল। নবু সত্যই তাহা হইলে বিশ্বাস করে, অ-ব্রাহ্মণের হাতে আহার করিলে তাহার জাতি যাইবে। তথাপি সে শুধু তাহাদের সুখী করিবার জন্যই খাইতে চায়—গোঁড়ামির আস্ফালনটুকু ষোল আনাই বজায় রাখিয়া। কিন্তু কেন? বন্ধুত্বের আহ্বান যদি ইহার কাছে মূল্যহীন বোধ হইয়া থাকে—শুধু একটা ভদ্রতার অভিনয় বজায় রাখিবার জন্য তাহার লুকো-চুরীর প্রয়োজন কী? অন্তরের ধর্ম্ম যদি সামাজিক আচার-ব্যবহারে তাহাদের পৃথক করিয়া রাখে—শুধু গঙ্গার দোহাই দিয়া তাহাকে জলচল

করিবার আবশ্যকতা নাই। অরুণ যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার অন্তর বিষাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মনে হইল—নবকিশোর ভণ্ড। ধর্ম্মের বড়াই যা সে করে তা শুধু ভান মাত্র। নইলে সত্যকারের স্নেহ ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া সে শাস্ত্রের অনুশাসন মানিতে চায়—সেও ঐ শাস্ত্রের মত ঝুটা। এই সব ভাবিতে ভাবিতে অরুণ হঠাৎ কঠোর হইয়া কহিল—"না নবু, তোমার আজ আমাদের বাড়ীতে খাওয়া চলবেনা।"

নবকিশোর জোর করিয়া অরুণের হাতদুটি ধরিয়া কহিল—"তুমি আমায় মাপ কর ভাই, আমি না বুঝে তোমায় আঘাত কোরেচি। আজন্ম পাড়াগাঁয়ের সংস্কারের মধ্যে মানুষ আমি, সত্যকে চিনতে পারিনি, তাই ধর্ম্মের খোলসটা আঁকড়ে ধরে শুধু মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি।"

"তা যদি বুঝতে পেরে থাক, তবে এত বড় কথা কী কোরে বল্লে—"

"তোমার কাছে আবার ঘাট মানছি ভাই, আমায় মাপ কর। এখন আমি বুঝতে পেরেচি, আমায় বিশ্বাস করতে পারো। শাস্ত্রকে বড় কোরতে গিয়ে অন্তরকে আমি অবহেলা করতে পারি না। আমি অণিমাকেও একদিন বোলেছি—একটা মাস ধরে তোমরা আমায় যা দিয়েছ, আজন্ম শাস্ত্র আঁকড়ে ধরে থাকলেও, ভগবানের কাছেও তা' কোন দিন পাবার দাবী রাখিনা। সৌম্য ছেলেমানুষ। ওর কথায় কিছু মনে কোরোনা, কিন্তু আমি আর কোন দিন এ ভুল করবোনা। দোষ যা' ক'রেছি তার প্রায়শ্চিত্ত আছে এবং জীবন ভোর তাই এবার থেকে শুধু পালন কোরে যাব!"

"কিন্তু তুমি সত্য দোষ বোলে তা' মানো?"

"আমি একশবার বলছি অরুণ—তা' আমি মানি।"

"তবে আমাদের নিমন্ত্রণ এখনও বজায় রইল। কিন্তু এ কথা আমি অনুকে সব বোলবো।"

"বলা কি একান্তই দরকার ভাই ?"

অরুণ "হ্যাঁ" বলিয়া পা বাড়াইতেই নবকিশোর তাহার হাতে সেই গোলাপ ফুলটি দিল—বলিল, "অনিমাকে এটি দিও। মার প্রসাদী ফুল।"

অরুণ চিন্তিত মনে গোলাপটি গ্রহণ করিয়া বিদায় লইল।

অস্থির মন লইয়া নবকিশোর সেদিন মধ্যাহ্নেই করুণাময়ীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাষ্টার মহাশয় তখন কলেজে, করুণাময়ী বারান্দার একপার্শ্বে রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া খোকার জামা সেলাই করিতেছিলেন।

হঠাৎ অ-সময়ে নবকিশোরকে আসিতে দেখিয়া করুণাময়ীর কেমন যেন আশ্চর্য্য লাগিল। সচরাচর নবকিশোরকে না ডাকিলে সে স্ব-ইচ্ছায় এখানে আসেনা।

'বড়দি'—বলিয়া নবকিশোর ডাকিতেই তিনি সস্নেহে কিশোরের মুখের দিকে তাকাইলেন। দেখিলেন কিসের যেন একটা চিন্তা আসিয়া তাহার সদা-প্রফুল্ল মুখখানিকে বেদনার রংয়ে ম্লান করিয়া তুলিয়াছে। কিশোরকে তিনি বড় একটা ভাবিতে দেখেন নাই। আজ এমন কী ভাবনা আসিয়া তাহার হৃদয়কে ক্লিষ্ট করিয়াছে তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া করুণাময়ী শঙ্কিত হইলেন।

পরে, কিশোরের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন—"কী ?"

"বড়দি', আজ বড় একটা অন্যায় কাজ হ'য়ে গেছে"—বলিয়া তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নের অপেক্ষা না রাখিয়া অরুণ ও অনিমা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার ভাঙ্গিয়া বলিল।

করুণা সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন, তাহার পর সহজ সুরে কহিলেন—

"বেশ ত দোষ যখন বুঝতে পেরেছ তখনই তার প্রতিকার হ'য়ে গেছে, আজ অনিমার নিমন্ত্রণ তোমায় গ্রহণ কোরতে হবে। মনে যদি কিছু ক্ষোভ থাকে—এতেই তা' কেটে যাবে।"

"আপনিও তাই বলেন?"

করুণাময়ী প্রশ্ন শুনিয়া হাসিলেন—পরে তিনি দ্বিধাশূন্য পরিষ্কার কণ্ঠে কহিলেন—"তাই বলি কিশোর, আগে জিজ্ঞাসা কোরলেও তাই বলতুম এবং তাতে হয় ত' অরুণের কাছেও তুমি এমন কোরে অপদস্থ হোতেনা।"

"কিন্তু আমি ত' সত্যই কারুর হাতে খাইনা বড়দি।"

করুণাময়ী কহিলেন—"কারুর কথাটা বাহুল্য মাত্র। তুমি অব্রাহ্মণের হাতে খাওনা এই ত? কিন্তু আমিও ত' কিশোর কারুর বাড়ীতে কখনও খাইনা, তবুও ত' আমায় এসব জিনিষ স্পর্শ করেনা।"

জবাব শুনিয়া কিশোর সন্দিগ্ধ হইল। কহিল—"তা হলে আপনি কি কোরে সমর্থন করছেন! এই অবস্থায় পড়লে আপনি কি কোরতেন বড়দি'—"

করুণাময়ী কহিলেন—"কিন্তু আমার আর তোমার কথা যে স্বতন্ত্র ভাই। আমি একটা নিয়ম মানি—কিন্তু গোঁড়ামী মানিনা, খেলে আমার জাতি বা ধর্ম্ম নষ্ট হবার বিন্দুমাত্র ভয় নাই—কিন্তু সংযম নষ্ট হবার ভয় আছে। এই সংযমের সাধনায় একটু কঠোরতা হয় ত' করি, কিন্তু তা ত' কাউকে আঘাত করেনা ভাই!"

নবকিশোর কহিল—"অন্তর যদি তাতে সায় না দেয় বড়দি?"

"তবে সে সংযমের ত' কোন মূল্যই থাকবেনা কিশোর। পাঠদ্দশায় ছেলেরা যে সংযম করে—মনের সায় তাতে কতটুকুই বা থাকে এবং তাই থাকেনা বোলেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা' মূল্যহীন হ'য়ে দাঁড়ায়। সত্যের উপর যার প্রতিষ্ঠা নয়, তা কখনও চিরস্থায়ী হয়না।"

"তবে আমি যে আচার এতদিন পালন ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রেছি, তা কী মিথ্যা বড়দি ?"

"মিথ্যা বই কি ভাই ! চেষ্টাই তুমি কোরে এসেচ কিন্তু মন তাতে সায় দেয়নি। পাড়াগাঁয়ের জন্মগত সংস্কারের একটা আদর্শ তোমার মনে ছিল, আর পাঁচজনের মত তাই তুমি পালনীয় বোলে মনে কোরে এসেছ, হয়ত পালন কোরতেঁ চেষ্টাও কোরেছ কিন্তু সত্য বোলে তা কোন দিন সহজভাবে গ্রহণ করনি। যদি তা' কোরে থাকতে পারতে, তা হোলে আজ অরুণকে জবাব দেবার আগে এ কথা তোমার মুখ থেকে কখনও বের হোতনা যে—"ধর্ম্মের খোলসটা আঁকড়ে ধরে এতদিন শুধু মিথ্যাকেই আশ্রয় দিয়ে এসেচি।" এতদিন পর তোমার নিজের আচরণ যখন তোমার কাছে মিথ্যা বোলে মনে হয়েচে—তখন তাকে সকল দিক দিয়েই বর্জ্জন করা উচিত।"

"কিন্তু আমি যা বুঝেছি তাই কি সত্যি ?"

"সত্যি বই কি কিশোর ! (হৃদয়ের বড় ধর্ম্ম আর নেই।) এই যে অনিমা ও তার দাদাদের ব্যবহারে যে আগ্রহ ও একাগ্রতা, তুমি কি বোলতে চাও তার কোন দাম নেই ? বরং এর পরেও যদি তুমি তাদের আহ্বান উপেক্ষা কোরতে সেটা তোমার পক্ষে মহাপাপ হোত।"

"তবে আপনি কেন সংযমের দোহাই দিয়ে ছোঁয়া-ছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলেন ?"

এবার নবকিশোরের কথায় করুণাময়ী সত্যই হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন—"ছোঁয়া-ছুঁয়ি আমি কোনদিন বাঁচিয়ে চলি না কিশোর—সংযম বাচিয়ে চলি। কিন্তু তোমার ও আমার পথ ত' এক নয় ভাই। আমি একটা সাধনার পথ নিয়েছি, সংযম যার লক্ষ্য ! কিন্তু তাও কি সব সময় পারি ভাই ! আমি যার সঙ্গে ঘর করি তিনি যে সংযমের অবতার !" বলিয়া করুণাময়ী হাসিতে লাগিলেন।

"তবে এই আমার পথ বড়দি'—"

"হ্যাঁ ভাই এই তোমার পথ। মানুষের ধর্ম্ম বা আচারকে বড় কোরতে গিয়ে অন্তরের শাসনকে উপেক্ষা কোরো না।"

"তবে খুড়ীমার হাতের রান্নাও আমি খেতে পারি বড়দি?"

"সহস্রবার, লক্ষ্যবার কিশোর। সে অন্ন তোমার কাছে জগন্নাথের মহা-প্রসাদ। শাস্ত্র বা ধর্ম্মের আমিই বা কতটুকু জানি ভাই—কিন্তু এটুকু জোর কোরে বোলতে পারি—তার উচ্ছিষ্ট খেলেও তুমি সেই ব্রাহ্মণই থাকবে। (তোমার অন্তরের যে শুচিতা, তাই তোমার ধর্ম্ম তাই তোমার পরিচয়। গুহক চণ্ডালের আতিথ্য গ্রহণ কোরেও যিনি সকল ধর্ম্মের আধার সেই পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণের নির্দ্দেশের চেয়ে—মানুষের নির্দ্দেশ বড় নয়। সমাজকে বেঁধে রাখবার জন্য যা দরকার তা হচ্ছে শাস্ত্র। কিন্তু হৃদয়কে বেঁধে রাখবার জন্য যা' দরকার তা হচ্ছে ধর্ম্ম। সমাজের শাস্ত্রকে উপেক্ষা কোরেও যদি তুমি হৃদয়ের ধর্ম্মকে বাঁচিয়ে রাখতে পারো—তাতে হয় ত' ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষকে বিদ্রোহী কোরে তুলবে কিন্তু তাতে তোমার জাতি নাশের সম্ভাবনা নাই, পবিত্র ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না।) কিন্তু এসব ত' তুমি নিজেই জানতে কিশোর?"

কিশোর এতক্ষণ তন্ময় হইয়া বড়দির কথা শুনিতেছিল, কহিল—"বড়দি জানতুম কিনা জোর কোরে বোলতে পারিনে, হয় ত জানলে আজ অরুণকে কষ্ট দিতুম না। কিন্তু এমন কোরে বুঝিয়েও ত' কেউ আমাকে দেয়নি কোন দিন! আচ্ছা আপনিই বা এত কথা কি কোরে শিখলেন, বড়দি?"

করুণা সকৌতুকে কহিলেন—"কত কথা, কিশোর?"

"এই এমন সূক্ষ্ম কোরে শাস্ত্রকে বিশ্লেষণ ক'রবার ক্ষমতা?"

"সে সবই তোমার ওই মাষ্টার মহাশয়ের কাছে শেখা।"

জবাব শুনিয়া নবকিশোরের বিস্ময়ে দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। এই কিছুক্ষণ আগে মাষ্টার মহাশয়ের নামের উল্লেখ করিয়া করুণাময়ীই বিদ্রূপ করিয়া কহিয়াছেন – বিচারের ধার দিয়েও যান না—তিনিই এই আচার পরায়ণা পরম নিষ্ঠাবতী নারীদের উপদেষ্টা! অসম্ভব! এ কথা বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া বুদ্ধিমতী নারী বুঝিলেন, তাহার কথায় কিশোরের সন্দেহ যায় নাই। তিনি তখন শান্ত ও সহজ কণ্ঠে কহিলেন—"বিশ্বাস হোল না নবু? তোমার মাষ্টার মহাশয়কে যে কেউ চিনতে পারে না ভাই! এত বড় বিশ্বাস নিয়ে তিনি এক একটি কথা বলেন যে মনে হয় ভগবানই বুঝি তাঁর অন্তর দিয়ে কথা কইছেন। হৃদয়ের ধর্ম্মকে পূজা কোরতে আমি তোমার মাষ্টার মহাশয়ের কাছেই শিখেছি।"

"তবে এত সংযমেরই বা দরকার কি বড়দি?"

"আমি যে মেয়েমানুষ ভাই! বাঁধাবাঁধি একটা কিছু দরকার। সংসারে ত কিছুই ত' করবার সুযোগ নেই। তবু ওরি মধ্যে একটা সহজ সোর পথ বেছে নিয়ে সেইটেই পালন কোরে খানিকটা তৃপ্তি পাই।"

বড়দি', আজ থেকে আপনি আমার গুরু।"

করুণাময়ী হাসিয়া কহিলেন—"সত্যি? তা' হলে গুরু দক্ষিণার কিছু ব্যবস্থা কর ভাই।"

কিন্তু এ সস্নেহ পরিহাস আজ নবকিশোর পরিপাক করিতে পারিল না। সে ছল ছল কণ্ঠে কহিল—"বড়দি' আশীর্ব্বাদ করুন যে ধৃষ্টতা যেন আমার কখনও না হয়। এই যে জামা-কাপড় আজ পরে আছি, এও আপনারই দান। কিন্তু তার তলে আমার যে হৃদয় এতদিন ছিল—তা'ও আজ আপনার চরণে নিঃশেষে অঞ্জলি দিলুম। এখানে আপনিই

উপদেষ্টা, আপনিই তার গুরু। এর বড় দক্ষিণা আর আমার জানা নেই—"বলিয়া সে উঠিবার উপক্রম করিল!

কথা শুনিয়া করুণাময়ীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কহিল—"ভাই কিশোর, আশীর্ব্বাদ করি জীবনে তুমি সুখী হও, মানুষ হও। অনিমাকে তুমি কখনও উপেক্ষা কোরো না। সে তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।"

অনিমার কথায় কিশোর একবার ঘাড় ফিরাইয়া কহিল—"তাদের আপনি জানেন বড়দি'?"

করুণাময়ী কহিলেন—"জানি ভাই। নিবারণবাবুর মেয়েরা ভাল। সমাজে তাদের সুনাম আছে।"

যাইতে যাইতে কিশোর শুধু কেবল বড়দির কথাটিই ভাবিতে লাগিল। ধর্ম্ম বা শাস্ত্র সম্বন্ধে যেটুকু বিরোধ বা সন্দেহ তাহার মনে স্থান পাইয়াছিল করুণাময়ীর সহিত আলোচনায় তাহা জলের মত স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে। বোধ করি এই সব সমস্যা এমন সহজ করিয়া মীমাংসা করিয়া ধরিবার আর কাহারও সাধ্য ছিল না। কিন্তু করুণাময়ী তাহা সুবিচারের তৌল-দণ্ডে এমন করিয়া ওজন করিয়া মূল্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন—যে তাহার সত্যতায় সন্দিহান হইয়া অন্তরে অন্তরে ক্লেশ বোধ করিবার অবকাশ ছিল না। সে নানা দিক দিয়া বিচার করিয়াও যাহার স্বরূপ ধরিতে পারে নাই—করুণাময়ী তাহারই যথার্থ মর্ম্মার্থ রূপটি সত্যের দর্পণে প্রতিফলিত করিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু তাঁর শেষ কথাটি—'অনিমাকে কখনও উপেক্ষা কোরো না, সে তোমাকে ভালবাসে'—তাহার কানে আসিয়া কেবলই ঘা দিতে লাগিল।

অনিমা তাহাকে স্নেহ করে, আদর করে, আচারে-ব্যবহারে একটা আত্মিক টানও ফুটিয়া উঠে—সে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। কিন্তু

তাহা যে ভালবাসারই নামান্তর—নবকিশোর তাহা মনে মনে সন্দেহ করিলেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। করুণাময়ী তা কেমন করিয়া সত্য বলিয়া জানিলেন ?

নবকিশোর যাহার সহিত মিশিয়া, যাহার সঙ্গ লাভ করিয়া যে সত্য আবিষ্কার করিতে পারে নাই, শুধু বাহ্যিক আচরণ দেখিয়াই মজিয়াছে—আর একজন তাহাকে চোখে না দেখিয়াই, তাহার অন্তরটি কেমন করিয়া এমন স্পষ্ট দেখিতে পাইল ? অনিমা জোর করিয়া একজনকে আপন করিতে চায়, তাহার অধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়—ইহা সে ভালই বুঝিয়াছে ! কিন্তু সে জোর অধিকারের তলায় তাহার নারী হৃদয়ের গোপন ভালবাসাটুকু সে যে এ হতভাগ্যের প্রতি এমন নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে বা দিতে পারে—তাহা তখন পর্য্যন্ত নবকিশোরের কাছে অজ্ঞাতই ছিল। Gopal

তথাপি নবকিশোরের মনে হইল করুণাময়ী মিথ্যা কহেন নাই। তাহার বড়দি' মিথ্যা কথা কহিতে জানেন না। কিন্তু কেন ? যদি সত্যই সে তাহাকে ভালবাসিয়া থাকে, জোর করিয়া বলিলেই পারিত, 'এখানে আজ তোমায় আহার করিতে হইবে।' নিমন্ত্রণের আড়ম্বর কিছুমাত্র দরকার ছিল না।

নবকিশোর মনে মনে ভাবিল—আজ সে অনিমাকে শাস্তি দিবে। সে ভালবাসুক ক্ষতি নাই—কিন্তু সে ভালবাসার অপমান সে সহিবে কেন ? করুণাময়ী ও কৃষ্ণপ্রেয়সী তাহাকে ভালবাসে কিন্তু তাহারা ত কোনদিন বলে না—'কিশোর তুমি এটা করবে কি না ?' 'তোমায় এটা করতে হবে'—ইহাই ত' তাহাদের অধিকার। সে ভালবাসা অনুরোধ বা অনুমতি অপেক্ষা রাখে না বলিয়া, কিশোরকে কোনদিন ভাবিতেও হয় না, তাহা পালন করিবে কি না ?

কিন্তু যাহাকে ঘিরিয়া এত বিরোধ, তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার সমস্ত অভিমান চূর্ণ করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেও—যথাসময়ে নবকিশোর অনিমার সম্মুখীন হইলে, তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রশ্ন করিবার সহজ উৎসাহটুকুও লোপ পাইল! শান্ত ভাষা ভাষা চোখের যে সমাহিত দৃষ্টি নবকিশোরের হৃদয়ের কথা পাঠ করিবার পক্ষে তাহাই ত' যথেষ্ট। তবে আর কথার প্রয়োজন কি? মনের ভাষা যেখানে মুখের কথার অবকাশ রাখে না। জন্ম জন্ম সেখানেই ত' সকল প্রশ্ন ও সকল উত্তরের মীমাংসা হইয়া আছে। তবে আর কথা কাটা কাটির প্রয়োজন কি? নবকিশোর তন্ময় হইয়া অনিমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল—দেখিল সেখানে সে মূর্ত্তিমতী আনন্দ, তাহারই একটা কণা আজ তাহাকে উপহার দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছে।

তাহার দেহ-লতাকে ঘিরিয়া সৌন্দর্য্যের যে লীলা-কমল আজ মাথা তুলিতে সুরু করিয়াছে—তাহার আঘ্রাণ আজ আর একজনের অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া, মাতাল করিতে সুরু করিয়াছে।

নবকিশোর দেখিল, সকালের সেই প্রসাদী গোলাপটি যে কেবল শুধু ফুটিয়াই ক্ষান্ত ছিল অনিমার কৃষ্ণ কুন্তলের গুচ্ছ বেড়িয়া তাহারই পাপড়ীগুলি আজ যেন স্বচ্ছন্দে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নবকিশোর পরিপূর্ণ তৃপ্তি লইয়া সেই সৌন্দর্য্য পান করিতে লাগিল—মুখ দিয়া একটি কথাও কহিতে পারিল না।

কবির ছন্দ আজ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া সুন্দরী অনিমার সারা অঙ্গে সুরের হিল্লোল তুলিতে সুরু করিয়াছে।

অনিমা ছাড়া, তাহার পিতা, দাদা ও মাধুরী আজ তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল।

কিন্তু মানুষ নির্ব্বাক হইয়া কতক্ষণ থাকিতে পারে! অনিমা কহিল,—

"সকালে আজ কালীঘাটে গিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"পূজা দিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কালই সকালে বাড়ী যাবেন ?

নবকিশোর সেবারেও সংক্ষিপ্ত ভাবে জানাইল—"হ্যাঁ।"

মাধুরী কাছে আসিয়া মাষ্টার মহাশয়ের হাত ধরিয়া কহিল—"আবার কবে ফিরবেন ?"

নবকিশোর মাধুরীকে কোলে তুলিয়া লইল ? পরে তাহার রেশমের মত নরম, কাল কাল কাল থোকড়া চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—"ছুটী ফুরোলেই আসবো।"

"নবুদা' বাড়ী গিয়ে আমায় চিঠি দেবেন ?"

নবকিশোর সস্নেহে কহিল, "নিশ্চয়ই দেব। পরীক্ষার ফল বে'র হওয়ামাত্র আমায় জানিও।"

অনিমা এবার মাধুরীর দিকে ফিরিয়া কহিল—"মাধু এবার ফার্ষ্ট হবে নিশ্চয়ই ?"

মাধুরীর পিতা তাহা শুনিয়া কহিলেন—"কি রে মাধু তুই এবার ফার্ষ্ট হ'তে পারবি তো ?"

মাধুরী কৌতুকের দৃষ্টিতে মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইল। নবকিশোর পরম উৎসাহে কহিল—"মাধুরী এবার নিশ্চয়ই ফার্ষ্ট হবে—কেমন মাধু ?"

মাধুরী হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। বলিল—"যদি না পারি ?"

অনিমা তাহার জবাব দিল—"তা হ'লে তোকে তোর নবুদা' আর পড়াবেন না।"

"ঈস্, পড়াবে না বই কি? হ্যাঁ নবুদা, তাহ'লে আর আমাকে পড়াবেন না?"

"নবু হাসিয়া কহিল—"না—"

"তবে আমিও আর ফার্ষ্ট হ'বো না। আমি রাগ কোরে এবার থেকে লাষ্ট হ'বো।"

অনিমা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল—"নবকিশোরবাবু শুনলেন ত' আপনার ছাত্রীর কথা। ওকে আপনার বয়কট করা উচিত!"

নবকিশোর কহিল—"ও যদি সত্যই এবার ফার্ষ্ট না হোতে পারে তবে আমাকেই ওর বয়কট করা উচিত। ভাল কোরে পড়াতে পারলুম কই? এবার মাধুরী ক্লাশে উঠ্‌লে খুব মন দিয়ে পড়াবো।"

"তবে যে বল্লেন—আমায় পড়াবেন না?"

"তোমায় কি না পড়িয়ে পারি, একি কক্ষণো হয়?—" বলিয়া সস্নেহে নবকিশোর মাধুরীর পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল।

হঠাৎ অরুণ কহিল—"আচ্ছা নবু, এত অল্প বয়সে এ মাষ্টারী বিদ্যা শিখ্‌লে কোত্থেকে? কই আমি ত' পারিনে—"

অনিমা, হাসিয়া কহিল—"কে বল্লে তুমি পার না? তুমি শুধু গাধার অঙ্ক পার না।"

কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল।

নবু কহিল—"তার থেকে বড় বিদ্যা ত' তুমি জান ভাই। কলেজের থিয়েটারে তুমি যে একজন মস্ত বড় রিহার্স্যাল মাষ্টার!"

অরুণ হাসিয়া কহিল—"হ্যাঁ, সে বিদ্যায় তোমায় হারিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা নবু, তুমি একটা পার্ট নিলে না কেন?"

নবু হাসিয়া বলিল—"পারিনে ব'লে।"

"কিন্তু সাজালে তোমায় ভারি মানায়!"

অনিমাও মনে মনে কহিল সত্যি কথা। ছেলেটা কন্দর্পের মত কান্তি লইয়াই জন্মিয়াছে কিন্তু কোন দিন সাজগোজ করিতে জানিল না। শুদ্ধ একটি খদ্দরের সার্ট ও চাদরে সে সবচেয়ে রূপবান যুবককেও লজ্জা দিতে পারে। সে একটু চেষ্টা করিয়া প্রসাধন করিলে যে কোন নাটকে, নায়কের আদর্শ রক্ষা করিতে পারিত।

কিন্তু অরুণের এই Compliment শুনিয়া সে লজ্জায় লাল লইয়া উঠিল। এই সব বাদ্বিবাদে তার পিতা এতক্ষণ নিশ্চুপ হইয়া শুনিতেছিলেন এবার অরুণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তোদের এবার কি প্লে হবে রে অরুণ ?"

"চিরকুমার সভা।"

"তুই কি সাজ্‌বি ?"

ইচ্ছা হইল অনিমা বলে—দারুকেশ্বর ! কিন্তু দাদার দিকে তাকাইয়া তাহার আর কথা ফুটিল না। হঠাৎ নবকিশোর অরুণের হইয়া জবাব দিল—

"ও কি ক'রে সাজ্‌বে ? ও যে dramatic director !"

অনিমা এবার কৌতুকের সুরে কহিল—"আচ্ছা দাদা, নীরবালা তোমাদের কে সাজ্‌বে ?"

"একটি ছেলে।"

"গোঁফ কাটা ছেলে না গোপওয়ালা ?" বলিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল। অরুণ উষ্ণ হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া কহিল—"ফের জ্যাঠামো ক'র্‌ছিস, গোপওয়ালা ছেলে কখনও মেয়ে মানুষ সাজতে পারে ?"

"আচ্ছা সে ছেলেটির নাম কি দাদা ?"—আব্দারের ভঙ্গীতে অনিমা এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিল।

"তার নাম—বিধু !"

"ওমা, তা হ'লেই ঠিক হ'য়েচে! বেটা ছেলে ব'লেও কিছুতে আট্‌কাবে না, ঐ নামের গুণে কেটে যাবে।"

অনিমার কিন্তু এ নির্দ্দোষ পরিহাসে অরুণ মনে মনে চটিতেছিল; সে এবার কুপিত হইয়া কহিল—"জানিস্, আমাদের যতীন মিত্তির এক অক্ষয়ের পার্টেই মাত করে দেবে, তার তুল্য এমেচার এক্টার professional stage-এও নেই!"

"আর শৈল?"

অরুণ কহিল—"শৈল একটু নিরেশ, কিন্তু অক্ষয়ের কাছে কেউ পাত্তা পাবে না।"

অনিমা আবার কৌতুকের সুরে কহিল—"দাদা, আমায় জানালে তোমায় একটি সত্যকারের শৈল দিতে পাত্তুম"—বলিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

"কাকে দিতিস্ শুনি?"

অনিমা চোখের ইসারায় নবকিশোরকে দেখাইয়া কহিল—"এত বড় শৈল আর পেতে না দাদা!"

কথা শুনিয়া নবকিশোরের দৃষ্টি বিস্ফারিত হইল। সে প্রতিবাদের সুরে কহিল—"আমি শৈল?"

অনিমা কহিল—"একশ বার! এমন নিপুণ ছদ্মবেশে আপনার স্বরূপটি ঢেকে রাখতে ক'জন পারে বলুন ত?—কিন্তু ও কি?"

কথা শেষ না করিতেই অনিমা নবকিশোরের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল—অবসাদে তার মুখখানি হঠাৎ কালি হইয়া উঠিয়াছে। এ পরিহাস অপর কেহ অনুধাবন করিতে পারিল কিনা জানা গেল না, যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, সে কিন্তু অপরিসীম বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। অনিমা তাড়াতাড়ি কহিল—"রাগ কোরলেন? কিন্তু কে জানত বলুন দেখি আপনি অত orthodox!"

নবকিশোর পরিহাসের কারণ বুঝিল—অরুণ সকালে সব ফাঁস করিয়া দিয়াছে। কিছুই গোপন রাখে নাই। কিন্তু তাহার কাছে ইহা ত' আর পরিহাস নয়—এ যে মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপ! সে প্রবলবেগে বাধা দিয়া কহিল—"কখনও নয়। আপনি যা' শুনেছেন সব মিথ্যে কথা।"

"আপনি orthodox ব্রাহ্মণ নন?"

"আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু আর orthodox নই।"

"জাতি বিচার আপনি মানেন না?"

"না।"

অনিমা কহিল—"মিছে কথা, আজও সকালে আপনি একথাটা মানতেন, এখন স্বীকার কোরছেন না।"

অনিমা কিন্তু সহজে তাহাকে নিষ্কৃতি দিল না, কহিল—"যদি তাকে মিথ্যা বোলেই জানতেন, তবে বিশ্বাস কোরতেন কী বোলে!"

নবকিশোর বলিল—"গোড়ায় অনেক বিশ্বাসই ত' করি। ভুল বুঝতে পারলে শেষকালে তা ভাঙ্গতেও ত' দেরী লাগে না।"

অনিমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—"এ ভুল আমি আপনাকে ভাঙ্গতে কখনও দেব না। আপনি মনে প্রাণে জানেন জাতি হিসাবে আপনি আমাদের থেকে বড়। ব্রাহ্মণের আচার আপনি পালন করেন, অব্রাহ্মণের হাতে খাওয়া আপনি দোষের বোলে মনে করেন। শুধু আমরা বন্ধু বোলে, কেবল বন্ধুত্বের খাতিরে এটা এড়িয়ে চলতে চান। কিন্তু তা আমি আপনাকে হ'তে দেব না।"

অরুণ ও তাহার পিতা দেখিল কথায় কথায় ইহারা একটা বিবাদ বাধাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আলোচনা শেষ না-হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা বাধা দিতেই পারিল না।

নবকিশোর বলিল—"হৃদয়ের ধর্ম্মকে আমি সবার বড় ধর্ম্ম বোলে মনে করি, শাস্ত্রের বিধি তার কাছে কিছু নয়।"

অনিমা কহিল, "না, আপনি তা মানেন না। আপনার সে ক্ষমতাও নেই, নইলে শুধু গঙ্গাতীরের নজীর দেখিয়ে আজ শূদ্রের বাড়ীতে আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোরতে সাহস হোত না। কিন্তু আমি সে নিয়ে আলোচনা কোর্‌তে চাইনে, কিশোরবাবু, আপনি আমার অতিথি।" পরে আহার প্রস্তুত জানিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া কহিল—"আসুন, খেতে আসুন।"

এ আহ্বানে সকলেই উঠিল। কিশোরের অন্তর লজ্জা ও বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সত্যই তবে অনিমাও ভুল বুঝিল। কেমন করিয়া তাহার এ ভুল ভাঙ্গাইবে, কেমন করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিবে যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানুষ একই ভুল করিলে, একটি নিমেষের মীমাংসায় তাহা চুরমার হইয়া যাইতে পারে? কিন্তু অনিমা ত তাহা বিশ্বাস করিবে না! সে যতই ভাবিতে লাগিল অন্তরের চতুর্দ্দিকে হাতড়াইয়া তাহার কিনারা করিবার কোন উপায় নাই দেখিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইল। কহিল—তুমি ত' অন্তর্য্যামী। এ হৃদয়ে বাস করিয়া সবই ত' দেখিতেছ। তবে কেন একবার জোর করিয়া এ অবোধ বালিকাকে বুঝাইয়া দাও না—সে যা' বুঝিয়াছে সব ভুল। হৃদয়ই সত্য, তাহারই অনুশাসন আজ তাহার পালনীয় ধর্ম্ম। মনে প্রাণে তাহাই সে বিশ্বাস করে এবং সেই বিশ্বাস প্রতিপন্ন করিতেই আজ সে এখানে আসিয়াছে।

কিন্তু নিষ্ঠুর বিধি তাহার সহায় হইলেন না। আহারের স্থানে আসিয়া দেখিল—সত্যই আজ উপবীতধারী ব্রাহ্মণ সেখানে পরিবেশন করিতেছে আর দাড়াইয়া অনিমা তাহারই তদারক করিতেছে।

কিশোরের হৃদয় বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ডাক ছাড়িয়া তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। সে কেমন করিয়া আজ তাহার পিতা ও ভ্রাতার সম্মুখে পরম লজ্জাহীনের মত ইহার প্রতিবাদ করিবে! মনে মনে তাহার অনিমার উপর রাগ হইল। মনে হইল তাহার আদর তাহার ভালবাসা সবই একটা মিথ্যা অভিনয়। নতুবা সে আজ এমন করিয়া সবার সামনে তাহাকে বিনা দোষে নির্য্যাতন করিতে পারিত না। কিন্তু জ্ঞানহীন যুবক আজ বুঝিল না—এইটুকু ব্যথা দিতে আজ সে হাসি মুখে কত বড় ব্যথা গোপন করিয়াছে। দু'দিন আগেও যে আতিথ্য সে নিজ হাতে সম্পন্ন করিতে পাইয়া ধন্য হইয়াছে, আজ তাহারই ভার অপরের হাতে তুলিয়া দিতে, তার আকাঙ্ক্ষা, তার বিশ্বাসের মূলে কতখানি আঘাত নির্ম্মমভাবে সম্পন্ন করিতে হইয়াছে—মূর্খ কিশোর তাহার কতটুকুই বা খোঁজ রাখে!

তথাপি অনিমাকে আজ প্রবল শক্তি সঞ্চয় করিয়া হৃদয়ের ব্যথা গোপন করিয়া হাসি মুখে গৃহকর্ত্তার অধিকার গ্রহণ করিতে হইল! কিন্তু তাহার অতিথির দিকে চাহিয়া তাঁহার অন্তরের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া সে শঙ্কিতা হইল।

কোথায় সে মুখের চিরপ্রশান্ত দৃষ্টি! রক্তশূন্য মুখে কোন গতিকে সে আহারীয় লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

"কী হোল কিশোরবাবু, রাগ কোরেছেন বুঝি? কিন্তু রাগ ক'রে আপনি আজ আমার সঙ্গে পারবেন না। মন দিয়ে খান—"

অরুণ কহিল—"বৃথা চেষ্টা কিশোর। অনি তোমায় আজ সহজে ছাড়বে না।"

কিশোর মনে মনে অরুণের মুণ্ডপাত করিতে লাগিল। নিজের নির্ব্বুদ্ধির জন্যও রাগ হইল কম নয়। কিন্তু আহারে যে তাহার রুচি

হয় না। এ অনিচ্ছার অন্ন সে কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে। অনিমা আসিয়া ফল মিষ্টান্ন দধি ও রাব্‌ড়ী নিজ হাতে পরিবেশন করিতে লাগিল। কিশোর তাহাই কোন গতিকে কিছু কিছু খাইয়া বিরস বদনে আহার সমাধা করিল।

সকলে একে একে হাত মুখ ধুইতে গেলে অনিমা কিছুক্ষণের জন্য কিশোরকে একান্তে পাইয়া কহিল—"এ অনিচ্ছার অন্ন না খেলেই কি হোত না?"

"কিন্তু এ অন্ন খেতে ত' আমি আসি নি!"

অনিমা দেখিল এই কথাটুকু মাত্র উচ্চারণ করিতেই কিশোরের মুখ বেদনায় কালি হইয়া উঠিয়াছে।

তথাপি সে শ্লেষ করিতে ছাড়িল না, কহিল—"তবু, পৌরুষটুকু ছাড়তে রাজী ন'ন।"

কিন্তু এ বিদ্রূপ আর সে সহ্য করিতে পারিল না। কণ্ঠে যতদূর সম্ভব তীব্রতা মিশাইয়া কহিল—"আজ বুঝলুম তুমি অতি পাষাণী, অতি হৃদয়-হীনা। আমার কতটুকুই বা তুমি জান অনিমা? কিন্তু যদি জানতে আজ এমন কোরে আঘাত দিতে পারতে না।"

অনিমা আজ কী শুনিল? ঘাত-প্রতিঘাত করিতে করিতে অন্তর যেখানে দর্পণের মত স্বচ্ছ হইয়া আসে সেখানে আর কোন পক্ষই প্রশ্নের অবকাশ মাত্র রাখে না। নির্ব্বাক, নিস্পন্দ অনিমা, কিশোরের এ আত্মীয়-সম্বোধনে বিহ্বল হইয়া পড়িল। মুখে তাহার বাণী সরিল না। অন্তরের আনন্দ প্রাণপণে প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাহারই কয়েকটি কণা সারা মুখে ছিটাইয়া পড়িল।

কিশোর কহিল—"অনিমা, আজ তুমি মনে কী ভাববে জানি না! কিন্তু আজ মনের কথা লুকিয়ে রাখতেও পারছি না, সে ক্ষমতা আমার

নেই। বাড়ী যাবার আগে আজ আমি তোমায় ভাল কোরে বুঝিয়ে দিয়ে যাব যে, মানুষ অভিনয় কোরলেও তার একটা সীমা থাকা দরকার। আজ আমি ভুল শুনেছিলুম অনিমা—যে তুমি আমায় ভালবাস। অন্তরকে আঘাত দিয়ে ভালবাসার পরোয়ানা জারী করা চলে না। কিন্তু ও কি ?……”

কিশোর মুখের কথা শেষ করিতে পারিল না। যাহাকে প্রতিঘাত করিয়া সে আঘাতের প্রতিশোধ লইতে চলিয়াছে তাহার বিজয় গর্ব্ব আজ কোথায় ? অপরিসীম বিস্ময়ে অনিমার মুখের দিকে তাকাইতেই কিশোর দেখিল—অনিমার মুখের সমস্ত রক্তটুকু যেন নিঃশেষে উড়িয়া গিয়াছে। অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিয়া গণ্ড দুইটি ভিজাইয়া তুলিয়াছে।

কিশোর অনিমার হাত ধরিল—কহিল, “আমায় ক্ষমা কর, আমি সইতে পারিনি বোলেই তোমায় আঘাত দিয়েছিলুম। কিন্তু বিদায়ের পূর্ব্বে আজ আমি তোমার চোখের জল কিছুতেই বইতে পারবো না, অনি !”

অনিমা কিশোরের কথা শুনিয়া, প্রবল বেগে মনে বল সঞ্চয় করিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। কহিল—“আমায় তুমিও ক্ষমা কোরো, অনেক কথাই বলবার ছিল, কিন্তু সময়ও নেই, সুবিধাও নেই এখানে। যাবার আগে শুধু জেনে যেও—অনিমা তোমায় ভুল বোঝেনি !—এস, হল ঘরে যাই।”

মুখের কথায় সে বিরোধ কাটিল না। যাহাকে আঘাত করিয়া অন্তর ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল তাহারই চোখের জলে আজ কোথাকার গ্লানি কোথায় ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। একটি তরুণ ও একটি তরুণী উভয়ের কেহই জানিতে পারিল না, কেমন করিয়া আজ এ অসম্ভব সম্ভব

হইল। অব্যক্ত প্রেমের মন্দাকিনী ধারায় উভয়ের হৃদয়-স্বপনের রংয়ে রঙীন হইয়া উঠিল। কিশোর কতক্ষণ অনিমার দিকে চাহিয়া ছিল তাহার খেয়াল নাই, হঠাৎ অনিমা তাহার ধ্যান ভাঙ্গাইয়া কহিল—"কী দেখছ কিশোর?"

কিশোর কহিল—"গোলাপ ফুলকে সবাই বলে 'ফুলের রাণী', দেখছি সে-সৌন্দর্য্যকেও তুমি কেমন কোরে হার মানিয়েছ।"

"না। গোলাপই আজ আমায় হার মানিয়েছে। কিন্তু এটা তুমি আজ পাঠালে কেন?"

"আমার আর যে কিছু ছিল না অনি।"

অনিমা কহিল—"এটা ত' দু' দিনেই শুকিয়ে যাবে, কিন্তু এর স্মৃতিটুকু চিরদিন আমার বুকে পাঁপ্‌ড়ি মেলে থাকবে। আচ্ছা দাদাকে যখন তুমি এটা দিয়েছিলে, তখন এটা জান্‌তে?"

—"না, তখনও জানিনি।"

অনিমা কহিল—"তবে কখন জানলে?"

—"বড়দির কাছে, আজ দুপুরে!"

অনিমা কহিল—"বড়দির কাছে?"

—"হ্যাঁ, বড়দিই আজ আমায় দুপুরে বল্লেন।"

—"বড়দি কী বোল্লেন?

নবকিশোর কোন গতিকে বলিল—"তুমি আমায় ভালবাস।"

অনিমা কৌতুক করিয়া কহিল—"মিছে কথা, আমি তোমায় ভালবাসিনে।"

নবকিশোর জোরের সহিত কহিল—"বড়দির কথা কখনও মিছে হয় না।"

—"কেন হয় না?"

—"কারণ বড়দিকে কখনও কেউ মিছে কথা কইতে শোনেনি।"

তবুও অনিমা ভাবিল—এ লোকটির ব্যবহার কী বিচিত্র। কেহ তাহাকে ভালবাসে কি না, সে তাহা নিজে জানে না—কেবল বড়দি বলিয়াছে, তাহাতেই তাহার বিশ্বাস। কিন্তু বড়দিকে বড় করিতে গিয়া যে কিশোর নিজেকে এতখানি খাটো করিল—আজ প্রেমের এ অসম্মানে অনিমাকে আঘাত করিল না বরং দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া, পরিচয়ের অবকাশ না রাখিয়াও—যে বুদ্ধিমতী নারী এই আপনভোলা লোকটিকে কথার বাক্‌জালে পরাভূত করিয়া এই পরম সত্যটিকে আবিষ্কার করিয়া, তাহারই দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া এই সর্ব্বশক্তিময়ী মহিয়সী নারীর প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় অনিমার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনিমা কি ভাবিয়া আবার কহিল—"আচ্ছা বড়দি কখনও তোমায় জানান নি, তুমি আমায় ভালবাস কি না?"

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—"ধ্যেৎ, বড়দি কী করে জানবেন?"

অনিমা কহিল—"তুমি ত' জানতে, তুমি জানাও নি কেন?"

নবকিশোর কহিল, "যে ভিক্ষুক, সে ভালমন্দ যাচাই করে না। গণনা শাস্ত্রে আছে—Beggars are not choosers' ?"

অনিমা কহিল—"তাতেও তোমার অধিকার নেই। যারা চেয়ে নেয় তাদের দোষ হয় না। কিন্তু তোমায় আজ চুরির শাস্তি ভোগ ক'রতে হবে।"

—"কী শাস্তি দিতে চাও?"

—"তুমি বাড়ী গিয়ে রোজ আমাকে একখানা কোরে চিঠি লিখ্‌বে।"

—"রোজ?"

অনিমা কহিল—"হ্যাঁ!"

—"কিন্তু কেউ কিছু মনে কোরবে না?"

অনিমা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল—"কেউ কিছু মনে কোরবে কেন ?"

নবকিশোর কহিল—"তুমি মেয়ে মানুষ অনি !"

অনিমা কহিল—"এমনি কোরেই তোমরা আমাদের পরকালটা নষ্ট কোরেছ। প্রতিপদেই মনে করিয়ে দিতে চাও নারী পুরুষের সঙ্গে মিশ্‌লে, কথা কইলে, চিঠি পত্র লিখ্‌লে, তার হবে মস্ত বড় অপরাধ। পুরুষের পক্ষেও তাই। কিন্তু কেন ? তুমি তোমার আত্মীয় কোন মেয়েকে চিঠি লিখলে যদি অপরাধ না হয় আমি অনাত্মীয় বোলেই তাতে দোষ হবে ?"

"কিন্তু আমাদের দেশে পরমাত্মীয়কেও চিঠি লেখা যে অনেকের কাছে দোষের।"

অনিমা কহিল—"না পরমাত্মীয় বোলে মনে কোরলে ত' দোষের হয় না। অনেকের পক্ষে যাই হোক, তোমার পক্ষে তা' হওয়া কখনও উচিত নয়। আমার অভিভাবকরাও তা কখনও মনে করেন না।"

নবকিশোর কহিল—"তা' হলে লিখ্‌ব।"

—"রোজ ?"

নবকিশোর কহিল—"এ তোমার জুলুম। রোজ নয়, দু' তিন দিন অন্তর।—আজ তবে চলি ?"

অনিমা হাসিয়া কহিল—"চল্লুম বোলতে নেই। বল 'আসি'।"

নবকিশোর তাহারই পুনরুক্তি করিল।

অনিমা কহিল—"এস।"

এতক্ষণ ইহারা নিবারণবাবুর লাইব্রেরী ঘরে নিভৃতেই আলাপ করিতেছিল। বিদায়ের সময় আগত হইলে নবকিশোর উঠিয়া সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ছুটি লইল।

অনিমা গেট পর্য্যন্ত আসিয়া নবকিশোরকে আগাইয়া দিয়া গেল।

পরদিন নবকিশোর বাড়ী রওনা হইবার জন্য তোড়জোড় আরম্ভ করিলে সৌম্য এক অঘটন ঘটাইয়া বসিল। সে আব্দার ধরিল সে নবকিশোরের সহিত দেশে যাইবে এবং কয়েক দিন থাকিয়া আসিবে। নবকিশোর কথা শুনিয়া শঙ্কিত হইল—সৌম্য জেদ ধরিলে তাহার জের সহজে মিটিবে না, সে সঙ্গে যাইবেই এবং তাহার অভিভাবকদের অনুমতির জন্য বাধিবে না। ইহা নবকিশোর জানিত। তাই সে মনে মনে পীড়িত হইয়া কহিল—

"তুমি সেখানে কী কোরে যাবে ভাই? আমি সেখানে কোথায় থাকি, কোথায় কী খাই তা তোমার ধারণা নেই, আমায় নিজে রেঁধে খেতে হয়।"

"সে বেশ হবে, ভাই, নবুদা আমি রোজ তোমায় রেঁধে দেব।"

নবকিশোর কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিল। তথাপি সে বেশ জানে, আজন্ম সুখে লালিত-পালিত এই ধনী পুত্রটি মুখে যাহা বলে কাজে তাহা ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে।

তথাপি নবকিশোর জবাব দেয় না দেখিয়া সৌম্য চঞ্চল হইয়া কহিল—"তুমি জাননা, আমি এক বছর ট্রেনিং কোরে ছিলুম নিজের কাজ নিজে বেশ করতে পারব নবু দা—"

"তবু তোমার কষ্ট হবে যে ভাই, আর এই বড়দিনের সময় কোলকাতায় এত আমোদ আহ্লাদ ছেড়ে পাড়াগাঁয়েই বা কী দুঃখে যাবে?"

সৌম্য কহিল—"কোলকাতা আমার একটুকুও ভাল লাগে না নবুদা। পাড়াগাঁ আমার বেশ লাগ্‌বে। বড় জামাইবাবুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমি যাই, আমার বেশ লাগে—আর তুমি অমত কোরো না, তোমায় দু'টি পায়ে পড়ি নবুদা—" বলিয়া সে সত্যই নবকিশোরের পা ধরিতে গেল।

এমন পাগল ছেলেকে লইয়া নবকিশোর কী করিবে? সে নিশ্চুপ

থাকিলেও সম্মতি দিয়াছে জানিয়া—ছুটিয়া বাবা মা'র অনুমতির জন্য বাহির হইয়া গেল।

চ্যাটার্জ্জী সাহেব কখনও ছেলে মেয়েদের ন্যায্য আব্দারে বাধা দিতেন না। তাহা ছাড়া নবকিশোর যেখানে যাইতেছে সেই স্থানেই চ্যাটার্জ্জী সাহেবের পৈতৃক ভিটা। সে ভিটা এখন শূন্য। আত্মীয়স্বজন কেহ বাস করে না। দু' এক ঘর জ্ঞাতি আছেন তাও পৃথক! মাত্র একজন প্রাচীন গোমস্তা সেই বাটীতে থাকে—ঘর দুয়ার, যাহা যৎ সামান্য জমি জমা ও বাগান বাগিচা আছে তাহারই দেখা শোনা ও তদ্বির করে।

সৌম্যের এখন ছুটি। কলেজ কামাই হইবার ভয় নাই। সেখানে গিয়া, যদি সে পিতৃ-পুরুষের পুণ্য ভূমিতে দুদিন থাকিয়াই আসে, তাহাতেই বা বাধা দিবার কি আছে! তিনি গোমস্তার নামে তাহাদের রওনা হইবার খবর দিয়া একখানা তার করিয়া সৌম্যকে যাইবার অনুমতি দিলেন।

কিন্তু সৌম্যের জননী, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী খুসী মনে তাহার যাওয়া সমর্থন করিতে পারিলেন না! তাঁহার পাড়াগাঁর প্রতি বরাবরই মনে ভয়, গেলেই সেখানে ম্যালেরিয়া ধরিবে। তথাপি এখন আর সৌম্যকে নিরস্ত করা সহজ নয়—যেহেতু সে যখন তাহার বাবার অনুমতি পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছে! সুতরাং কতকগুলি ঔষধপত্র ও একটি চাকরকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য তিনি নির্দ্দেশ করিলেন। সৌম্য এক এক লাফে তিন তিন সিঁড়ি পার হইয়া এক নিমেষেই সারা বাড়ীময় সোরগোল করিয়া তুলিল এখান হইতে বাক্স টানিয়া, ওখান হইতে জামা বাহির করিয়া, জিনিষপত্র চতুর্দ্দিকে ছিটাইয়া তাহার মাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া যথাসত্বর বাক্স সরাইতে অনুরোধ জানাইয়া আবার ঝড়ের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরে "নবুদা' আমি এক্ষুনি আসছি" বলিয়া সেই দণ্ডেই সে আনন্দ-

সংবাদ করুণাময়ীকে দিবার জন্য প্রবল বেগে এক সাইকেল ছুটাইয়া বাহির হইয়া গেল।

তার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে নবু ও সৌম্য ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। সঙ্গে চাকর আনিল না। কিন্তু মাতার নির্দ্দেশমত ঔষধগুলি লইতে ভুলিল না।

চ্যাটার্জ্জী সাহেবের তার পাইয়া তাঁর সাবেককালের গোমস্তা-বাবুটি মনে মনে শঙ্কিত হইলেন। বহুকালের এই বনেদী আসনটি এবার টলে বুঝি বা! চ্যাটার্জ্জী সাহেব মাঝে মাঝে Schcol Committeeর meeting উপলক্ষে দেশে আসেন—কিন্তু কখনও রাত্রিবাস করেন না। আজ চল্লিশ বছর চাকরীর আমলে গোমস্তা বাবুটি তাহা কখনও দেখেন নাই। হঠাৎ চ্যাটার্জ্জী-নন্দনের দেশে আসিবার হেতু কি? তাহার ধারণা ছিল—কলিকাতায় সর্ব্বপ্রকার সুখ ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বর্দ্ধিত, পূরাপূরি সাহেবী-ভাবাপন্ন বিলাত ফেরৎ কোন পরিবারের সন্ততির পক্ষে এই প্রকার পাণ্ডব-বর্জ্জিত অজ পাড়াগাঁয়ে আসা কখনও সম্ভবপর নয়। টেলিগ্রাফে কিছু খোলসাও লেখা নাই—'আমার বড় ছেলে যাইতেছে'—এই পর্য্যন্ত!

গোমস্তা রাসবিহারীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! চ্যাটার্জ্জী-নন্দনকে সে কোন দিন না দেখিলেও জানে—এইসব ঐশ্বর্য্য মদমত্ত Young Bengalরা কখনও ভাল হয় না, ভাল হইতেই পারে না। এই ত' আর এক মাস পূর্ব্বে গ্রামের আর একটি জমিদার-পুত্র কলিকাতা হইতে বন্ধুবান্ধব লইয়া শীকারে আসিয়াছিলেন। জীব-জন্তু তাহারা কতখানি শীকার করিয়াছিল তাহা তো সে বিলক্ষণই জানে—কিন্তু আমলা গোমস্তাকে ঠেঙ্গাইয়া, কর্ম্মচারীদের যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন করিয়া, কাচারি তোলপাড় করিতে কসুর করে নাই। বোধ হয় সে-সব কর্ম্মচারীদের

পিঠের ব্যথা এখনও সারে নাই। ইহারই পর আবার এক চ্যাটার্জ্জী সাহেবের নন্দন! সর্ব্বনাশ করিল আর কি? রাসবিহারী যতই মানস-নেত্রে ইহার আদত রূপটি কল্পনা করিতে লাগিল ততই তাহার মুহুর্মুহু হৃৎকম্প হইতে লাগিল। এ যাত্রা কতকগুলি বন্ধু আসিবে এবং কয়টা বন্দুকই বা সঙ্গে থাকিবে কে জানে?

চ্যাটার্জ্জী সাহেবের পরিত্যক্ত ভিটাই এখন তাহার ভিটা। তাহার সমস্তই প্রায় অব্যবহার্য্য। মাত্র দুইখানি ঘর বাসের উপযোগী, তাহার একখানিতে আবার রান্না হয়।

গোমস্তা প্রভুর বয়স হইয়াছে যথেষ্ট—সারা অঙ্গে বাত, নড়িবার চড়িবারও বিশেষ শক্তি নাই। উপরন্তু মাথার উপর একটি বিবাহিতা স্ত্রী। একটু পান হইতে চুণ খসিলেই কথায় কথায় সে দা কুড়াল লইয়া আদর করিতে আসে। সর্ব্বনাশ করিল আর কি! এই জলপাত্রটিকে সে এখন রক্ষা করে কোথায়? চ্যাটার্জ্জী নন্দন নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া উঠিবে, কতদিন থাকিবে কে জানে? ঐ একখানি ছোট ঘর, মরি-বাঁচি করিয়া তাহাই একটু ঘসিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে।

রাসবিহারী টেলিগ্রাম হস্তে হন্তদন্ত হইয়া তাহার অবিদ্যা ঠাকুরাণীর শরণাপন্ন হইল—বলিল "খেঁদি, সর্ব্বনাশরে বাবা, আর তোকে বড়ি দিতে হবে না এ জন্মে যদি বাঁচিস্, তোর বাপের পুণ্যি, আমারও বাপের পুণ্যি।"

সত্যই খেঁদি তখন পরম নিবিষ্টচিত্তে দাওয়ায় বসিয়া বড়ি দিতেছিল।

সে তাহার রকম দেখিয়া একবার ঘাড় তুলিয়া চাহিল।

রাসবিহারী তখন টেলিগ্রামের কাগজখানি উঁচু করিয়া তাহার চোখের সামনে ধরিয়া বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিল যে যমদূতের শমন আসিয়াছে—এখন শুধু প্রস্তুত হইবার পালা।

খেঁদি ভাবিল হয় ত আদালতের কোন পরোয়ানা। সে এত উচ্চ বাচ্যেও গা করিল না, বড়ি দিতে লাগিল।

রাসবিহারী রাগিয়া উঠিল,—কহিল "থাক্ তবে তুই বড়ি নিয়ে বসে, কাল সকাল থেকে যখন গাদন সুরু হবে, তখন তুই টের পাবি। সঙ্গে বন্দুক আসচে—পাঁচ ছটার কম হবে না"—বলিয়া সত্যই প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।

খেঁদি এতক্ষণে বোধ হয় রাসবিহারীর কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিল সে ছুটিয়া আসিয়া রাসবিহারীকে ধরিল এবং কাগজখানিতে সত্যই কী এমন সর্ব্বনাশের কথা লেখা আছে তাহা ভাঙ্গিয়া বলিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল।

এতক্ষণে খেঁদির চৈতন্য হইল দেখিয়া রাসবিহারী আস্ফালন করিয়া বলিতে সুরু করিল—তাহার জমিদার-নন্দন এখানে কালই প্রাতে আসিয়া পড়িবে—এখন জান্ লইয়া যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে তবে তাড়াতাড়ি তাহাকে কিছু দিনের জন্য গ্রামান্তরে গা ঢাকা দিতে হইবে। বস্তুতঃ খেঁদির এক বোনের বাড়ী ছিল ভিন্-গাঁয়ে। কখন কখন রাসবিহারীর সহিত কোঁদল করিয়া সেখানে গিয়া সে দু'চার দিন বাস করিত। সপ্তাহ পার হইতে না হইতেই না কুড়ালগুলি ভাল করিয়া শান্ দিয়া স্বস্থানে ফিরিত।

এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে রাসবিহারীর কথা শুনিয়া খেঁদি কহিল—

"তা জমিদারের ছেলে এখানে আসবে, আমায় মার ধোর কোরবে কেন?"

রাসবিহারী দাঁত মুখ খিঁচাইয়া কহিল—"মার ধোর কোরবে কেন? আরে জমিদারের ছেলে কি শুধু ছেলে, সে যে সাহেব রে বেটী।"

পরে তাহারই যুক্তি সপ্রমাণ করিতে পরম বিজ্ঞের মত কহিল—

"ও পাড়ার জমিদার বাড়ীতে, জমিদার বাবুর মেজ ছেলে গেল মাসে

কী কাণ্ডটা কোরে গেছে জানিস্ নে বুঝি? না জানিস, যা' তোর মাসী পিসি যারা আছে তাদের একবার জিজ্ঞাসা কোরে আয়।"

খেঁদি এবার সত্যই ভীত হইয়া কহিল—"কী কোরে গেছে?"

—আগাগোড়া দুরমুস্ কোরে গেছে—এখনও গায়ের ব্যথা যায় নাই। তবু ত' রে ব্যাটা জমিদার—সাহেব নয়।"

কথা শুনিয়া এমন যে ডাক্‌সাইটে কলহপ্রবণা নারী, তাহারও ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকিবার উপক্রম করিল। কহিল তবে "তুই আমায় বিকেল বেলা দিদির বাড়ীতে রেখে আয়। ক' দিন থাক্‌বে?"

"কী জানি? তারা কি কখনও সে কথা লেখে এই দেখ না টেলিগ্রাম।"

খেঁদি দেখিল তাহার এত সাধের আসনটি এবার টলিল বুঝি—সে বাটী সংলগ্ন বাগানে—প্রশস্ত সজ্জী ক্ষেতটির দিকে একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সারি সারি ফুলকপির ক্ষেতের নূতন ডালগুলি পাতা মেলিয়া তাহাকে যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।

রাসবিহারী সবই বুঝিল। কহিল, "দেখছিস্ কি তোর ফুলকপি এখন বাগানে পচুক, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এ যাত্রা যদি সে নাম রাখতে পারি তোকে আবার নিয়ে আসবো। আর যদি সাবাড় হই তবে একটা দেখে শুনে কণ্ঠিবদল করিস। এখনও তোর বয়স আছে রে খেঁদি, আমার মত নয়—" বলিয়া লাঠিতে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দাঁড়াইয়া তত দুঃখেও সে একটু রসিকতা করিতে ছাড়িল না। শ্রীমতী খেঁদি কিন্তু আজ আর এ নির্ম্মম পরিহাসের শাস্তি বিধান করিতে পারিল না, তাহাকে মুখ বুজিয়া পরিপাক করিতে হইল।

রাসবিহারী তখন মাথায় গামছা জড়াইয়া ভিন্-গাঁয়ে ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করিতে চলিল!

এ অঞ্চলে গরুর গাড়ী ছাড়া অপর যান-বাহন মেলে না। ষ্টেশন হইতে অথচ বাড়ী মাত্র এক পোয়া পথ। কিন্তু তাহারা সাহেব মানুষ। কখনও পায়ে হাঁটিয়া এ কষ্ট সহ্য করিবে না। গরুর গাড়ীতেও নিশ্চয়ই চড়িবে না। এখন কোন গতিকে ঘোড়ার গাড়ীখানি জোগাড় করিয়া যদি সে মান বাঁচাইতে পারে!

সারাদিন অভুক্ত থাকিয়া সারাপথ দুর্গানাম জপ করিতে করিতে সে ভিন্-গাঁয়ে আসিয়া পৌছিল এবং গাড়োয়ান নফর দাসকে আবিষ্কার করিয়া গাড়ীখানি লইয়া ষ্টেশনে যাইবার প্রার্থনা জানাতেই—প্রথমতঃ অত ভোরে অতদূর যাইতে সে রাজী হইল না। শেষকালে তাহাকে ডবল ভাড়া অগ্রিম গছাইয়া অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া গাড়ী লইয়া যাইবার কথা স্বীকার করাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘরে ফিরিল এবং তখন হইতে ঘর দুয়ার সাফ্ করিতে সুরু করিল। তার পর খেঁদিকে গরুর গাড়ী করিয়া তাহার বোনের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল। রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া সারাদিন অভুক্ত থাকার পর আহারের উদ্যোগ করিলেও মুখের অন্ন বেচারীর মুখে রুচিল না। সমস্ত রাত দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভোর না হইতেই ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আসিয়াই দেখিল নফর বিশ্বাস ফাঁস কথা কহে নাই, গাড়ীখানা সে ঠিকই আনিয়াছে, তাহার পর সে লাঠি গাছটি আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে ষ্টেশনে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং জমিদার পুত্র, সাহেব নন্দন এই ট্রেনেই গ্রামে পৌছিতেছে এই অপ্রত্যাশিত খবরটি ষ্টেশন মাষ্টার ও ষ্টেশন ষ্টাফ্‌কে জানাইয়া সারা প্লাটফরম ছুটাছুটি সুরু করিয়া দিল।

ট্রেনখানি যথাসময়ে প্লাটফর্ম্মে আসিয়া ভিড়িতেই রাসবিহারীর সমস্ত উৎসাহ কিন্তু নিভিবার উপক্রম করিল। সে ষ্টেশন মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া ফার্ষ্ট ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাসের সমস্ত কামরাগুলি তন্ন তন্ন

করিয়া দেখিল—কই, কুত্রাপি সাহেবী পোষাকধারী একটি লোকও চোখে পড়িল না।

"রাধে মাধব, রাধে মাধব, গোবিন্দ, গোবিন্দ, আমি তখনই জানতুম, মাষ্টারবাবু, সে ব্যাটারা এখানে আসবার ছেলেই নয়। অনর্থক আমায় তার কোরে কি হায়রাণটাই কোরলে। উঃ মশায় সারা রাত্রি জাগরণ, নফরা ব্যাটার পায়ে তেল, আর খেঁদি একথা শুনলে কি সে আমায় আস্ত—"বলিয়া হঠাৎ থামিয়া চ্যাটার্জ্জী সাহেবের মুণ্ডপাত করিতে করিতে যখন সে stationএর বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন 'রেলিংএর ফাঁক দিয়া দেখিল,—দুইটী যুবক ইণ্টার ক্লাশের কামরা হইতে নিজেরাই তাহাদের মালপত্র ঘাড়ে করিয়া বাহিরে আনিয়া গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিতেছে। একবার ভাবিল এই যুবক দুইটীকে একবার জিজ্ঞাসা করে সেই ট্রেনে চ্যাটার্জ্জী সাহেবের পুত্র উঠিয়াছিল কি না। কিন্তু তাহাদের সামান্য পোষাক-পরিচ্ছদ ও ভাল মানুষের মত চেহারা দেখিয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করা দরকারও বোধ করিল না। সে বাড়ী ফিরিয়া প্রথমেই সেদিনকার ডাকে চ্যাটার্জ্জী সাহেবকে জানাইল—ছোট মনিব মহাশয় এখানে পৌছেন নাই, কিন্তু সে টেলিগ্রাম প্রাপ্তি মাত্র ব্যবস্থা ঠিক করিয়া যথাসময়ে যানবাহনাদি সংগ্রহ করিয়া ষ্টেশনে হাজির দিতে শৈথিল্য করে নাই।

সৌম্য ও কিশোর গরুর গাড়ীতে চাপিয়া পরম আনন্দে শ্রীধরের পল্লী-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নবকিশোরদের গরুর গাড়ীখানি বাড়ীর চত্বরে প্রবেশ করিতেই উভয়ে লাফাইয়া গাড়ী হইতে নামিল। সামনেই দেখিল—কৃষ্ণপ্রেয়সী সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া আছেন।

"খুড়ীমা, সৌম্য কিছুতেই ছাড়লে না, সে আমার সঙ্গে এল!"

কৃষ্ণপ্রেয়সীর বিস্ময়ে দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সে ভাব খানিকটা কাটিলে—তিনি তাকাইয়া দেখিলেন এইটিই নাকি চ্যাটার্জ্জী সাহেবের পুত্র। সৌম্যকে চোখে না দেখিলেও, নবকিশোরের পত্রে তাহার এত কথাই কৃষ্ণপ্রেয়সী জানিয়াছেন যে নতুন করিয়া পরিচয়েরও আর আবশ্যকতা করে না। কৃষ্ণপ্রেয়সী তাহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন, আপনি বলিবেন কি তুমি বলিবেন, এই সামান্য গৃহস্থ পরিবারের আবহাওয়ার মধ্যে কী করিয়া আহ্বান করিবেন বুঝিতে পারিলেন না।

নবকিশোরের মুখে তাহার খুড়ীমার নাম উচ্চারণ হইতেই সৌম্য ছুটিয়া তাহাকে প্রণাম করিতে গেল—

"ও কী বাবা। এ কী, আমায় প্রণাম ক'রতে নেই", বলিতে বলিতে কৃষ্ণপ্রেয়সী সৌম্যের প্রসারিত হাতটি ধরিয়া ফেলিলেন। তাহার পর সৌম্যের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিলেন—বয়সে একেবারে শিশু! নবুরও অনেক ছোট।

—"এস বাবা এস," বলিয়া উভয়কে পরম সমাদরে আহ্বান করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন।

পরে জামা-কাপড় ছাড়িয়া, হাত মুখ ধুইয়া একটু বিশ্রাম করিলে—নবু তাহার খুড়ীমার দিকে ফিরিয়া কহিল—"সৌম্য তোমায় একটু চা করে দিই?"

সৌম্য বুঝিল ইহারা চা' খায় না। নতুবা নবুদারও চা খাওয়ার অভ্যাস থাকিত। তাই সে প্রতিবাদ করিয়া জানাইল, এসব ব্যাপার লইয়া কড়াকড়ি সুরু করিলে সৌম্য শুনিবে না।

নবকিশোর কহিল—"ট্রেন থেকে নেমে সকালবেলা চা' খাওনি মনে নেই?"

সৌম্য কহিল—"আমি এখানে চা' খেতে আসি নি। তার চেয়ে এস দু'জনে খানিকটা খাঁটি গরুর দুধ খাওয়া যাক্।"

"তাই আনিগে বাবা"—বলিয়া পরম পুলকে কৃষ্ণপ্রেয়সী কক্ষান্তরে গেলেন এবং নিমেষেই একবাটী গরম দুধ আনিয়া সৌম্যের হাতে দিলেন। ধনীপুত্র হইলেও দেখিতেছি ছেলেটী নবুর মত সৃষ্টিছাড়া নহে। দরকার হইলে সে চাহিয়া খাইতে জানে।

নবকিশোর কহিল,—"খুড়ীমা, আমার?"

—"তুই যে আহ্নিক করিস নি বাবা!"

নবকিশোর দেখিল, তাইত? আহ্নিক ত' সত্যই সে এখনও করে নাই। সে ভুলিলেও খুড়ীমা ভুলে নাই! নবকিশোর তখন জামা-কাপড় ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিল,—পরে বারান্দায় সেই চিরপরিচিত লোহার তোলা, উনানটি আবার এতদিন পরে ধরানো হইয়াছে দেখিয়া তাহার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। খুড়ীমাকে বারান্দায় একান্তে গ্রেপ্তার করিয়া নবকিশোর গোড়াতেই নোটীশ জারী করিয়া রাখিল:—"খুড়ীমা মনে থাকে যেন, রান্নাবান্না একেবারে ভুলে বসে আছি।"

কৃষ্ণপ্রেয়সী হাসিয়া সস্নেহে কহিলেন,—"সেটুকু বুদ্ধি আমার আছে বাবা। এতদিন পরে এলি, একটা দিনের জন্ম আবার তোকে রাঁধতে দেব? জানিস,—একটা বামুনঠাকুরকে যোগাড় করেছি। আমিও সব দেখিয়ে দেব শুধু নামাবে আর ওঠাবে—"

ইতিমধ্যে—"কি কি রান্না হবে মা?"—বলিতে বলিতে এক উপবীত-ধারী বালখিল্য ব্রাহ্মণ সন্তান, বয়স তাহার বোধ হয় ১২।১৪ বৎসর হইবে—সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই নবকিশোরের মাথায় রক্ত উঠিয়া পড়িল।

"একেই বুঝি যোগাড় ক'রেছ?"

—"হ্যাঁ!"

কঠোর দৃষ্টিতে সে বালকটিকে ভস্ম করিতে করিতে নবকিশোর কহিল,—"এত বুদ্ধি খরচ ক'রতে কে তোমায় ব'ল্‌লে? এই ঠাকুর?"—বলিয়া এক ধমক দিতেই, বেচারী পাচকের বুঝিবা প্লীহা পর্য্যন্ত ফাটিবার উপক্রম হইল। সে তখনি পলাইতে পারিলে বাঁচে।

কৃষ্ণপ্রেয়সী বেচারীর অবস্থা দেখিয়া নবকিশোরকে ভৎ'সনা করিয়া কহিলেন,—"ওকে কেন বক্‌ছিস নবু? স্নান ক'রতে যা..."

নবকিশোরের মনে হইল, আজ তেলের বাটী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সে এখনই ইহাদের সংস্রব ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। আজ কয়দিন হইতে সবাই মিলিয়া তাহাকে আরম্ভ করিয়াছে কি? কিন্তু সে ভাবিল, না, ঝগড়া আর কাহারও সহিত করিবে না। অরুণ, অনিমা, কৃষ্ণপ্রেয়সী, সবকটী প্রাণীই এক ধাতু দিয়া তৈয়ারী। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, ইহারা যা' খুসী করুক। জীবনে আর কখনও কাহারও কথায় সে প্রতিবাদ করিবে না।—অগ্নিময় দৃষ্টি দিয়া তাহার খুড়ীমা কৃষ্ণপ্রেয়সীকে দগ্ধ করিতে করিতে সে নদীতে স্নান করিতে গেল।

সেদিন মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বেই দোকান বন্ধ করিয়া শ্রীধর গৃহে ফিরিয়াই নবকিশোরের সাক্ষাৎ পাইল। তাহার সঙ্গে চ্যাটার্জ্জী সাহেবের পুত্র আসিয়াছে, শ্রীধর অবশ্য তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। এক্ষণে তাহা জানিতে পারিয়া সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিল। ইহাকে এখন থাকিতে দিবে কোথায়? কোথায় বা তাহার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিবে? মূর্খ কিশোর যদি একবারও তাহা জানাইত, শ্রীধর ইতিমধ্যেই একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ঠিক করিতে পারিত। সে এ অঞ্চলের একজন বিশেষ

সঙ্গতিপন্ন মহাজন হইলেও—ঘর গৃহস্থালী ব্যাপারে সামান্য গৃহস্থ। বাড়ীতে একখানি বড় টিনের ঘর। পাঁচ সাতটি বড় বড় চাউলের গোলা এবং কয়েকখানি খড়ের ঘর লইয়া তাহার গৃহস্থালী সম্পূর্ণ।

কিন্তু যাহার জন্য শ্রীধরের দুর্ভাবনা, সে বেচারী ইহা ভ্রূক্ষেপও করিলনা, এই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ সদাপ্রফুল্ল যুবকটির দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়, আনন্দ যেন তাহার দেহে নিবিড়ভাবে বাসা বাঁধিয়াছে! কই কোন প্রকারই ত' ইহার সঙ্কোচ নাই। সকলের সহিত খাসা গল্প করিতেছে। বেশ-ভূষাতেও এমন কিছু আভিজাত্যের জৌলুষ ফুটিয়া বাহির হয়না। সম্পূর্ণ সাধাসিধা বেশ।

শ্রীধর সৌম্যের সহিত পরিচিত হইয়া আলাপ করিয়া দু'চারটি মামুলী কথাবার্ত্তা কহিয়া খুসী হইল। কিন্তু তথাপি তাহার মনটা খুচ্ খুচ্ করিতে লাগিল।

নবকিশোর অপরের ছেলে হইলেও, এই বাটীরই আবহাওয়ায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে তাহার খাইবার, শুইবার, থাকিবার ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎই আছে। সুতরাং তাহার জন্য চিন্তিত হইবার হেতুমাত্র নাই। কিন্তু তাহার বন্ধু, এই সঙ্গতিশালী মাননীয় অতিথিটির পক্ষে কি সেই ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া সম্ভব? সে পাঁচ সাতবার ইহাই ভাবিতে ভাবিতে, তাহার প্রতিবেশী এক ধনী গৃহস্থের পাকা বাটীর বৈঠকখানা ঘরটিতে সৌম্য ও নবকিশোরের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিয়া আসিল।

কিন্তু যতই বেলা যায়, নবকিশোর চঞ্চল সৌম্যকে সাম্‌লাইতে অস্থির হইয়া পড়িল। সৌম্য বাল্যে কলিকাতায় এক Swiming Clubএর সভ্য ছিল। আজ প্রথম পাড়াগাঁয়ে পা দিয়া, বড় বড় জলপূর্ণ দীঘিগুলি দেখিয়া তাহার সেই লুপ্তপ্রায় সন্তরণ-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সে জামা খুলিয়া মালকোঁচা বাঁধিয়া দীঘির জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ঘণ্টাখানেক

প্রাণ ভরিয়া সাঁত্‌রাইল। শেষকালে নবকিশোরের হাঁকাহাঁকি ও বকাবকিতে অস্থির হইয়া জল হইতে উঠিল।

স্নান অন্তে কাপড় ছাড়িয়া সে সেই বালখিল্য রসুইকর ব্রাহ্মণটীর হাত হইতে হাতা কাড়িয়া লইয়া মাছ ভাজিতে সুরু করিল। নবু ও কৃষ্ণপ্রেয়সী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সৌম্যর কাণ্ড দেখিয়া কৌতুক উপভোগ করিতে লাগিল। শেষকালে যখন সে সত্যই কাঁচা মাছগুলি বিচক্ষণ রাঁধুনীর ন্যায় এপিঠ-ওপিঠ ভাজিয়া নিপুণভাবে পাত্রে তুলিতে লাগিল—তখন নবু ও কৃষ্ণপ্রেয়সীর বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম করিল। প্রত্যেক কাজে চাল-চলনে আচার-ব্যবহারে পরম অসহিষ্ণুতার অবতার বলিলেই হয়। তাহার হাতা ধরিয়া মাছ ভাজিতে গায়ে একফোটা তেলের ছিটা পর্য্যন্ত লাগিলনা। মাছগুলি নিপুণভাবে কোথায়ও না পুড়াইয়া দু'পিঠ সমান করিয়া ভাজিয়া তুলিল।

নবু কহিল,—"সৌম্য তোমার সার্থক শিক্ষা!"

সৌম্য কহিল "দেখচ কি, কাল তোমার ও খুড়ীমার জন্য পোলাও রাঁধবো।" পরে কৃষ্ণপ্রেয়সীর দিকে ফিরিয়া কহিল—"খুড়ীমা, কাল আপনি খুব ভাল চাল আমায় আনিয়ে দেবেন। খুব পুরোনো, অথচ মিহি হওয়া চাই।"

কৃষ্ণপ্রেয়সী সচরাচর মাছ খাননা। সৌম্য নিজের রান্না মাছের তরকারী তাঁহাকে জোর করিয়া খাওয়াইল। নবু এই অশান্ত বালকটির কাছে মনে মনে পরাজয় স্বীকার করিয়া পরম আনন্দে আহার করিতে লাগিল।

তারপর অপর বাটীতে বিশ্রামের ব্যবস্থা হইয়াছে, জানিতে পারিয়া সৌম্য বেঁকিয়া বসিল। কহিল, "না আমি নবুদার ঘরে শোব।"

কৃষ্ণপ্রেয়সী তদ্দণ্ডেই বুঝিলেন,—এ জেদি ছেলেটী যাহা ধরিয়াছে, তাহা

জীবন থাকিতে ছাড়িবেনা। সে অগত্যা নবুর সেই চিরপরিচিত ছোট্ট ঘরটিতে তক্তপোষের উপর গদি-তোষক দিয়া স্বহস্তে সুন্দর করিয়া মোটা বিছানা পাতিয়া দিলেন। তখন দুই ভাই পাশাপাশি শুইয়া পরম আনন্দে বিশ্রাম করিতে লাগিল

এ কয়দিন সৌম্যকে লইয়া গ্রামের এপাশে সেপাশে চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া এবং বাটীতে তাহার খবর-দালালী করিতে নবকিশোর এতই জড়াইয়া পড়িল যে, বার বার ইচ্ছা করিলেও সে অনিমা বা তার বড়দির নিকট একখানি পত্রও লিখিতে পারিলনা। আসিবার সময় সে গ্রামের ঠিকানা অনিমার অনুরোধে আগেই লিখিয়া দিয়া আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে একদিন সকালে অনিমার নিকট হইতেই সে প্রথম পত্র পাইল।—অনিমা সামান্যই কয়েক ছত্র লিখিয়াছে,—"ব্রাহ্মণ ঠাকুর, রাগ বুঝি এখনও পড়ে নাই। হতভাগিনী যদি না বুঝিয়া শ্রীচরণে কোন অপরাধ করিয়া থাকে, নিজ গুণে মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়। আমরা মানুষ, তাই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে ভয় পাই। কিন্তু আপনারা দেবতুল্য, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র। তাই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে আপনাদের যেমন আনন্দ, মানুষকে কথার জালে ভুলাইতেও তেমনি আপনাদেরও সঙ্কোচ লাগেনা। যাই হোক, বাড়ী গিয়া ভাল আছেন, কুশলে আছেন, মনের আনন্দে আছেন,—আমরা মাত্র এইটুকু জানিতে পারিলেই সুখী। ইতি—চরণাশ্রিতা অনিমা।"

নবকিশোর চিঠিখানি পড়িয়া সযত্নে পকেটে রাখিয়া দিল। নিয়াঙ্করে আজকার ডাকেই জবাব দিবে ভাবিয়া সে সৌম্যকে দাদাতে রাখিয়া একাকী তাহার কাকার দোকান দেখিতে বাহির হইয়া গেল।

তারপর বেলা এগারটা নাগাদ বাড়ী ফিরিয়া নিজের শুইবার ঘরে

প্রবেশ করিয়া দেখিল, শ্রীমান্ সৌম্য অনিমার চিঠিখানি বাহির করিয়া পরম বিজ্ঞভাবে তাহার উপর কি লেখা সুরু করিয়াছে।

সর্ব্বনাশ! বমাল হাতে হাতে ধরা পড়িয়া সৌম্য বড় লজ্জায় পড়িল।

"হতভাগা ছেলে! পরের চিঠি চুরি ক'রে পড়া হ'চ্ছে, দাঁড়াও তোমায় মজা দেখাচ্ছি।"

সৌম্য এ তিরস্কারে মুখ কাঁচুমাচু করিয়া পরম অপরাধীর মত সানুনয়ে কহিল,—"প্রাক্‌টিশ করছিলুম নবুদা!"

"দাঁড়াও তোমার প্রাক্‌টিস্ বার করচি,—কী প্রাক্‌টিশ ক'রছিলে এ চিঠিতে?"—বলিয়া সে চিঠিখানি কাড়িয়া লইল।

সৌম্য অম্লানবদনে কহিল,—"এমন সুন্দর হাতের লেখা ও এমন ভাষা আমার সাধ্যে কুলোবেনা।"

চিঠির দিকে চোখ পড়িতেই নবকিশোরের চক্ষুস্থির। সৌম্য ইহার করিয়াছে কি—"হতভাগিনী" কাটিয়া লিখিয়াছে "হতভাগা" এবং চিঠির শেষে অনিমার নাম কাটিয়া লিখিয়াছে—চরণাশ্রিত সৌম্য।

—"এসব কী বাঁদ্‌রামী হ'য়েছে?"

সৌম্য অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিল—"নবুদা, সত্যি বলচি এ ভাষা আমার হাত দিয়ে জন্মে বেরুতনা। চিঠি আমি ভাল কোরে লিখতে জানিনে বোলে আমার মা ও বড়দি কত বকেন। আমি লোভ সামলাতে পারিনি তাই অনিমা কেটে সৌম্যের নাম বসিয়ে দিয়েচি। তা ছাড়া আমি কি তোমায় ভালবাসিনা?"

এমন ছেলেকে লইয়া নবকিশোর কি করিবে! সে সস্নেহে তিরস্কার সুরে কহিল,—"ভালবাসলেই বুঝি এমনি কোরতে হয়!"

সৌম্য এবার পরম বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—"না ভালবাসলে বুঝি এমন কথা কেউ লিখতে পারে?"

নবকিশোর সকৌতুকে কহিল—"কেমন কথা—"

"জানিনা যাও" বলিয়া সৌম্য ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

নবকিশোর দুপুরবেলা অনিমার পত্রের জবাব লেখা শেষ করিয়া সেই সঙ্গে সেই চিঠিখানিও পাঠাইয়া দিল। পত্র সে এতদিন কেন লিখিতে পারে নাই, তাহার কারণ সর্ব্বশেষে জ্ঞাত করিয়া লিখিল,—সম্প্রতি যে ডাকাত লইয়া এখানে ঘর করিতেছি, তাহার দস্যুপনার পরিচয় তোমার চিঠিতেই পাইবে। সে আর হতভাগিনী চরণাশ্রিতের সৌভাগ্য সহ্য করিতে রাজী নয়। তোমার অধিকার সীমায় আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে, তাই তোমাকে স্থানচ্যুত করিয়া দস্তখৎ জারী করিয়াছে। যদি ইহাকে হটাইতে পার, তোমার চরণাশ্রয়ে দাবী মঞ্জুর হইবে কি না পরে বিচার করা যাইবে।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া নবকিশোর আর একবার সৌম্যের খোঁজ করিতেই দেখিতে পাইল, সে খুড়ীমার সঙ্গে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছে। লজ্জায় সেদিন আর সে নবকিশোরের সহিত কথা কহিতে পারিলনা।

সৌম্য গ্রামে যে ক'দিন ছিল, দৌড়-ঝাঁপ লাফালাফি করিয়া সকলকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিল। শেষে একদিন পেয়ারা গাছে উঠিয়া দোল খাইতে খাইতে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া হাত মচকাইয়া ফেলিল। কৃষ্ণপ্রেয়সী চূণ হলুদ বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইয়া দিলেন। তাহার পরদিন আবার সে ভাঙ্গা হাত লইয়াই সাঁতার কাটা সুরু করিল। এ কটা দিন এই ছেলেটীর স্নেহের অত্যাচারে কৃষ্ণপ্রেয়সী উদ্‌ব্যস্ত হইলেও বিন্দুমাত্র রাগ করিতে পারিলেননা। বরং তাহার প্রাণের প্রাচুর্য্য ও আনন্দের আতিশয্যে তাহার মাতৃ-হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। শুনিল ছেলেটীর আপন মা নাই, তখনি

কৃষ্ণপ্রেয়সী মনে মনে কহিলেন—যে গর্ভধারিণী ইহাকে জঠরে ধরিয়াছিল—তাহার মত সৌভাগ্যবতী বুঝি জগতে নাই। মনে হইল সৌম্যই বুঝিবা মা যশোদার ননী-চোরা গোপাল! আবার আর একজনের কোল জুড়াইতে এ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে। আহা বাছা আমার বেঁচে থাক, তাহার বিমাতার কোল জুড়াইয়া, শশীকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে থাকুক।

গ্রাম ছাড়িবার একদিন আগে সৌম্য কহিল—"নবু দা' চল একবার ও পাড়ায় যাই, বাবার পুরোনো বাড়ীটা দেখে আসি।"

নবকিশোর সহজেই সম্মত হইল। পথ চলিতে চলিতে নবকিশোর সৌম্যদের এই দেশের বাটী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু জানিয়া লইতে লাগিল। সৌম্য বলিল—তাহার বাবার নিকট শুনিয়াছে তাহাদের জমি জমা ও বাগান বাগিচা, সামান্য যা কিছু আছে তাহা রাসবিহারী নামে বহুকালের প্রাচীন এক গোমস্তা দেখাশুনা করে।

পরে ভিন্ন পাড়ায়, সৌম্যদের পৈতৃক বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলে সে নবকিশোরকে কহিল—"নবুদা' এস আমরা পরিচয় না দিয়ে সব দেখা শুনা কোরে যাই। সে বেশ মজা হ'বে।"

নবকিশোর হাসিয়া কহিল "বেশ।"

বাড়ী সংলগ্ন বাগানের বাঁশের বেড়া পার হইয়া দু' ভাই সব্জী ক্ষেতের মধ্য দিয়া ভিতরের সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়িল! ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল—একটি আধা বৃদ্ধ আধা প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক মোড়ায়, চোখে দড়ি বাঁধা চশমা আঁটিয়া নিবিষ্টমনে এক খাতা খুলিয়া কি হিসাব নিকাশ করিতেছে এবং তাহারই নিকটে একজন মুসলমান চাষী দুই বস্তা চাউল লইয়া বসিয়া আছে।

দুইজন অপরিচিত আগন্তুককে হঠাৎ ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া

সে চশমাটি একবার চাদরের খুঁটে ভাল করিয়া মুছিয়া ইহাদের দিকে চাহিয়া সামনের প্রসারিত হিসাবের খাতাখানি বন্ধ করিয়া চঞ্চল হইয়া বসিল।

সৌম্য অনুমানে বুঝিল—ইনিই গোমস্তা রাসবিহারী মণ্ডল।

ইহারা খুব কাছে আসিলে রাসবিহারী একবার তাহাদের ভাল করিয়া আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। একবার মনে হইল—ইহাদেরই কয়েক দিন পূর্ব্বে ষ্টেশনে ইণ্টার ক্লাসের গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়াছিল।

"বাবুদের কোত্থেকে আসা হয়। নিবাস কোথায়—ওহে মোড়লের পো, যাওতো' ঘর থেকে দুখানা টুল নিয়ে এস, বলিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট লোকটিকে আসন আনিবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

সৌম্য কহিল—"এই আপনাদের বাগান দেখতে। আমরা কোলকাতা থেকে আসচি।"

"বাবুদের নাম?"

সৌম্য এ প্রশ্নে মনে মনে চটিল, লোকটি নাম না বলাইয়া ছাড়িবেনা নাকি? সে অগত্যা নিজ নাম ভাঁড়াইয়া একটা কাল্পনিক নাম বলিল। পরে আসন গ্রহণ করিলে—সৌম্য আবার রাসবিহারীকে কহিল—"এ সব বাগান-বাগিচা, ঘর বাড়ী আপনারই?"

ইতিমধ্যে সেই মোড়লের পো কলিকায় তামাকু সাজিয়া মহাশয়ের হাতে দিয়া গেল। রাসবিহারী অনেকক্ষণ তামাক খায় নাই। হুঁকায় জোরে জোরে দম কষিতে কষিতে কহিল—

"আজ্ঞে বেরাহ্মণ আপনারা, মিছে কইব না—এ সব বাড়ী ঘর দোর বাগান বাগিচা কলকাতার একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার সাহেবের কিন্তু তিনি দেখেন না এ সব কিছু, সময়ও নাই। এই কোন গতিকে আমিই চল্লিশটা বছর ভোগ কোরে আসচি।"

সৌম্য মনে মনে কহিল—বড় কাজ কোরচ ?

"এ সব বাগান, সব্জী ক্ষেত আপনিই সব কোরেছেন ?"

রাসবিহারী সবিনয়ে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"ঐ আমার এক জ্বালা হ'য়েচে বাবু। ছেলে পুলে নেই, ঐ সব দেখাশুনা তদারক কোরতেই দিন যায়—আসুন না বাগানের ভেতর দেখবেন চলুন ?"

বাগানের কথা মনে হইতেই সৌম্যের একটা কথা মনে পড়িল। সে তাহার বাবার নিকট শুনিয়াছিল, যতবারই তিনি বাগানের আম কাঁটাল ফলমূল ও শাকসব্জীর কথা রাসবিহারীকে লিখিতেন—গত দশ বারো বৎসর ধরিয়া রাসবিহারী নাকি তাহার এক জবাবই দিয়া আসিতেছে—আজ্ঞে অজন্মার বছর। আম কাঁটাল কিছু ফলে না হুজুর। সব্জী লাগাইবার কথা লিখিলে রাসবিহারী লেখে—এ সব জমিতে পয়সা ঢালা মানেই জলে ফেলা! জমি নয় ত' শুধু বালু। এক শাখ-আলু ছাড়া আর কিছু ফসল হইবার উপায় নাই। তাহাও বহু পয়সা খরচ না করিলে হনুমানের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। অগত্যা প্রতিবারেই বাধা পাইয়া বাগান-বাগিচা হইতে কিছু ফলমূল প্রাপ্তির আশা চ্যাটার্জ্জী সাহেব একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তথাপি সৌম্য তাহার পিতার নিকট শুনিয়াছিল—রাসবিহারী একেবারে অকৃতজ্ঞ নয়। জমি খাটাইয়া কোন কিছু লভ্যাংশ না দিলেও—জমিদারের খাজনাটি নাকি রাসবিহারী প্রত্যেক বৎসরই যথানিয়মে দিয়া আসিয়াছে। এই টাকাটি আর চ্যাটার্জ্জী সাহেবকে কলিকাতা হইতে দয়া করিয়া পাঠাইতে হইত না।

কিন্তু আজ স্বচক্ষে সেই বাগান দেখিয়া সৌম্যের চক্ষু জুড়াইয়া গেল। সারি সারি যতদূর চোখ যায় দেখিল—ফুল কপি, বাঁধা কপি, ওল কপি, মূলা, শীম, বেগুন, বর্ব্বটি, বিট পালং, কড়াইশুটি ইত্যাদি শীতকালের উপযোগী নানা প্রকারের সব্জী বহু পরিমাণে জন্মিয়াছে। কলাগাছে

পেঁপে গাছে প্রচুর পাকা পাকা ফল ধরিয়াছে। বড় বড় লেবু গাছে, থোকা থোকা লেবু ধরিয়া তাহারই ভারে নুইয়া পড়িয়াছে।

সব্জী বাগানের একধারে আসর কুন্দ, অতসী, অপরাজিতা, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, রজনীগন্ধা, গোলাপ ইত্যাদি ফুলের গাছে অজস্র ধারে ফুল ফুটিয়া আছে।

সৌম্য মনে মনে ভাবিল—ইহাই যদি অজন্মা হয়, অনুর্ব্বর বালু জমি হয় তাহা হইলে ভাল জমি বোধ করি পৃথিবীর বুকে কুত্রাপি নাই।

এ সব সহুরে বাবু, বাগান ঘাট কখনও দেখে নাই বোধ করি। তাই হুঁকা হাতে, মাঝে মাঝে দম কষিতে কষিতে পরম মুরুব্বী চালে রাসবিহারী —সব্জী ক্ষেতের চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুঝাইতেছিল—এ অঞ্চলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এমন ফলন্ত বাগান আর দ্বিতীয় লোকের নাই—আর এমন ফলন করিবার কৌশলও অপরের জানা নাই!

"আচ্ছা নায়েব মশাই, এ সব আপনার মনিব জানে না?"

নায়েব মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করায় সৌম্যের উপর রাসবিহারী বিশেষ খুসী হইল। চ্যাটার্জ্জী সাহেব রাসবিহারীকে নিযুক্ত করিবার পর হইতে সরকার মহাশয় বলিয়া ডাকিতেন। সে অবধি এ অঞ্চলে সকলে তাহাকে ব্যারিষ্টার সাহেবের বাগানের সরকার মহাশয় বলিয়া জানিত। আজ সৌম্য তাহাকে সর্ব্বপ্রথম 'নায়েব মহাশয়' বলিয়া ডাকিল। রাসবিহারী আনন্দে গদগদ হইয়া ভাবিতে লাগিল—আহা হইবে না কেন—ইহারা কি যে সে লোক! লেখাপড়া জানে যে! আর সে-ই বা নায়েব অপেক্ষা হীন কিসে? দখলকার হিসাবে পলাতক জমিদারের পরিত্যক্ত ভিটা ও বাগানের মালিক বলিলেই হয়। সেই মুহূর্ত্তে সৌম্যের প্রতি তাহার প্রগাঢ় সম্ভ্রম জাগিল, মনে হইল কিছু শাকসব্জী তাহার সঙ্গে অমনি দিয়া দেয়। তাহার পর— তাহার মনিব এ সব কথা জানে কি না সে প্রশ্নের জবাবে রাসবিহারী

হাসিতে হাসিতে বলিল—তেমন বুদ্ধি সে ধরে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সে এই সব তদারক করিবে কি পাঁচ ভূতকে খাওয়াইবার জন্য। মনিব-জাতরা যে জন্ম-অন্ধ! নজর দিবার সময় কোথায়! যদি তাহারা চক্ষুষ্মান হইত তাহা হইলে কি আর সে এত বুদ্ধি খরচ করিয়া পরের বাগান-বাগিচা তদারক করিয়া যাইত!

নবকিশোর এতক্ষণ ইহাদের উভয়ের কথাবার্ত্তা পরম মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল ও বিলক্ষণ কৌতুক বোধ করিতেছিল।

নবকিশোরের ইচ্ছা যাইতেছিল—বলে, যে ভিটা ছাড়িয়া সহর বাস করিবার ফল কি, গ্রাম-ছাড়া জমিদাররা একবার তাহা জানিতে থাকুক! যাহার বাড়ী যাহার ভিটা, যাহার বাগান আজ তাহারই গোমস্তা তাহাকে বুঝাইতেছে—এ সব তাহাদের মত পঞ্চভূতের জন্য নহে! আশ্চর্য্য!

বাগানের একটি ধারে আসিয়া এক জোড়া বৃহৎকায় বাঁধা কপি দেখিয়া সৌম্যের বড় ভাল লাগিল। বলিল, "নায়েব মশাই, এ কপি জোড়া বেচবেন?"

সৌম্য যেভাবে নায়েব মশাই বলিতে সুরু করিয়াছে তাহাকে সে চাহিলে হয় ত' এমনিই দিয়া দিত। কিন্তু রাসবিহারী ভাবিল—ইঁহারা শিক্ষিত লোক বিনামূল্যে লইবে কেন? তথাপি ভদ্রতা করিল। নিজে কিছু দর না হাঁকিয়া কপি দুটি তুলিয়া সৌম্যের হাতে দিল।

সৌম্য পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল—"এক টাকা দেব?"

"আজ্ঞে না, আট গণ্ডা পয়সা দিন! আপনি বেরাহ্মণ ইচ্ছে কোরে নিয়েছেন, না দিলেও চাইতুম না।"

নবকিশোর ভাবিতে লাগিল—বেটা কী পাষাণ! দ্বিজ ব্রাহ্মণে কী ভক্তি! যাহার বাগান তাহারই নিকট কপি বেচিয়া পয়সা লইল!

তাহার পর আরও খানিকক্ষণ বাগানে ঘোরাঘুরি করিয়া, তাহার সব্জী ও ফসলের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে সৌম্য ও নবকিশোর সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছুটি বাঁধা কপি লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিল।

পরদিন সৌম্য কলিকাতা রওনা হইল। তাহারই কয়েক দিন পরে গোমস্তা রাসবিহারী ডাকযোগে চ্যাটার্জ্জী সাহেবের হাতের লেখা এক পত্র পাইল। সে আবার দড়ি-বাঁধা চশমা জোড়াটি কানে লাগাইয়া পত্রখানি পড়িতে বসিল। দেখিল তাহার মনিব স্বয়ং চ্যাটার্জ্জী সাহেব পরিষ্কার বাঙলায় স্বহস্তে পত্রখানি লিখিয়াছেন—

পরম কল্যাণবরেষু—

রাসবিহারী, তোমাকে এতদিন যাহারা অবিশ্বাস করিয়া বা অকৃতজ্ঞ ভাবিয়া আসিয়াছে তাহারা নিজে অকৃতজ্ঞ! বুঝিলাম—আমার সব্জী-বাগানের বালু-জমিতে এখনও কপির চাষ হয় এবং সে কপি খাইতে মিষ্ট। হনুমানের গ্রাস বাঁচাইয়াও যে ছুটি সম্প্রতি এখানে আসিয়াছে তাহার জন্য আমাদের ধন্যবাদ জানিবে—শ্রীমান্ সৌম্য সম্প্রতি এখানে সুস্থ দেহে নিরাপদে ফিরিয়াছে। তাহার জন্য চিন্তার কোন কারণই নাই।

যে কয়দিন সৌম্য ছিল, নবকিশোর ও কৃষ্ণপ্রেয়সীর বড় আনন্দে কাটিল। আজ সে চলিয়া যাইতেই নবকিশোরের কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। পল্লী-লক্ষ্মীর যে চিরন্তন শ্রী এতদিন তাহার দেহ, মন উভয়কে নিবিড়ভাবে ঘিরিয়া, তাহারই মধুরসে সমস্ত চেতনাকে নির্লিপ্ত করিয়া বসিয়াছে—আজ সর্ব্বপ্রথমে নবকিশোরের বোধ হইল সে মাধুর্য্যে আর উন্মাদনা নাই। পূর্ব্বের মত তাহার দৃষ্টিকে তৃপ্তি দিলেও—অন্তরকে মাতাইয়া তুলে না। কোথায় যেন ইহাতে মস্ত ফাঁক, মস্ত অভাব রহিয়া

গিয়াছে। নবকিশোর তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিল—কোন কিনারা করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে সে অনিমা, মাধুরী ও করুণাময়ীর একখানি করিয়া পত্র পাইল। অনিমা লিখিয়াছে :—

কিশোর! তোমার যে ভাইটির দস্যুবৃত্তি আমার পত্রের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেচে—জানবে সে আমার পরম সুহৃদ্, আমার অন্তরঙ্গ।

এই বয়সে পরের হৃদয়, পরের ব্যথা যে এত নিবিড় কোরে দেখতে শিখেচে সে তোমার মত অন্ধ নয়। সত্যকে অনুসন্ধান কোরতে, সে তার র কাছে ছুটে যায় না

হৃদয়কে বড় বোলে মান, এই কথা একদিন আমার বড় গলায় জানাতে চেয়েছিলে, নয়? মনে আছে, আমি তাতে হেসেছিলুম? আর সে হাসিতে তোমার বুক কেটে গিয়েছিল?

পারত' তোমার ছোট ভাইটির কাছে, আজ আবার নূতন কোরে শিখে নিও—সত্যকারের বিশ্বাস কাকে বলে! সে শক্তিমান, সে আত্মপ্রত্যয়ী। সে যাকে ধ্রুব সত্য বোলে জানে,—তাকে প্রচার করতে সে ভয় পায় না, তাই অনিমার নাম জোর কোরে কেটে দিয়ে—তার নাম বসিয়ে দিতে এতটুকুও তার হাত কাঁপে নি। অধিকার প্রতিষ্ঠিত ক'রবার এতখানি সাহস যার আছে—জানবে বয়সে ছোট হলেও, সে তোমার আমার দু'জনেরই বন্দনীয়, দু'জনেরই পূজ্য। কারণ তার বিশ্বাসকে অবহেলা করবার শক্তি তোমার ত' নেই-ই—তোমার অনিমারও নেই। সেই হৃদয়বান্ পরম-প্রণয়ীকে আমার প্রীতি দিও, আমার শ্রদ্ধা দিও, আমার নমস্কার দিও। সে আমারও সোদর, আমার সুহৃৎ—আমার পরমাত্মীয়।

চরণের আশ্রয় তার সাজে না—তার আশ্রয় হৃদয়ে। মুরলীধারী

দেবতা যেখানে নূপুর পায়ে বাঁশী বাজায়, হৃদয়ের সেই শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠে তার স্থান, সেখানে তার পূজা। সে দেব-দুর্ল্লভ আসনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র লোভ নাই, তাই তার প্রতি আমার ঈর্ষাও নাই। চরণের আশ্রয়ই আমার যথেষ্ট—অনিমা যেন জন্ম জন্ম সেখানেই একটু স্থান পায়, এই তার প্রার্থনা, এই তার কামনা।

চিঠির এই অংশটি নবকিশোর উন্মাদের মত বার বার পড়িতে লাগিল। মনে হইল—অনিমা যাহা লিখিয়াছে, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। এত শক্তি, এত বিশ্বাস ত' তাহার নাই। অন্তরে অন্তরে সে সত্যই দুর্ব্বল। স্বাভাবিক কাণ্ড-জ্ঞানবর্জ্জিত দুরন্ত সৌম্য দস্যুবৃত্তি করিয়াও যে সঞ্চয় করিতে জানে, পরের ধন রক্ষা করিবার শক্তি রাখে—সে শুধু পরম সাহসী নয়, পরম শক্তিবান! সেই দণ্ডেই নবকিশোরের অন্তর-দেবতা, এই চির সুন্দর, চির কিশোর, চির সৌম্য অন্তরঙ্গের উদ্দেশ্যে ডাকিয়া উঠিল :—

"নহ ত' শুধু তুমি প্রাণের প্রিয়—তুমি যে নিকটতম
তুমি যে সখা মোর, তুমি যে মিতা, তুমি যে মোর প্রিয়তম।"

সর্ব্বস্ব চুরি করিলেও তোমার অপরাধ নাই ভাই। তুমি যে ধূলাকে সোনা মনে করিয়া, সহস্রধারে ফিরাইয়া দিতে জান।

তাহার পর নবকিশোর মাধুরীর চিঠিখানি খুলিল। রুলটানা কাগজে বড় বড় গোটা গোটা হরফে মাধুরী লিখিয়া জানাইয়াছে :—সে এবার পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হইতে পারে নাই; কিন্তু দুইটি Subjectএ full mark পাইয়াছে। তথাপি মাষ্টার মহাশয় যেন রাগ না করেন, তিনি এবার আসিয়া তাড়াতাড়ি আরম্ভ করাইলে সে নিশ্চয়ই সব বিষয়ে আগামী বৎসর পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিতে পারিবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাহার পর করুণাময়ীর চিঠি। পত্রের তলায় করুণাময়ীর নাম স্বাক্ষরিত হরফটি চোখে পড়িতেই—বড়দির সেই চিরমধুর, চিরশান্ত

হাসিভরা মুখটি নবকিশোরের অন্তরে ভাসিয়া উঠিল। সে পত্রখানি দুইবার মাথায় ঠেকাইয়া পড়িতে সুরু করিল ঃ—

নবু ভাই!

খুড়ীমাকে পাইয়া নিশ্চয়ই বড়দিকে ভুলো নাই। তোমার কথা আজকাল রোজই বলি। লালুও মাঝে মাঝে 'নবুকা' বলিয়া ডাকে। সৌম্য নিরাপদে ফিরিয়াছে। তাহার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। আর দু'চারটি দিন গ্রামে রাখিলে পারিতে। তুমি কেমন আছ, পড়াশুনা করিতেছ কি না। অনিমার কোন খবর পাইতেছ কিনা সব অকপটে লিখিবে। বড়দির কাছে লজ্জা করিও না। চিঠি লিখিতে লিখিতে এই মাত্র আবার সৌম্য আসিয়া পড়িল। সে এবার জেদ ধরিয়াছে অনিমাদের বাড়ীতে যাইবে, জোর করিয়া আলাপ করিবে, আমাকেও ছাড়িবে না। সেখানে লইয়া যাইতে গাড়ী প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছে। আজ তবে আসি ভাই। অনিমার কথা তবে পরে লিখিব। আমার ও তোমার মাষ্টার মহাশয়ের স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে। আমরা সকলে ঈশ্বর ইচ্ছায় কুশলে আছি। পত্রোত্তরে তোমাদের সকলের কুশল লিখিয়া সুখী করিবে।

তোমার খুড়ীমাকে আমার নমস্কার দিতে মন সরে না ভাই। **তাঁকে আমার প্রণাম দিও**।—ইতি তোমার চির-শুভাকাঙ্ক্ষিণী বড়দি'—

চিঠি পড়া শেষ হইলে নবকিশোর ভাবিল—সৌম্য তাহা হইলে অনিমাকে ভুলে নাই। সে জোর করিয়া আলাপ করিবেই। আলাপ করিলে নিশ্চয়ই সে দুরন্ত তাহাকে না ভালবাসিয়া ছাড়িবে না; চিন্তা করিতে করিতে এই ভাবী মিলনের মধুর ছবি কত অপরূপ বর্ণেই না কিশোরের মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সে এখন কলিকাতায় নাই, তাহাকে বাদ দিয়া কত আনন্দেরই না ব্যবস্থা হইতেছে। সকলে মিলিয়া তাহাকে সহর ছাড়া করিয়া মনের আনন্দে একটি প্রীতির সংসার

গড়িয়া বসিয়াছে। ছোঁড়াটা যদি এত কষ্ট করিয়া আসিলই—আর দুটা দিনও ত' গ্রামে থাকিতে পারিত। এ অল্প ছুটীর কটা দিন ফুরাইতে কতক্ষণই বা লাগিত? ভাবিতে ভাবিতে সৌম্যের উপর রাগ হইল। সে পলাতককে এবার কলিকাতা পৌঁছিয়াই শাস্তি দিতে হইবে। তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহের দণ্ডে নিপীড়ন করিয়া পাগল করিয়া তুলিতে হইবে। অনিমার কথা না তোলাই ভালো। সে কি আর সৌম্যকে ছাড়িবে! এখন হইতে সে শুধু চোখে না দেখিয়াই "আমার শ্রেষ্ঠ সখা, পরম মিত্র, পরমাত্মীয়" বলিয়া ডাক ছাড়িতে সুরু করিয়াছে—এ দুরন্তকে কাছে পাইলে সে নিশ্চয়ই তাহার সকল আকাঙ্খা, সকল কামনা, ষোল আনা উশুল না করিয়া কখনও নিষ্কৃতি দিবে না। নবকিশোর যতই ভাবিতে লাগিল—এই পল্লীবাস ততই তাহার নিকট তিক্ত বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল, এই দণ্ডেই সে ইহার সহিত সকল সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা ছুটিয়া যায়;—কিন্তু কৃষ্ণপ্রেয়সী! নাম করিতে না করিতেই তিনি কাছে আসিয়া হাজির হইলেন—

"দিনরাত ঘরে বসে আজকাল কী ভাবিস নবু, অসুখ ক'রবে যে!"

নবকিশোর রাগ করিয়া চিঠির গোছাগুলি খুড়ীমার সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীধরের দোকানের পানে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ভাবিল' ঘরে থাকিলেও যখন গালাগালির কসুর নাই, তখন এখন হইতে সে বাহিরে বাহিরেই কাটাইবে।

কৃষ্ণপ্রেয়সী—'পাগল ছেলে' বলিয়া হাসিতে হাসিতে ইতস্তত: পত্রগুলি, সযত্নে কুড়াইয়া তাহার বাক্সের উপর গুছাইয়া রাখিল।

• • •

সমস্ত দিন ঘোরাঘুরির অন্তে রাত্রের আহারাদি চুকাইয়া নিশ্চিন্ত হইলে নবকিশোর ভাবিল, এবার ধীরে-সুস্থে পত্রগুলির জবাব দিবে। কিন্তু

তাহার যে আবার বেশী রাত পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া কিছু করিবারও উপায় নাই। খুড়ীমা প্রতি মুহূর্ত্তে আসিয়া তাড়াহুড়া সুরু করিবেন। দিনেও কিছু করিতে দিবেন না, রাত্রেও বেশীক্ষণ বাতি জ্বালাইয়া রাখা চলিবে না। এ কয়েদখানায় এমন করিয়া স্নেহের অত্যাচার কেমন করিয়া সহ্য হয়?

তথাপি সেদিন নবকিশোর শোবার ঘরের দরজা ভেজাইয়া মরিয়া হইয়া পত্র লিখিতে বসিল। প্রথমে সে মাধুরীর পরীক্ষা-পাশে আনন্দ প্রকাশ করিয়া এক মস্ত চিঠি লিখিল। তাহার আগাগোড়া দীর্ঘ উপদেশ। ভবিষ্যতের পথে পাঠ্য-জীবন গঠনে, এবার গোড়া হইতে কি কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, কোন্ কোন্ বই পড়িতে হইবে—এই সব কথা। তাহার পর তাহার বড়দিকে লইয়া পড়িল। তিনি গোড়াতেই তার ছোট ভাইটিকে মনে করিয়া পত্র দেওয়ার দরুণ কৃতজ্ঞতা জানাইল। অনিমার কথায় লিখিল—সে চিঠি লিখিয়াছে! তাহার পর সৌম্য ও বড়দি স্বেচ্ছায় সেখানে আলাপ করিতে যাইতেছেন শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহার পর সে পত্রের তলায় একথাটিও লিখিতে ছাড়িল না—বড়দি' ছোট ভাইকে ছাড়িয়া আপনারা যে আবার একটি আনন্দের নীড় গড়িয়া তুলিতে-ছেন—বুঝিলাম, এ হতভাগ্যের সেখানে স্থান নাই। তথাপি আমি দুঃখী নয়, পরম সুখী। অনিমার বড় অহঙ্কার। তথাপি আপনি আমায় যে মন্ত্র দীক্ষা দিয়াছেন—অনিমা বলে তাহাতে নাকি আমার অধিকার নাই। সে নাকি আমার মনের কথা নয়। আমার বড় অনুরোধ বড়দি'—একবার সেই উদ্ধত নারীকে বলিয়া আসিবেন; বড়দি'র দীক্ষা কখনও মিথ্যা হয় না। আমি যে অন্তরে অন্তরে তাহা কত বড় সত্য বলিয়া মানি—অনিমা যেন একবারও তাহা জানিতে পারে—ইহাই আমার বিনীত অনুরোধ।

আজ ছ'মাস আগে আপনার যে ছোট ভাইটি ছিল চির নিঃস্ব, স্নেহের কাঙাল, ভালবাসার ঐশ্বর্য্য দিয়া তাহার হৃদয় এমন করিয়াই ভরিয়া তুলিয়াছেন যে, এক মুহূর্ত্তে আপনাদের কথা না ভাবিয়া উপায় নাই। স্বদেশ আজ তাই আমার কাছে বিদেশ। আপনাদের চিরমধুর স্মৃতিকে সজাগ রাখিয়া, তাহারই মাধুর্য্যে এ বৈচিত্র্যহীন পল্লী-জীবনের নিরস দিনগুলা ডুবাইয়া রাখিয়াছি। আজ শুধু প্রাণ ভরিয়া একবার বলিতে ইচ্ছা করে :—

"পূর্ণ হয়েছে রিক্ত এ হৃদি, নিঃস্ব নহিগো আর,
শূন্য এ প্রাণে ভরিয়া উঠিবে—অমৃতের ভাণ্ডার।"

—কিন্তু এত অমৃত এখন রাখি কোথায় বড়দি' ?

খুড়ীমাকে আপনি প্রণাম জানাইয়াছেন—আমি কিন্তু ভয়ে সে কথা তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। ব্রাহ্মণ কন্যার মুখে এমন অশাস্ত্রীয় কথা শুনিবামাত্র হয় ত' তিনি তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতে, সপ্তাহকাল নিরম্বু উপবাস সুরু করিবেন !

আজ তবে আসি বড়দি'।

আপনার রাতুল চরণে আমার প্রণাম ত' চিরটা কালের জন্য জমা হইয়াই আছে। তবে আর তাহার পুনরুক্তির উপায় কি! বরং মাষ্টার মহাশয়কে শ্রদ্ধার সহিত তাহা নিবেদন করিবেন। শ্রীমান্ লালমোহনকে তাহার কাকার স্নেহাশীষ জানাইবেন। চির স্নেহাকাঙ্ক্ষী—নবু।

ইহার পর আসিল—অনিমা।

কিশোর যতই ভাবে, রাগ করিয়া কিছু বলিব, রাগ করিয়া কিছু লিখিব, অনিমার কথা মনে হইতেই, যত অভিমান আসিয়া জুটে ! সমস্ত সংকল্প, সমস্ত চিন্তা ওলোট-পালোট করিয়া দেয়। এ মায়াবিনীর উপদ্রব

সে কেমন করিয়া এড়াইবে ? সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে মনে খানিকটা বল সঞ্চয় করিয়া কিশোর লিখিতে সুরু করিল—

প্রাণের অনিনা—

সৌম্য আমায় ঠিকই বলিয়াছে—"তুমি যাই বল নবুদা—এমন লেখা, এমন ভাষা তোমার কলম দিয়েও বেরুবে না।"

আচ্ছা, কেমন করিয়া তুমি লেখ অনি ? চিঠির উপর পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিতেই কি হরফগুলি তাহার সহস্রদল বিস্তার করিয়া এমন বিচিত্ররূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে ?

অক্ষরগুলির দিকে তাকাইলেই মনে হয় যেন তাহারা আমায় হাত-ছানি দিয়া ডাকিতেছে। ভাবি, এই দণ্ডেই ছুটিয়া যাই ; কিন্তু কেমন করিয়া যাই ? ওগো, যদি জানিতাম আসিলে এত দুঃখ, তবে কি এমন ছাড়িয়া আসিতে পারিতাম।

যে কবি লিখিয়াছে—Absence maketh the heart grow fonder—সে অতি হৃদয়হীন, সে অতি মিথ্যাবাদী। মানুষের অন্তর লইয়া খেলা করা যদি বিচ্ছেদের ধর্ম্ম হয়, সে ধর্ম্ম পৃথিবী থেকে চিরতরে লুপ্ত হোক। তা' কদাচ হৃদয়কে শক্তিবান্ করে না, দৃঢ় করে না।

আজ যদি সত্যই তোমার প্রেম হারাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা অপেক্ষা মরণ কি ঢের ভাল নয় ? কিন্তু ওগো, দুদিন আগে তুমি কোথায় ছিলে, আমিই-বা কোথায় ছিলাম, অণি !

এতদিন শুধু পরের ভালবাসা দিয়া নিজের অন্তরকেই ভরাইয়া রাখিয়াছি—পরকে ভালবাসা জানাইতে পারি নাই। কেন পারি নাই অনি ? একদিন মনে পড়ে, তুমি আমায় ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—"নবকিশোর অনিকে ভালবাসে কি না, সে কথা বড়দি বলেন নাই ?" মনে আছে, তখন সে কথায় আমি কোন জবাব দিতে

পারি নাই। কেন পারি নাই জান? সাহস হয় নাই। পূর্ণিমার চাঁদ সহস্রবার কিরণ বিতরণ করে বলিয়াই কি মানুষ তাহাকে দু'হাত বাড়াইয়া ধরিতে পারে? একজনের পক্ষে যাহা সাজে, অপরের পক্ষে তাহা বাতুলতা! তুমি তাই সহজে পারিয়াছিলে, আমি তাহা চেষ্টা করিয়াও পারি নাই! আজ যদি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি অনি, তুমি কি আমার সে প্রেম গ্রহণ করিবে?

বড়দি' নারী নয়,—দেবী। তাঁর সান্নিধ্যে আসিলে মানুষ তার অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়। স্নেহের সে পুণ্য-তীর্থে—যাহারা পাথেয় লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছে—তাহারা আমার মত ভাগ্যবান্। ভগবানের চরণে নিয়ত কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তুমি সে সৌভাগ্য লাভ কর।

এই বড়দিই আমায় শিখাইয়াছেন—

"হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, দু'দিনের দুনিয়ায়
জনমের পিছু মরণের ডাক, অহরহ শোনা যায়।
মূঢ় সমাজের বিধি-নিষেধের বিপুল শাসন মিছে
মানুষের প্রেম, নিকষিত হেম, সে নহে কাহারো নীচে—"

কিন্তু তুমি সে কথা বিশ্বাস কর নাই, এখনও বিশ্বাস কর কি না জানি না। আমি আজ বড়দিকে লিখিয়া দিলাম, বারান্তরে যেন অবিশ্বাসিনী অনিমাকে তিনি বুঝাইয়া দেন—

"তোমারে পাওয়ার সেরা কিছু নাই, কাম্য আমার প্রাণে,
আমার মোক্ষ মিলেছে বন্ধু, তোমারে আত্মদানে!
কলঙ্ক যদি থাকে কিছু মোর নিন্দার যত মূল;
চন্দন হোয়ে সুবাস ছড়াক, ভেঙ্গে যাক সব ভুল।"

বিদায়ের পূর্ব্বে ইহাই আমার নিবেদন। অনি—আজ তবে আসি।—
ইতি—তোমারই কিশোর।

নবকিশোর চিরটা কালই কথা বলে কম। তথাপি সে পূর্ব্বে দু'চারটি কথা বরং বলিত—আজকাল সে একেবারেই নির্ব্বাক। বিচ্ছেদ-কাতরে, স্নেহবাঞ্ছিতা জননীর শূন্য কোল জুড়াইতে যদিই বা দু'দিনের তরে গ্রামে ফিরিয়া আসিল, এমন মন-মরা, হইয়া কাটায় কেন?

কৃষ্ণপ্রেয়সী ভাবেন, সে'ত এমন বোবা, এমন সৃষ্টিছাড়া ছিল না। কে তাহার মুখের কথা চুরি করিয়া, মনকে শূন্য করিয়া দিল।

"হাঁরে নবু, কী হ'য়েচে বাবা তোর? মুখে হাসি নেই, কথা নেই, তোর মা'র সঙ্গে এবার একটা গল্প পর্য্যন্ত ক'রলি নি?"

উদাসভাবে নবকিশোর জবাব দিল—"ভাল লাগে না খুড়ীমা।"

কথা শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সীর অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ব্যথিত হইয়া কহিলেন,—"কেন বাবা, কি কষ্ট হ'চ্চে তোর?"

হায় নারী! আজ নবকিশোরের অন্তরে যে কী যাতনা, তোমায় তা' কেমন করিয়া বুঝাইবে? তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা যে কত গভীর তাহা ত' সে জানে। তথাপি যাহার অন্তরে একবার গঙ্গার ঢেউ লাগিয়াছে—জোয়ার বহিতে সুরু করিয়াছে, নদীর স্রোতে তাহার কী হইবে?

জীবন-দেবতার শূন্য দেউলে যাহার বোধনের রাগিনী বাজিতে সুরু হইয়াছে,—শুধু কাঁসর ঘণ্টার রোলে কি তার তৃপ্তি হয়?

কৃষ্ণপ্রেয়সীর যে স্নেহ, যে সেবা, যে আদর ছিল একদিন আশাতিরিক্ত, যার সবটুকু নিঃশেষ করিয়া ধরিয়া রাখিবার স্থান তার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ছিল না, অন্তরকে ছাপাইয়াও যে স্নেহধারা উপছিয়া পড়িত—আজ তাহারই আশেপাশে অকস্মাৎ কতখানি স্থান যে শূন্য পড়িয়া আছে,—নিরক্ষরা

নারী তার কতটুকুরই বা সন্ধান রাখে? আজ যদি ইহাকে সেকথা মুখ ফুটিয়া বলা চলিত,—হয়ত' সকল দিক দিয়াই সকল বিরোধের সমাধা হইয়া যাইত।

কৃষ্ণপ্রেয়সীর কথায় নবকিশোর জবাব দিতে পারে না, শুধু উদাসভাবে তাকাইয়া থাকে।

"তবে বাবা তুই আবার কোল্‌কাতায় যা।"—বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী এ-কথাকয়টি উচ্চারণ করিলেন।

"কিন্তু আমি ত' যেতে চাইনি খুড়ীমা"—বলিয়া ম্লান হাসিয়া খুড়ীমার কোলের কাছে সরিয়া বসিল।

খুড়ীমা আর কথা বলিলেন না। তাহার মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে চুলের গোড়ায় হাত বুলাইতে লাগিলেন! কিশোরের পরিশ্রান্ত অন্তর তখন পরম তৃপ্তিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

নবকিশোর বিদেশে থাকিতে কৃষ্ণপ্রেয়সী যেভাবে ডাক্-হরকরার আগমন প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া কাল কাটাইতেন একয়টা দিন কিশোরের দিনগুলাও তেমনি করিয়া কাটিল। ইতিমধ্যে অনিমার চিঠির জবাব আসিল। নীল খামে মোড়া বড় একখানি চিঠি। নবকিশোর ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। অনিমা লিখিয়াছে :—

দেবতা আমার—

এত অভিমান, কেমন কোরে রাখবে ধ'রে! তুমি শিল্পী, তুমি কবি, তুমি যে প্রেমিক। তুমি যা' পার, আমি ত' তা' পারি না।

যে অজানা ছন্দে, যে আপন-ভোলা সুরে তোমার কাব্য আজ লেখনী মুখে লীলায়িত হ'য়ে উঠেচে—তারই রেশটুকু আজ কোথায় গিয়ে বাজে জান? আজ আমি তোমার অনিমাকে ঈর্ষা করি! এত সুখ,

এত সম্পদ, এত ঐশ্বর্য্য, এত আনন্দ, এত তৃপ্তি, এত শান্তি—সে কোথায় রাখবে ধ'রে।

তোমার সৌম্যকে আজ দেখলুম।

সে চির চঞ্চল। কিন্তু এ চাঞ্চল্যে বিরক্তি আসে না, আনন্দের প্রলেপ দিয়ে অন্তরকে পাগল কোরে তোলে।

দুষ্টু ছেলে, কেমন কোরে আলাপ কোর্‌লে জান?

বড়দি' যে নিজে সেধে আলাপ কোরতে আসবেন তা' কি ছাই জানতুম! দাদার বই দেখে তুমি যে কবিতার খাতাখানা কপি কোরে ছিলে, দুপুরে নিজের ঘরটিতে শুয়ে শুয়ে তাই খানিকটা পড়চি। নীচেকার ব'সবার ঘরে তখন তোমার বড়দি'র সাথে বাবা, দাদা ও মাধুরী আলাপ কোরছে। আমি তা' জানতুম না। সে যে ইতিমধ্যে বাড়ী হাতড়ে হাতড়ে কখন আমার ঘরটিতে এসে হাজির হ'য়েচে জানতে পারি নি। হঠাৎ কিসের যেন একটা শব্দে তাকিয়ে দেখি—দুষ্টু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাস্‌চে!

বৌদি' চেনেন্?

কথা শুনে লজ্জায় আমি এত-টুকু হ'য়ে গেলুম। ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে ব'ললুম—চুপ্ চুপ্ দুষ্টু ছেলে চুপ্—আমি বৌদি নয়, দিদি।

সে হেসে বল্লে, আচ্ছা তাই তাই; কিন্তু আমায় চিনেছেন—

ও মা, এমন ছেলেকে কেউ আবার না চিনে পারে? যে আলাপের অবসর না রেখে এমন মিষ্টি কোরে ডাক্‌তে পারে!

ব'ললুম—চিনেচি বই কি ভাই, তুমি যে সৌম্য!

আর আপনি?—

আমি তোমার দিদি।

সে আমায় প্রণাম কোর্‌লে কিছুতে ছাড়লে না।

নবুদা'র চিঠি পেয়েছেন ?

আমি সকৌতুকে বল্লুম—হ্যাঁ।

নবুদা' আমার কথা কিছু লিখেছেন ?

আমি মনে মনে ভাবলুম বলি—লিখ্‌বে না এমন গুণধর ভাই, মুখে ব'ল্‌লুম—কেন ? সে চিঠিখানাতেও সই কোরবে না কি ?

সে কিন্তু একথা শুনে কিছুমাত্র অপ্রতিভ হোল না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—না অনিমাদি, দাদার ভালবাসায় আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই,—সে শুধু বই পড়ে একজামিন পাশ কোরতে—বুদ্ধি তার কিছু নেই।

তাই বুঝি দিদির ভালবাসায় বিশ্বাস কোরে, চিঠিখানায় সই কোরেছিলে ? দুষ্টু ব'ল্‌লে কী জান ?—না, সে কথা আমি তোমায় ব'লতে পারবো না। আমার ভারী লজ্জা করে। দেখলুম চঞ্চলকে ভালবেসে সুখ আছে।

সে জোর কোরে মানুষকে আপন করে—কারু আলাপের অপেক্ষা রাখে না। তাকে ঠেকিয়ে রাখবার মত শক্তি ক্ষুদ্র অনিমার নেই।

এবার বড়দির কথা বলি ?

দুষ্টু আমায় একবারও কি বলেছে—বড়দি' নীচে ব'সে আছেন ?

মধু আমায় নীচ থেকে এসে ব'ল্‌লে—নবুদা'র বড়দি' তোমায় ডাক্‌ছেন ! নবুদার বড়দি' ? শুনতে কত মিষ্টি ! কিন্তু সে যে অনিমারও বড়দি—মূর্খ মাধুরী তা' কি জানে ?

কিশোর, তোমার অনিমাকে নাকি অনেকে বলে সুন্দরী ! জ্ঞান হবার পর থেকে কতজনার মুখেই এই সৌন্দর্য্যের প্রশংসা শুনে আসচি। অন্তরে অন্তরে নারীর নাকি রূপের গর্ব্ব থাকে—হয় ত' আমারও ছিল ; কিন্তু সে কতক্ষণ কিশোর ?

মাটির প্রতিমা যদি চিন্ময়ী হয়,—তাকে দেখেও কি তার রূপের দেমাক থাকে !

তোমার কথাই ঠিক কিশোর, তিনি নারী নন—দেবী। রক্ত-মাংসে-গড়া হোলেও সে প্রতিমা। তাঁকে শুধু প্রাণ দিয়ে পূজা করা চলে—মানুষের মত ভালবাসা চলে না।

মুখের দিকে তাকিয়ে একবার শুধু বোলেছিলাম—বড়দি' ?

এস বোন, এস লক্ষ্মী, বোলে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কিশোর, তুমি জান না, সে কি আরাম—

সেই মুহূর্ত্তে জানলুম—এ মাটির পৃথিবীতেও স্বর্গ আছে। এই মর্ত্ত্যের জীবনালোকে সেই আমার প্রথম অমৃতের আস্বাদ।

জান কি কিশোর,—ঐ রাঙা পা দু'টি কী দিয়ে তৈরী? স্পর্শ কোরলে শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠে।

তোমাদেরই এক কবি লিখেছেন :—

"সকল পুরুষ নহে কৃষ্ণ
সব নারী হয় না যশোদা।"

আজ তোমার অনিমাও সে কথা ঘুরিয়ে বলতে পারে—**সব নারী করুণাময়ী নয়,** বড়দি' হবার সৌভাগ্য সকলের থাকে না।

গানের কথা তোমায় একদিন বোলেছিলুম না? তিনি গাইতে পারেন। অনেকক্ষণ নীচে গল্প-গুজব করার পর তাঁকে আমার শোবার ঘরটিতে টেনে আনলুম। খানিকক্ষণ দু'চারটি মামুলী কথাবার্ত্তার পর ব'ললুম—বড়দি' একটা গান গাইবেন ?

বড়দি' সস্নেহে হেসে বল্লেন—গাইব বই কি বোন!

শুধু-গলার গানও মানুষের যে কত মিষ্টি হয় কিশোর—একদিন শুনো।

তিনি কোন্ গানখানি গাইলেন, জান ?—

"মম মানস মাধবী কুঞ্জে শ্যাম, বিহ গো নিশি-দিন
আমার পরাণ বঁধুরে পাগল করিয়া বাজাও মোহন বীণ।"

ভাবলুম, অন্তরে দেবতাকে যে গানের ভিতর দিয়ে, সুরের ভিতর দিয়ে, ছন্দের ভিতর দিয়ে এমন করে বন্দী করতে পারে এ মর্ত্ত্যলোকে, মানুষের ঘরে জন্ম নিলেও, সে কি শুধু নারী! অহরহ যার হৃদি-বৃন্দাবনে দেবতার বাঁশী বাজে, নূপুরের ধ্বনি হয়, যমুনার জল আনন্দের লহর তুলে প্রাণের দুয়ারে ঘা দিতে থাকে—সে যদি মানবীও হয়,—শ্রেষ্ঠা মানবী সে—সকলের সাথে তার তুলনা চলে না।

তারপর আমাকেও তিনি একখানা না গাইয়ে ছাড়লেন না।

আচ্ছা আমি কোন্ গানখানা গেয়েছিলুম আঁচ্ কোরতে পার? পার না?

—"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব?"

এত আনন্দের পরও মানুষের কি বেঁচে থাকতে ইচ্ছে যায়? যদি আচম্বিতে অন্তরকে ফাঁকি দিয়ে তার সব উৎসটুকু শুকিয়ে যায়?

সৌম্য আমায় রোব্বারে নেমন্তন্ন কোরেছে। ঘণ্টায় ষাট মাইল speedএ রেড রোডে মোটর চালিয়ে আমায় হাওয়া খাওয়াবে।

এ যাত্রা যদি প্রাণ নিয়ে বাঁচি—আবার চিঠি লিখবো। আজ তবে আসি। রাত প্রায় একটা বাজে। তোমারই অনিমা

চিঠি পড়া শেষ হইল; কিন্তু তাহাতে কিশোরের হৃদয় তৃপ্ত হইল কই? উত্তপ্ত ধরাকে শীতল করিবার পূর্ব্বে যদি সহসা বারিধারা থামিয়া যায়, মধুর স্বরে বীণ বাজিতে বাজিতে যদি তার ছিঁড়িয়া যায়, অন্তরে আনন্দের ঝঙ্কার তুলিয়া যদি ধ্বনি তার সুর হারাইয়া ফেলে, হৃদয় কি তৃপ্ত হয়?

অনিমা লিখিয়াছে, সে কবি নয়! মূর্খ অণিমা জানে না, বাণী

ছন্দবদ্ধ হইলেই তাহা কবিতা হয় না। সে ছন্দের ভিতর থাকা চাই ভাব, থাকা চাই সুর, থাকা চাই প্রাণ। যাহার ভাষা আজ ছন্দকে ছাপাইয়াও, ভাব ও সুর-সম্পদে প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে জগতে কোন্ কবির কাব্য তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ?

অনিমা লিখিয়াছে—দেবতা আমার !

আচ্ছা কেমন করিয়া অনিমা একথা লিখিল ? সত্যই কি তাহার হৃদয়ের সে দেবতা ?

যে চিরনিঃস্ব, চিরভিখারী—সে কি কখনও দেবতা হয় ? দান করিবার যোগ্যতা যার নাই, দেবতার অধিকার লইয়া, ভক্তির দান সে গ্রহণ করিবে কোন্ সাহসে ?

তথাপি কিশোরের মনে হইল—অনিমার কথা মিথ্যা নয়। নতুবা ঐ মিষ্টি ডাকটির ভিতর দিয়া, তার অন্তরের গোপনালোকে যে বিচ্ছেদের বাণী এতদিন সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা এমন স্বচ্ছ ও সরল হইয়া তাহারই উদ্দেশে বাহির হইয়া আসিত না। সে কাঙাল হইলে, কী হয় ? অন্তরে যার এত ঐশ্বর্য্য সে ত' ইচ্ছা করিলেই তাহার দারিদ্র্য ঘুচাইয়া দিতে পারে ! তবে আর সে নিঃস্ব কিসে ?

অন্তরের দেবতা ত' আর মাটির ঠাকুর নয় ! সে যে সাড়া দিতে জানে, কথা কহিলে কথার জবাব দিতে জানে। যদি সে দেবতা বধির না হয়, তবে সে ঠিকই শুনিয়াছে :—

"তুমি মোরে কোরেছ সম্রাট
তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব-মুকুট।"

তোমার সম্পদে যে আজ ঐশ্বর্য্যবান্, সে তার নিজের কাছে এমন করিয়া ছোট হইয়া থাকিবে কেন ?

তারপর, অনিমা বড়দির যে পরিচয় দিয়াছে, নবকিশোরের বার বার ইচ্ছা হইল—সে পত্রখানি সে বড়দি'কে পাঠাইয়া দেয়।

অনিমা লিখিয়াছে—সব নারী হয় না যশোদা!

ছোট্ট, পাঁচটি মাত্র কথায় এমন করিয়া তাহার পরিচয় কে দিতে পারিত?

সত্য, সত্য, চন্দ্র সূর্য্যের মত সে কথা সত্য, আকাশের তারার মত সে কথা সত্য, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মত সে কথা সত্য।

"সকল পুরুষ নহে কৃষ্ণ,
সব নারী হয় না যশোদা।"

পরকে আপন করিতে, আপনকে নিকট করিতে, নিকটকে নিকটতম করিতে যার জন্ম সেই সাক্ষাৎ করুণারূপিনী রমণী—নারীকুল-শিরোমণি। একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারা গণৈরপি। তাহারই সঙ্গে তার তুলনা চলে—যে—সীমাহীন নীল নভে জোড়াহীন পূর্ণশশী!

অনিমা ঠিকই লিখিয়াছে:—পূজা করিয়াই তাহাকে আনন্দ, ভালবাসিয়া তাহাকে সুখ হয় না।

কিন্তু যাহাকে ভালবাসিয়া সুখ হয়—সে ঐ সৌম্য! চিরচঞ্চল, চির-মধুর!- চিরনূতন!

কেমন করিয়া সে অনিমাকে আপন করিল?

বৌদি', বৌদি', বৌদি'—কটা লোক এমন করিয়া ডাকিতে পারে? যে হৃদয় পরিচয়ের অবকাশ মাত্র রাখে না, দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিবামাত্র পরকে আপন করিতে দু'হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া চলে—তাহারই মুখে এমন চিরমধুর সম্বন্ধ সাজে!

চঞ্চল বালক যদি ভুলিয়াও একবার কিশোরের সামনে 'বৌদি' বলিয়া

ডাকিয়া বসে, অনিমার মুখ তখনই হয় ত' লজ্জার রঙে লাল হইয়া উঠিবে! কিন্তু কিশোরের হৃদয় কি তাহাতে স্বপ্নাবেশে ভাঙ্গিয়া পড়িবে না!

হৃদয়ের রক্তরঞ্জনে যার অন্তরখানি রাঙিয়া উঠিয়াছে, জন্ম জন্ম সেই ত' বঁধু, সেই ত' সখী, সেই ত' শ্রেষ্ঠ মিত্র। আত্মার যে পরমাত্মীয়, অন্তরের সেই ত' লক্ষ্মী। হৃদয়ের বৈকুণ্ঠ লোকে, প্রেমের দীপালী-সাজাইয়া, জন্ম হইতে জন্মান্তরে তাহারই আরতি!

নবকিশোরের ছুটির দিবসগুলা এমনি করিয়াই কাটিল। বুদ্ধিমতী কৃষ্ণপ্রেয়সী বুঝিলেন—কোথায় যেন একটা ঝড় উঠিয়াছে। তাহারই দাপটে ডালপালা যেমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে—কিশোরের অন্তর যেন দিন দিন তেমনি করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মেঘমুক্ত নীল-আকাশের যে ছিল চির স্বাধীন বিহঙ্গম—আজ তার হৃদয়খানি বুঝি কোন্ মায়াজালে অকস্মাৎ ধরা পড়িয়াছে। সে মায়াবী কি মায়াবিনী কৃষ্ণপ্রেয়সী জানে না, কিশোর কোন দিন তাহা প্রকাশ করিয়া বলেও নাই। তথাপি সে পুত্রগতপ্রাণা জননীর হৃদয় কি যেন এক অজানা বিপদের আশায় সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত হইয়া রহিল। এমনি করিতে করিতে তাহার সংক্ষিপ্ত ছুটির অবসর দিনগুলি ফুরাইয়া আসিল। কিন্তু বলি বলি করিয়াও কিশোর সেবার কলিকাতা যাত্রার কথা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে কৃষ্ণপ্রেয়সী আর এক বিপদ ঘটাইয়া ফেলিলেন। কিশোরকে তিনি জানান নাই। আজ প্রায় তিন চার মাস হইতে তাঁহাকে এক প্রকার কঠিন রোগে ধরিয়াছে। তিথিতে তিথিতে পালা বাঁধিয়া প্রবল জ্বর হয়। জ্বর সুরু হইলে পাঁচ সাত দিন তাহা থাকে, আবার ছাড়িয়া যায়। কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে, গত তিন মাস হইতে এই প্রকারে মাসে দুইবার করিয়া জ্বর ভোগের ফলে তাঁহার শরীর অস্থি-চর্ম্ম-সার ও রক্তশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথম প্রথম ম্যালেরিয়া ভাবিয়া কিছুদিন চিরপ্রচলিত পোষ্ট-আফিসের "কুইনাইন" চলিয়াছিল। তাহাতে ফল না হওয়ায় শ্রীধর গত দুইমাস হইতে গ্রামের কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা সুরু করাইয়াছে ; কিন্তু এতদিন ধরিয়া সেই মান্ধাতার আমলের কৈলাস নন্দীর ওষুধ খাওয়াইয়া ঘটি ঘটি পাঁচন গিলিয়াও কৃষ্ণপ্রেয়সীর রোগের লক্ষণ কিছু ভাল বোধ হইল না। তাহার উপর সম্প্রতি হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থাও সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয় না, মাঝে মাঝে ফিক্ ব্যথা উঠে এবং তাহা উঠিলে, তৎক্ষণাৎ গ্রামান্তর হইতে ডাক্তার ডাকাইয়া যন্ত্রণার আশু উপশমের ব্যবস্থা করিতে হয়। একদিন নবকিশোর বাটীতে থাকিতে কৃষ্ণপ্রেয়সীর জ্বর-অবস্থাতেই সেই যন্ত্রণা উঠিল। নবকিশোর ডাক্তার ডাকিতে গিয়া তাঁহার মুখেই রোগের আনুষঙ্গিক বিবরণ শুনিল এবং ইহাও জানিল, এখন তাহা chronicএ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কলিকাতার মত সহরে, ভাল চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসা করাইয়া দীর্ঘদিন কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বায়ু পরিবর্ত্তন করিলে যদি ইহার উপশম হয়!

কিশোর মনে মনে কৃষ্ণপ্রেয়সী এবং শ্রীধর উভয়ের উপরেই রাগ করিল। প্রথম, তাহার খুড়ীমা আজ তিনমাস হইতে এতবড় শক্ত অসুখের কথা তাহার নিকট গোপন করিয়া আছে কেন? দ্বিতীয়, শ্রীধর ত' সব জানে, তবে সে পত্নীগতপ্রাণ, সঙ্গতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাহার যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও বায়ুপরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করে নাই কেন?

কলেজ খুলিয়া গেল, কিশোরের কলিকাতা যাওয়া হইল না! সে তাহার খুড়ীমার রোগ-শয্যার পার্শ্বে, শিয়র আগুলিয়া বসিয়াছিল। কৃষ্ণপ্রেয়সী তাহার ম্লান হাত দুটি দিয়া কিশোরের হাতখানি ধরিয়া রহিলেন। এত যন্ত্রণার ভিতরও যেন তাঁহার তাহাতেই পরম শান্তি বোধ হইতেছিল! তিনি ভাবিতেছিলেন—এমনি করিয়াই এবার যদি জীবনটা

শেষ হইয়া যায়—দুঃখ কিসের ? শ্রীধরের মত স্বামী এবং কিশোরের মত উপযুক্ত পুত্রকে রাখিয়া যদি মরণ হয়, নারীর পক্ষে তাহা অপেক্ষা কাম্য আর কী আছে !

ইতিমধ্যে অনিমা ও করুণাময়ীর কয়টি পত্র আসিল, কিশোর তাহার একখানিরও জবাব দিল না। সৌম্য তাহাকে কখনও পত্র লেখে না, সেও অবশেষে লিখিয়া জানাইল—তাহার কলেজ খুলিয়া গিয়াছে, এখনও কলিকাতায় না ফেরার দরুণ, বাবা ও মা রাগ করিতেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবুর ঔষধ ফলিল, জ্বর বন্ধ হইল ; কিন্তু অন্যান্য উপসর্গ বন্ধ হইল না। কৃষ্ণপ্রেয়সী পথ্য করিয়া তাহার পরদিনই আবার সংসারের নিয়মিত কাজ-কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করিতে সুরু করিলেন।

কিশোর কহিল—"খুড়ীমা, এমনি ক'রেই তুমি ম'রবে ?"

কৃষ্ণপ্রেয়সী ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন—"কেন, আমার কি হয়েচে বাবা ?"

কিশোর গম্ভীর হইয়া কহিল—"নাঃ কিছু না, তিলে তিলে এমন ক'রে মরার চেয়ে বরং একদিনে সাবাড় হওয়া ভাল ছিল !"

"পাগল ছেলের কথা শোন ! হ্যাঁরে কিশোর, মানুষের শরীরে জ্বর-জ্বালা কিছু হবে না ?"

"হু"—বলিয়া কিশোর শ্রীধরের উদ্দেশে গেল এবং তাহাকে কাছে পাইয়া বিস্তারিতভাবে কৃষ্ণপ্রেয়সীর রোগের গুরুত্ব এবং চিকিৎসকের পরামর্শের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সময় থাকিতে একটা বিহিত করিতে কহিল।

বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বে শ্রীধর এ ব্যাপারটিকে এত গুরুতরভাবে ভাবিয়া দেখে নাই ! পাড়াগাঁয়ে বাস করিতে হইলে, ম্যালেরিয়া বা পালাজ্বর

আহার না হয়। আর ঐ যে নিঃশ্বাসের কষ্ট, তাহাই বা কী এমন গুরুতর! কত লোককে সে শুনিয়াছে মাদুলী লইয়া সারিয়া গিয়াছে। তথাপি কিশোরের মুখে আনুপূর্ব্বিক সব কথা শুনিয়া সে কিছু দিনের জন্য দোকান কর্ম্মচারীদের উপর ছাড়িয়া কলিকাতা গিয়া স্ত্রীর ভালভাবে চিকিৎসা করানোই ঠিক করিল। কিন্তু এ প্রস্তাব শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী বেঁকিয়া বসিলেন। কী এমন হইয়াছে তার, যে লাট-বহর ঘাড়ে করিয়া সাত তাড়াতাড়ি কলিকাতা যাইতে হইবে। কৃষ্ণের যদি করুণা থাকে, এইখানেই সে সারিয়া উঠিবে।

কৃষ্ণপ্রেয়সী ভাবিতেই পারেন না, এই সংসারের গুরুভার কাহারও উপর নিশ্চিন্তে ছাড়িয়া দিয়া বিদেশে যাওয়া চলিতে পারে। গৃহ-বিগ্রহ নারায়ণের মাথায় হয়ত' নিত্য তুলসী পড়িবে না, যথাসময়ে ভোগ হইবে না, গরু-বাছুরগুলি আহার পাইবে না, শ্বশুরের ভিটায় নিত্যকারের মঙ্গল-দীপ জ্বলিবে না।

শ্রীধর বা নবকিশোর কেহই তাহাকে কলিকাতায় যাইতে রাজী করিতে পারিল না। নবকিশোর মনে মনে পীড়িত হইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী সস্নেহে কহিলেন—"দেখিস বাবা এবার আমার সব অসুখ সেরে যাবে।"

নবকিশোর অগত্যা কলিকাতায় চ্যাটার্জ্জী সাহেবের নিকট খুড়ীমার হঠাৎ অসুখের কথা জানাইয়া আরও এক হপ্তা গ্রামে থাকিয়া গেল এবং দেখিল এই একটা দিনে সত্যই কৃষ্ণপ্রেয়সী অনেকটা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, দেহে পূর্ব্বাপেক্ষা বলও অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিশ্বাসের কষ্ট আর হয় না।

তথাপি সে ভগ্নমন লইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও একাকী কলিকাতায় ফিরিল। যাইবার পূর্ব্বে কৃষ্ণপ্রেয়সীকে কহিল—খুড়ীমা, আমি তোমার

অসুখের কথা বোলে সেখানকার খুব বড় ডাক্তারের মত নিয়ে ঔষধ পাঠিয়ে দেব—তুমি রোজ খাবে বল, আমায় ছুঁয়ে দিব্যি কর, নইলে আমি একপা-ও এগুবো না।"

কৃষ্ণপ্রেয়সী সে শপথ করিলেন; কিন্তু বিদায় মুহূর্ত্তে চোখের জলে তাহাকে প্রবোধ দিবার ভাষা কোথায় ভাসিয়া গেল।

নবকিশোরের কলিকাতা আসার কিছু নিশ্চয়তা ছিল না; তাই পূর্ব্বাহ্নে কোন খবর দিতে পারে নাই। যখন কলিকাতায় পৌছিল, তখন বেলা প্রায় দুইটা।

সেদিন রবিবার, ছুটীর দিন। সুতরাং সকলকেই বাড়ীতে পাইবার কথা; কিন্তু নবকিশোরের সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইল না। বেয়ারাদের নিকট অনুসন্ধানে জানিল, সৌম্য ও মেমসাহেব আহারের পর মোটরে বাহির হইয়াছেন! চ্যাটার্জ্জী সাহেব গত শুক্রবার রাত্রিতে তাঁহার রাঁচীর বাড়ীতে রওনা হইয়াছেন।

নবকিশোর তখন হাত-মুখ ধুইয়া জামা-কাপড় ছাড়িল। সে অতি প্রত্যূষেই সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া আসিয়াছিল। বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে আহারাদিও বেশ ভাল মতই করিয়াছিল! তাই অত বেলায় কলিকাতা পৌছিলেও বিন্দুমাত্র ক্ষুধা বোধ করিল না। নিজের ঘরে খাটটির উপরে বিছানাটি বিছাইয়া বিশ্রামের আয়োজন করিল।

কিন্তু বিশ্রাম হয় কই? নানা বিক্ষিপ্ত চিন্তা আসিয়া তাহার চঞ্চল মনকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে ইতস্ততঃ খানিকক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর গরম আলোয়ানখানি গায়ে জড়াইয়া বড়দির বাড়ীর দিকে রওনা হইল। বেলা তখন প্রায় চারি ঘটিকা।

বড়দির বাড়ীর বাহিরের দরজাগুলি তখন সব বন্ধ। নবকিশোর

কৌশলে ভিতরে হাত দিয়া পরিচিত ছিট্‌কানী খুলিয়া দিল। উদ্দেশ্য কাহাকেও কিছু না জানাইয়া সকলের সামনে আসিয়া পড়িবে। ফটকের ভিতরে আসিয়া লন্ পার হইয়া, পিছনের খিড়কি দিয়া সে বাটীর ভিতরে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার পর সামনের বারান্দার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই—নবকিশোরের সতর্ক চক্ষু এতক্ষণ যে সব পলাতকদের উদ্দেশ্যে ঘোরাঘুরি করিতেছিল,—তাহাদের সকলকেই সেখানে ভিন্ন ভিন্ন দলে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আবিষ্কার করিল। আর একটি প্রাণীকে সে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে আবিষ্কার করিল—সে অনিমা। নবকিশোর যাহাকে কখনও ভাবে নাই, সে এ বাটীর অধিকার সীমানার ভিতর ইতিমধ্যেই এতখানি সুলভ হইয়া পড়িয়াছে।

কিশোর দেখিল—সৌম্য ও মাষ্টার মহাশয় বারান্দার এক কোণে একটি ছোট্ট মাদুর বিছাইয়া পরম নিবিষ্টমনে লুডো খেলিতেছে। ঠিক তাহারই অনতিদূরে অনিমা লালমোহনকে কোলে লইয়া তাহারই অবোধ্য ভাষায় নানা কথার কাকলী তুলিয়া খোকার সহিত পরমানন্দে গল্প করিতেছে বারান্দার আর এক কোণে, বড়দি তাঁহার জননীর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া কি একখানি বই পড়িতেছে—আর মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী সেই অবস্থায় বসিয়া তাহাই শুনিতেছেন।

"ওমা! নবু যে, আয় আয়—"

চ্যাটার্জ্জী-গৃহিনী সর্ব্বপ্রথমে নবুকে দেখিতে পাইলেন। নবু প্রথমে আসিয়া তাঁহাকেই প্রণাম করিল। তাহার পর তাহার বড়দিদিকে।

"এই এলুম বড়দি, এই মাত্র ট্রেণ থেকে নামছি"—বলিয়া মাষ্টার মহাশয়কে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইল।

মাঝপথে নবু দেখিল, অনিমা লালুকে কোলে লইয়া তাহারই দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। শ্রীমান্ লালমোহনের ফুলো ফুলো গাল

দুটি একবার টিপিয়া দিয়া, আদরভরা দৃষ্টিতে অনিমার চোখে চোখে যেন নিমেষে কি কথা কহিয়া মাষ্টার মহাশয়ের দিকে আগাইয়া গেল। বুঝিবা মনে মনে কহিল—সুযোগ থাকিলে তোমাকেও একটু আদর করিতে পারিতাম।

সৌম্য উঠিয়া নবুর চরণে নতি জানাইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল—নবকিশোর একবার মাত্র তাহাকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া, মাথায় হাত বুলাইয়া ছাড়িয়া দিল—তাহার পর মাষ্টার মহাশয়ের প্রসারিত চরণ-যুগলের উপর পরম সমাদরে মাথা রাখিল।

"—এস নবু এস। বড্ড যে রোগা দেখছি, ম্যালেরিয়া ধরে নি ত?"

"—না স্যর! আমি ভালই আছি, আপনি ভাল আছেন?"

তাহার পর সকলে মিলিয়া তাহাকে তাহার খুড়ীমার শারীরিক অবস্থার কথা প্রশ্ন করিতে সুরু করিল—কেবল অনিমা কোন কথা কহিল না। সে কেবল তাহার বড় বড় ভাষা চোখ দুটি দিয়া নবকিশোরের কথাগুলি গিলিতে লাগিল।

নবকিশোর যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে কৃষ্ণপ্রেয়সীর অসুখের আনুপূর্ব্বিক কাহিনী সকলকে নিবেদন করিল।

চ্যাটার্জ্জী-গৃহিণী শুনিয়া কহিলেন—"তাঁকে এখানে আনতে পারলেই ভাল কোরতে নবু। হার্টের কোন অসুখে অবহেলা করা ঠিক নয়।"

নবকিশোর তদুত্তরে জানাইল, সে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই; কিন্তু কি কারণে যে তাঁহাকে রাজী করা গেল না, তাহাও জানাইতে ভুলিল না।

ইতিমধ্যে যোগেশচন্দ্র কহিল—"করুণা, একবার চায়ের কেট্‌লিটা বসাও না? নবুও এয়েচে একটু চা-খাওয়া যাক।"

করুণাময়ী এবার স্বামীর দিকে হাসিভরা মুখে চাহিয়া কহিল, "এরি মধ্যে হাই উঠ্‌তে সুরু হ'য়েচে বুঝি? কিন্তু নবুত' চা' খায় না।"

মাঝখানে সৌম্য কহিল—"নবুদা নাই বা খেলে বড়দি ; কিন্তু আমি ত' চা খাই অনিমাদিও খান।" পরে মা'র দিকে ফিরিয়া কহিল—"মা, এখন তুমি চা' খাবে ?"

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী কোন কালেই অত্যধিক চা পান করেন না। বিশেষ করিয়া মাঝে মাঝে অম্বলের ব্যথা উঠিতে তিনি এক বেলার বেশী চা খাওয়া ত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি সৌম্যের প্রশ্নে চ্যাটার্জ্জী-গৃহিণী কোন জবাব দেন না দেখিয়া অধীর সৌম্য কহিল—"সবাই খাবে বড়দি' এবার চায়ের কেট্‌লীটা তুমি চড়িয়ে দাওগে।"

ইতিমধ্যে অনিমা লালুকে সৌম্যের কোলে দিয়া, "আজ আমি চা করি বড়দি"—বলিয়া সে নিজে উনানে কেট্‌লী চড়াইতে অগ্রসর হইল।

সৌম্য অনিমাকে কহিল—"তুমি আমাদের secret জান, অনিমা দি' ? কার পেয়ালায় কতটুকু চিনি দিতে হবে ?—নাঃ, আজ তুমি সব spoil কোরবে। Three for mother, three for বড়দি', two for me, nil for জামাইবাবু—বুঝলে কিছু ?"

চতুরা অনিমা এ সঙ্কেত নিমেষেই বুঝিল। অর্থাৎ কাহাকে ক' চামচ চিনি দিতে হইবে—সৌম্য তাহারই ফরমুলা আওড়াইয়া গেল।

অনিমা হাসিয়া কহিল, "nil for জামাইবাবু কেন ?"

এবার মাষ্টার মহাশয়ও সমানে হাসিয়া তাহার জবাব দিলেন—"তা বুঝি জান না অনিমা ? সৌম্য বলে, বেশী চিনি খেলে আমার ডায়বেটিশ হবে।"

"তবে নিজের বেলা দু' চামচ কেন ?"

সৌম্য কহিল—"আমি যে Sportsman অনিমা দি'। তুমি চিনির বস্তা খাইয়ে দাও, আমার কিছু হবে না।"

কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল।

অনিমা ইতিমধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে গ্যাসের উনান জ্বালিয়া একটি বড় কেট্‌লী তাহাতে চাপাইয়া দিল। বড়দি' ভাঁড়ার ঘর হইতে ময়দার জার ও তরকারীর ঝুড়ি আনিয়া ফেলিলেন। করুণাময়ী তরকারী কুটিতে লাগিলেন, মা লুচির ময়দা ঠাসিতে লাগিলেন।

খানিকক্ষণ গল্প করিতে করিতে লুচি, বেগুন ভাজা, হালুয়া ও চা তৈয়ারী হইয়া গেল। সকলে পরমানন্দে "টিফিন্" করিতে বসিল।

সৌম্য চায়ের বাটীতে মুখ ঠেকাইয়া পরম তৃপ্তিতে কহিল—"আঃ, চা' যা' কোরেছে অনিমাদি একেবারে marvellous—নয় জামাইবাবু? চিনি যা' দিয়েছ—Just to the measure. নবুদা' তুমি আজ একবারটি চা খেয়ে দেখ, ভুলতে পারবে না জীবনে"—বলিয়া জবাবের প্রতীক্ষায় তাহার মুখের দিকে তাকাইল। চ্যাটার্জ্জী-গৃহিণী কহিলেন—"খাও না নবু এক কাপ চা, সমস্তদিন ট্রেনে এয়েচ"—পরে অনিমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"দাও মা তুমি নবুকে একবাটী।"

অনিমা নবুর দিকে ফিরিয়া কহিল,—"তোমার ক' চামচে চিনি লাগবে?" করুণাময়ী কহিলেন—"ও কী কোরে জানবে? যে কোন দিন চা খায় না, সে কি কখনও ব'লতে পারে তার কতটুকু চিনি লাগে"—বলিয়া সকৌতুকে চাহিয়া রহিলেন। নবকিশোর মনে মনে কহিল—চিনি তুমি না দিলেও আমার মিষ্টি লাগবে।

অনিমা কিন্তু আন্দাজমত চিনি দিল। নবকিশোর পরম তৃপ্তির সহিত চা-পান করিতে লাগিল।

অনিমা তাহা হইলে এখানে শুধু নিয়মিত যাতায়াত সুরু করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—ধীরে ধীরে করুণাময়ীর গৃহিণীপণার চতুর্সীমানায় ইতিমধ্যেই বেশ একটুখানি অধিকারের আসন করিয়া লইয়াছে। সে যাহা একদিন মানশ্চক্ষে কল্পনা করিয়া লইয়াছে,—বাস্তব তাহারই সত্যরূপ লইয়া আজ

মূর্ত্তি ধরিতে সুরু করিয়াছে। করুণাময়ীর পারিবারিক জীবনকে অবলম্বন করিয়া যে শান্ত-স্নিগ্ধপবিত্র সংসারটি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে অনিমা আজ শুধু অতিথি নয়—গৃহ-কর্ত্রীর প্রতিনিধি, তাহারই নিত্য-সহচরী বলিলেই হয়। বেশ অবলীলাক্রমে সে এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে। যখন যাহা করা দরকার বোধ করে—স্বচ্ছন্দে করে! অনুমতির অপেক্ষা বড় একটা রাখে না।

আজ এত দিনের পর অনিমাকে দেখিয়া কিশোরের বিচ্ছেদ-কাতর উদাসী মন আনন্দে রাঙিয়া উঠিল। যে কথা কহিতে সুরু করিলেই কিশোরকে পরাজয় মানিতে হইত – সে আজ ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা নববধূর মতই নির্ব্বাক। তথাপি ঐ সব গুরুস্থানীয়া মহিলা ও পুরুষদের সামনে তাহার আচারে ব্যবহারে এই অতি সাবধানতা ও সংযম ও তদুপরি লজ্জার ছাপটুকু ঐ সুন্দর মুখখানিকে কি অপরূপ শ্রীতেই না ভরাইয়া তুলিয়াছে।

ঐ অস্ত-রবির কিরণ-লাগা অধরের বর্ণ, স্বপ্নভরা, রহস্যভরা ভ্রমর-কৃষ্ণ, আঁখির দৃষ্টি, যৌবনপুষ্ট তনুলতার প্রতি অংশ ঘিরিয়া আজ যে বন্দনা গান সুরু করিয়াছে—রূপের যে পূজারী, যৌবন-দেবতার যে একনিষ্ঠ উপাসক, তাহারই অন্তরকে আজ উচ্ছ্বসিত আনন্দে অধীর করিয়া, মাতাল করিয়া তুলিবার পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট নয়? পাগল নবকিশোর আজ যেন সমস্ত সত্তা হারাইয়া সেই রূপ-সুধায় আত্মনিমজ্জন করিল। আর অনিমা? অনিমা শুধু আজ তাহাকে দেখিয়াই ক্ষান্ত—কথা বলে না। শুধু দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া তাহার তৃপ্তি—প্রশ্ন মাত্র করে না!

"—মা! এবার উঠি, বেলা যে গেল! সৌম্য আমায় বাড়ী রেখে আয়—" বলিয়া মিসেস চ্যাটার্জ্জী উঠিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু সৌম্যের উঠিবার বিন্দুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সে কহিল—"আর একটু থাক

না মা, সন্ধ্যার পর জামাইবাবু তোমায় রেখে আসবেন।” করুণাময়ী কহিলেন,—“তাই থাক মা।”

কিন্তু তাহাদের জননী তাহাতে সম্মত হইলেন না। জানাইলেন অনেক ক’টি ছেলে-মেয়েকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছেন, আর বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। তাহা ছাড়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঘর-সংসার, রান্নাবান্নার একটু তদারক করিতে হইবে। সৌম্যের যাইতে ইচ্ছা নাই দেখিয়া তিনি জামাতাকে বাড়ী রাখিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মাষ্টার মহাশয় তখন গাড়ীখানি বাহির করিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে বাড়ী পৌঁছাইতে চলিলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে আনন্দ-কোলাহল একটু নিবিয়া আসিল। আর কোন সূত্র ধরিয়া নূতন করিয়া আলোচনা সুরু করিতেও কেহ বড় একটা অগ্রসর হইল না। কিন্তু এমন করিয়া চুপ্‌চাপ্ মানুষ বসিয়া থাকিতে পারে কতক্ষণ! বিশেষ সৌম্যের পক্ষে অধিকক্ষণ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকা সহজ সাধ্য নয়।

সে কহিল—“নবুদা, তোমার বুঝি ঘুম পাচ্চে?”

নবকিশোর কহিল “কেন?”

“নইলে তুমি খুব ক্লান্ত, তোমায় আজ কেমন যেন লাগ্‌চে, নয় বড়দি’?”

করুণাময়ী কিশোরের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। হয়ত কয়েক ঘণ্টা ট্রেন ভ্রমণের ফলে মুখখানা শুকাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে ক্লান্তিতে এত শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িবার কথা নয়।

বড়দি’ কহিলেন—“কিশোর চল একটু গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি, তোমার মাষ্টার মহাশয় এখনি গাড়ী নিয়ে ঘুরে আসবেন। ঘুরে বাড়ী ফেরবার পথে অনুকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবো’খন।”

সৌম্যের কিন্তু এ ব্যবস্থা মনঃপূত হইল না। সে কহিল, "তোমার এই পুচকে গাড়ীতে এত 'load' চলবে না বড়দি'। টায়ার ফাটবার ভয় আছে। বরং, তুমি মাকে ফোন্ ক'রে দাও—বড় গাড়ীখানা আমি নিয়ে আসি।"

কিন্তু আজ আর সৌম্যের সহিত আনন্দ করিয়া মোটর অভিযানে বাহির হইতে অনিমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ রহিল না।

সে কহিল—"আজ থাক বড়দি'! একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে হবে। বাবার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।"

নবকিশোর এবার বড়দির দিকে ফিরিয়া কহিল—"তার থেকে আপনি একখানা গান গান না বড়দি', আমরা শুনি।"

অনিমাও অস্ফুটস্বরে কহিল—"সেই ভাল।"

কথা শুনিয়া স্নিগ্ধ হাসিতে বড়দি'র মুখখানা ভরিয়া উঠিল। তিনি স্মিতমুখে কহিলেন—"নবু বুঝি আজকাল গানের খুব ভক্ত হ'য়ে পড়েচো? আমি গাইতে পারি, কে ব'ল্‌লে—অনু বুঝি?"

নবকিশোরও এবারে সমানে হাসিয়া কহিল—"কস্তুরীর গন্ধ কখনও লুকানো থাকে না বড়দি'। কিন্তু অনিমা না ব'ল্‌লেও আমি একদিন বুঝতে পারতুম—"

করুণাময়ী কহিলেন—"না, কিশোর তুমি তা' পারতে না। কস্তুরীর কারবারী যারা নয়—গন্ধও তারা টের পায় না। বুঝেছি আমার পেছনে আজকাল স্পাই লেগেচে। কিন্তু চরটি ত' ভাল নয় বাপু—" বলিয়াই সকৌতুকে অনিমার দিকে তাকাইয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন।

অনিমা কহিল,—"বড়দি, আপনার সঙ্গে আলাপ হবার অনেক আগে থেকেই আমি একথা জানতুম। বিশ্বাস না হয়—ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

সৌম্যের কিন্তু এসব কথা কাটাকাটি মোটেই ভাল লাগিতেছিল না।

সে অসহিষ্ণু হইয়া কহিল—"যদি মন দিয়ে গান গাইতে পার বড়দি' তবে গাও, নইলে বল আমিই না হয় একখানা ধরে দি ?"

করুণাময়ী কহিলেন—"রক্ষা কর সৌম্য, ওগুলো তোর মাষ্টার মশায়ের জন্য তুলে রাখিস—"

সৌম্য পরম বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল—"তা' ত' ঠিকই বড়দি। ধ্রুপদ কি আর সবাই বুঝবে ? কিন্তু তোমায় আজ গোড়াতেই বলে রাখচি, বড়দি', ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তুমি গান গাইতে পাবে না—যত সব ছিচ্‌কাঁদুনে—"

নবকিশোর ও অনিমা সৌম্যের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। বড়দি' দেখিলেন—সর্ব্বনাশ, প্রাণ ভরিয়া গাহিতে সুরু করিলেই যে দু'চোখ বহিয়া জল পড়ে—দুষ্টু তাহাও লক্ষ্য করিয়াছে ! তিনি হাসিয়া কহিলেন—"বেশ, তবে একটা আধুনিক গানই গাই ?"

অনিমা বুঝিল, দুরন্ত সৌম্য না বুঝিয়া তাঁহার একটা গুপ্ত স্থানে আঘাত করিয়া ফেলিয়াছে। তাই সে বাধা দিয়া কহিল—

"আধুনিক গান আপনার মুখ থেকে আজ আর আমরা শুনবো না, সে গান শোনবার ঢের লোক আছে। আপনি যে গান সব থেকে বেশী ভালবাসেন, সেই গানই আপনাকে গাইতে হবে।

সৌম্য এবার অভিমান করিয়া কহিল—"বেশ, তবে তাই শোনগে যাও, আমি এবার উঠলুম !"

"ঈস্, উঠবেন বই কি ? উঠলেই হোল কি না ? কই ওঠ ত দেখি—" বলিয়া অনিমা প্রস্থানোদ্যত সৌম্যের কোঁচার খুঁটটি ধরিয়া ফেলিল !

করুণাময়ী এবার সৌম্যের দিকে ফিরিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"আজ

এমন একটা গান গাইব যে সৌম্য তোরও ভাল লাগবে। হোলই বা ঠাকুর-দেবতার গান…হালকা সুরে গাইলে ওস্তাদদের খারাপ লাগে না।” “ওস্তাদ” বলিয়া আহ্বান করায় সৌম্যের বিরক্তিভাব অনেকটা কাটিয়া গেল। সে এবার পুলকিত হইয়া কহিল, “আচ্ছা কি সুরে গাইবে বড়দি?”

“শোন ছেলের কথা? রাগিণীর কথা ব’ললে তুই কি বুঝবি?—এখানে যে অনিমা ব’সে আছেন, তোর খেয়াল নেই বুঝি?”

সৌম্য এবার সত্যই বুঝিল—বড় বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে। অনিমা যে গান জানে এবং বেশ ভালই জানে, দরকার হইলে রাগ-রাগিণীর পার্থক্য বিচার করিতে পারে,—সৌম্য এতক্ষণ তাহা ভাবিয়া দেখে নাই। সুতরাং তাহার এ অহেতুকী মুরুব্বীয়ানা কাজে লাগিল না দেখিয়া সে বিমর্ষ হইয়া কহিল—“এমনিই জিজ্ঞাসা ক’রছিলুম বড়দি—সত্যই ও সব রাগ-রাগিণীতে আমার দরকার কি!”

অনিমা হাসিয়া কহিল—“তবে যে বড় ধ্রুপদের কথা কইছিলে?”

সৌম্য প্রশ্ন শুনিয়া এবার ভয়ে ভয়ে কহিল—“তুমি ধ্রুপদও জান নাকি অনিমাদি; কিন্তু আমি যে শুনি, সে সব মেয়েমানুষের গান নয়?”

“তুমি ঠিকই শুনেচ সৌম্য—সে সব গান তোমার মাষ্টার মশাইদের জন্য,” বলিয়া সে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

আহা বেচারী সৌম্য, শেষকালে তার আনাড়ী নবুদার সামনেও মুরুব্বীয়ানার শেষ সার্টিফিকেট্‌টা এমন করিয়া মাঠে মারা গেল। অনিমার উপর তাহার রাগই হইল; ইতিমধ্যে করুণাময়ী মধুর সুর-লহরী তুলিয়া উদাত্তকণ্ঠে গান ধরিলেন—

“সে যে পলকে লুকায়ে চলে যায়—
লুকোচুরী ভালবাসে বুঝি মোর শ্যাম রায়।”

নবকিশোর ও অনিমা প্রাণ ভরিয়া সে গান শুনিল। মানুষ যে সত্যই তার অস্তিত্ব ভুলিয়া, গানের সুরে নিজের সত্তাকে এমন করিয়া ডুবাইয়া দিতে পারে—অনভিজ্ঞ কিশোর বুঝি জীবনে তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

সে কেতাবে পড়িয়াছিল—সারা মুখে বিষ ছড়াইয়া হিংস্র বিষধর না কি গানের সুরে ধরা পড়ে। এতদিন যাহাকে কবির কল্পনা বলিয়া মনে করা চলিত সে আজ তাহা হইলে সত্যই সম্ভব।

কালিন্দীর কূলে কূলে সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া নাগরাজ তাল দিয়াছিল বোধ করি এমনি সুর শুনিয়াই। বুঝি তাহারই মাথায় বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের চপল চরণের নূপুর-লীলা এমনি সুধার লহর তুলিয়া নৃত্যের ছন্দে বাজিয়া উঠিত।

আজ অন্তরে যে পরমোৎসব সুরু হইয়াছে, তাহারই আড়ালে আজ সেই বাণী—সেই সুর, সেই ছন্দ! শরীর-ধারিণী মানবীর কণ্ঠে আজ কেমন করিয়া এমন ধ্বনি বাজিয়া উঠিল? শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজাইয়া, ভক্তির প্রীতি-চন্দনে, হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অংশে যাহার পূজা ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে, অন্তরে আজ এমন কী নৈবেদ্য বাকী আছে—অভিনন্দনের বাণীতে ভরিয়া যাহা এই অমৃতকণ্ঠী গায়িকার চরণ-কমলে নূতন করিয়া নিবেদন করা চলে?

গান থামিলে তাই নির্ব্বাক-নিস্পন্দ কিশোর মৌনী হইয়াই রহিল—তাহার মুখ দিয়া একটি প্রশংসার বাণীও বাহির হইল না।

আর সৌম্য? দিদির কণ্ঠে ঠাকুর দেবতার গান শুনিলে সে অন্তরে ব্যথা পায়—তাহার চোখ দিয়া ধারা বহে বলিয়া।

কিন্তু সে ব্যথা কি আনন্দের ব্যাথা নয়! অশ্রুর ধারা কি শুধু দুঃখকেই বহিয়া আনে? অন্তরে যার আনন্দ জমিয়া জমিয়া জমাট বাঁধিয়া

গিয়াছে, সৌম্য জানে না, গণ্ড বহিয়া তাহারই ধারা, প্রয়োজন হইলে লক্ষ মুক্তায় ঝরিয়া পড়িতে পারে। এ পাষাণ পৃথিবীর বুকে এখনও তাহারই প্রবাহ বহে। তাই আজীবন বেদনা বহিয়াও সে কাঁদিয়া হাসে, কাঁদিয়া আনন্দ পায়, কাঁদিয়া শীতল হয়।

তথাপি আজ সে অস্থিরের মুখে চাঞ্চল্য নাই। ঠাকুর-দেবতার গান আজ আর তাহাকে বিদ্রোহী করিল না। যে চিরচঞ্চল—সে যেন আজ চির সুধীর!

আর অনিমা?

চুম্বকের আকর্ষণ যদি লৌহকেও নিকট না করিয়া থাকে—তবে তাহার জবাব আর একদিন দিব।

গান থামিল; কিন্তু সুর থামিল কই? কানের ভিতর দিয়া যাহা অন্তরে পশিবামাত্র ঝঙ্কার তুলিতে সুরু করিয়াছে—তাহা আচম্বিতে থামিয়া গেলেও তাহার রেশটুকু থামে না যে! ধ্বনি মরিল—প্রতিধ্বনি এখনও জাগিয়া আছে। তাহারি সাড়া দিতে তন্ময় নবকিশোর একবার মাত্র মুখ ফুটিয়া কহিল—

"—আর একখানা বড়দি?"

"—কিন্তু আমি আর গাইব না ভাই, এবার অনিমা একখানা গাক?"

অনিমা কথা শুনিয়া প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"আজ কিছুতে তা হবে না। এ গান শোনবার পর যদি আমি গান গাইতে যাই,—সৌম্য আমায় তাড়িয়ে দেবে।"

"কিন্তু তুমিই আর একখানা গাও না বড়দি"—তন্ময়ভাবে সৌম্য এই কথাটি কহিল।

"তবে রে দুষ্ট, ঠাকুর-দেবতার গান তোর ভাল লাগে না? কিন্তু আমিই বা কেন বার বার গাইব শুনি? অনিমাই বা এত

জেদ্ করবে কেন?—অনি, তোমায় একখানা গাইতেই হবে—কি বল কিশোর?"

কিন্তু কিশোর কিছু বলিল না। কি বলিবে সে ভাবিয়া পাইল না। করুণাময়ী শত চেষ্টা করিয়াও আজ অনিমার গো ভাঙ্গাইতে পারিল না। সে গাহিল না।

ইহার পর করুণাময়ীরও আর গান গাহিবার উৎসাহ রহিল না। ইতিমধ্যে আবার মাষ্টার মহাশয়, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীকে পৌছাইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

অনিমার অন্তর আজ নবকিশোরকে দেখা পর্য্যন্ত প্রথম হইতেই উঠি-উঠি করিতেছিল। সে ভাবিল হয় ত' আজ এখানে না আসিলে এতক্ষণ কিশোর তাহাকে দেখিতে তাহাদেরই ওখানে ছুটিত। বড়দি'কে তাহারা যতই নিকট ভাবুক, তাহার সম্মুখে কিশোরের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া গল্প করিবার মত তাহার সাহস নাই। কিশোর যাহা সহজ ভাবে সম্পন্ন করিতে পারে, অনিমা তাহা পারে না। আজ কতদিন পরে কিশোর আসিয়াছে, বিশ্রাম না করিয়া প্রথমেই ছুটিয়াছে এই বড়দির বাড়ী। অনিমা যদি এখানে আজ না-ই থাকিত—সে কি একবার ইহারই মধ্যে কোন ছুতা খুঁজিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিত না? কিন্তু এখনও ত' ইহা অসম্ভব নহে। কিশোর ত' আজই তাহাকে পৌছাইতে তাহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিতে পারে এবং আসিলে যে সে বাড়ীর দরজা হইতেই বিদায় পাইবে—সে সম্ভাবনাও কম। ইতিমধ্যে গাড়ী আসিয়া পড়ায় অনিমা কহিল, "এবার আমাকে সৌম্য রেখে আসুক, বড়দি?"

সারথী প্রস্তুতই ছিল। প্রশ্ন শুনিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। করুণাময়ী

কহিলেন. "সৌম্য তোর অনিমাদি'কে বাড়ী রেখে আয়—অনু, কাল আবার আসবে ?"

—"কিন্তু দুপুরে এলে পড়াশুনার বড্ড ক্ষতি হয় বড়দি'। সামনে একজামিন—যতই ভাবচি, মনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসচে।"

—"তবে যখনই সময় পাবে এস বোন ? পারি ত' সামনের রোববারে আমি একবার যাব।"

সৌম্য ও অনিমা উঠিল, কিন্তু কিশোরের উঠিবার লক্ষণ মোটেই প্রকাশ পাইল না। বড়দি কহিলেন "নবু তুমিও যাও না, সৌম্যদের সঙ্গে একটু ঘুরে আসবে ?"

—"না বড়দি, আমি আপনার কাছে একটু থাকি" বলিয়া সে যে অবস্থায় বসিয়াছিল সেই ভাবেই রহিল।

কিন্তু নবকিশোর যে কতখানি ভুল করিল বেচারী জানিতেও পারিল না।

বাঞ্ছিতকে ঘিরিয়া যে আশা এতদিন অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া, শুভ-দিনের প্রতীক্ষায় কাল কাটাইয়াছে—সে যদি আসিল, এমন হৃদয়-হীনের মত তাহার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করিল কি করিয়া ? মনের কথা যে শুনিতে পায় না, মুখের কথা তাহাকে বলিয়া কি হইবে ? তবুও বড়দি একবার ইঙ্গিত করিতে ছাড়িলেন না—কিন্তু তাহাতেও সে নিষ্ঠুরের হৃদয় গলিল না। যদি না গলিল—অনিমা মরিয়া গেলেও ত' তাহা মুখে কখনও প্রকাশ করিবে না।

অনিমা চলিয়া গেল। যাইবার আগে নবকিশোরের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। কতখানি ব্যথা, কতখানি গ্লানি লইয়া সে অভি-মানিনী আজ চলিয়া গেল, সে কথা শুধু তার অন্তর্য্যামীই জানিল—অপরে তা'র বিন্দুমাত্রও অনুধাবন করিতে পারিল না।

অনিমা গাড়ীতে সৌম্যের সহিত একটি কথাও কহিল না। বাড়ী পৌঁছাইতে আসিলে সে প্রতিবারই সৌম্যকে উপরে আনিয়া, খানিকক্ষণ গল্প না করিয়া ছাড়িয়া দিত না, আজ কিন্তু সে সৌম্যকে ভুলিয়াও ডাকিল না। উদ্‌গত অশ্রু সে কোন গতিকে, প্রবল বেগে দমন করিয়া নিজের শয়ন ঘরে চলিয়া আসিল।

এদিকে বড়দি'র সহিত প্রাণ ভরিয়া গল্প করিয়া, রাত দশটা নাগাদ রাত্রির আহার সারিয়া, নবু যখন বাটী ফিরিয়া আসিল—অনিমা তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্তরকে অনেকখানি শীতল করিয়াছে।

উত্তেজনা কাটিলে অবসাদ আসে। অনিমার সে অবসাদ আসিল। অবরুদ্ধ অভিমানের ব্যথা তাহার অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া, পীড়িত করিয়া তুলিলেও, নিশা অবসানে দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে সে গ্লানির অনেকখানি কাটিয়া গেল। হৃদয়কে তন্ন তন্ন করিয়া আর একবার সে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিল—এমন করিয়া পরের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবনকে দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিবার কারণ ত' কিছু ঘটে নাই। সে যদি ভালবাসিয়া ভুল বা অপরাধ কিছু করিয়া থাকে, তবে সে ভুল বা সে অপরাধের শাস্তি সে ভোগ করিতে রাজী আছে; কিন্তু তাই বলিয়া এমন করিয়া নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া তাহার অন্তরকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে কেন? অনিমা জানে নবকিশোর তাহা অপেক্ষাও দুর্ব্বল। তাহার পক্ষে জোর করিয়া যাহা সহ্য করা সম্ভব—নবকিশোরের পক্ষে তাহাও সম্ভব নয়! তথাপি এইটুকু মূলধন লইয়া সে এই শক্তিমতি নারীকে আঘাত করিতে আসে কোন্ সাহসে? এই আঘাতই যে সে শতগুণে ফিরাইয়া দিবার সামর্থ্য রাখে—নবকিশোরের কাছে তাহাও ত' অজানা নয়। যাহাকে পুতুল গড়িয়া স্বচ্ছন্দে খেলার সাধ মিটানো যায়—ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া

আবার নূতন করিয়া গড়িয়া লওয়া চলে, সে কি সত্যই তাহার স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করিতে পারে ?

অনিমা চিন্তা করিয়া দেখিল, ইহাই ত' জলের মত স্বচ্ছ। কিশোর কথনও ইচ্ছা করিয়া তাহার অভিমানে আঘাত করে নাই—সে শক্তি তাহার নাই। তথাপি সে গত রাত্রিতে একবার দেখা করিতে আসিল না কেন? সঙ্গে না হয় না-ই আসিত, পরেও ত' একবার আসিতে পারিত। বড়দি'কে সে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, হয়ত ভালও বাসে। অনিমাও ত' তাই করে; তথাপি তাঁহার আহ্বান আজ এতবড় নয়—যে অণিমার প্রেমকে তুচ্ছ করিবে। সে ত' মনের অজ্ঞাতসারেই তাহাকে ভালবাসিয়াছে। নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিয়াই তাহাকে পূজা করিয়াছে। অন্তরে যাহাকে দেবতা বলিয়া জানে, মুখেও তাহাকে তাই বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছে। প্রেম যেখানে নদীর জলের মত স্বচ্ছ, সূর্য্যের আলোকের মত সত্য—সেখানে সে লুকোচুরীর অবকাশ মাত্র রাখে না। কিশোর যদি আজ এতদিনেও তাহা না দেখিয়া থাকে, তবে হয় সে অন্ধ, নয় সে ভালবাসার মূল্য দিতে জানে না। কিন্তু এতদিন ধরিয়া যে তাহার আচারে-ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায়, চিঠি-পত্রে সেই প্রেমকেই বরণ করিয়া তাহারই অন্তরালে আত্মসমর্পণ করিয়াছে—সে যে সত্যই এমন মূঢ়, এমন নির্ব্বোধ হইবে, ইহা কি বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়।

অনিমা যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার অন্তর্য্যামী ততই বলিতে লাগিলেন—তুমি ভুল কর নাই অনিমা। যা তুমি দিয়াছ তাহা সোনার মতই খাঁটি, বিবেকের কষ্ঠি-পাথরে কষিয়া তাহার খাদ বাহির করিবে এতবড় জহুরী সে নয়! হৃদয় লইয়া খেলা করা চলে না। দুদিনের আত্মীয়তা দৃষ্টির আড়াল পড়িলেই ভোল বদল করিতে পারে; কিন্তু যাহাকে সে তাহার "আত্মার আত্মীয়" বলিয়া জোর গলায় প্রকাশ করিতে পারে—

তাহার দাবী, শুধু এ পারে নয়, মৃত্যুর পরপারেও তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে !

তথাপি সে এতদিন পর দেখা দিলেও—একবারও কেন কাছে আসিল না ? বেশী কথা সে না হয় না-ই কহিত—একবার নিভৃতে কাছে আসিয়া বসিতেও ত' পারিত। ভাবিতে ভাবিতে বেলা বাড়িতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারি আগমন-প্রতীক্ষায় চোখদুটি চঞ্চল হইয়া আছে—কিন্তু বেলা বাড়িতে চলিল, সে একবারও আসিল না।

ইতিমধ্যে মাধুরী ছুটিয়া আসিয়া জানাইল—"ছোড়দি', আমি আর দাদা, এই মাত্র সৌম্যদার বাড়ী থেকে এলুম—নবুদা বাড়ী থেকে ফিরেছেন কিন্তু তাঁর ভারী জ্বর।"

"জ্বর ?"

"হ্যাঁ ছোড়দি, কথা কইতে পারছেন না। দুটি চোখ দেখলুম জবা ফুলের মত লাল—গা যেন পুড়ে যাচ্ছে এমনি গরম। আমার হাত দুটি একবার জড়িয়ে ধরে বল্লেন—"মাধু, তোমার ছোটদি'কে গিয়ে বলো, আজি যেন আমার নাম কোরে বাড়ীতে সে একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দেয়—আমি নিরাপদে এখানে পৌছেচি।"

—"কাকে কাকে সেখানে দেখলে মাধু—কোন্ ঘরটিতে সে শুয়ে আছে ?"

—"তুমি ত' চিনবে না ছোড়দি, নীচের তলায় নবুদা'র একখানা ঘর আছে, কেবল সৌম্যদা সেখানে বসে তাঁর কপালে জলপটি দিচ্ছেন।"

জ্বরের কথা শুনিয়া অনিমার হৃদয় নিমেষেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে ব্যাকুল হইয়া কহিল—"বড্ড বুঝি অস্থির হ'য়ে পড়েছেন ?"

"হ্যাঁ ছোড়দি। সৌম্যদা' বল্লেন—বোধ হয় ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। আচ্ছা, কত দিন তা' সারতে লাগবে ছোড়দি' ?"

অনিমা—"কী জানি" বলিয়া উদাসভাবে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল। তারপর ধীরভাবে কহিল—"তোকে আর কিছু ব'ল্‌লেন মাধু?"

"ব'ল্‌লেন—মাধু মন দিয়ে পড়াশুনা ক'রো, আমি ভাল হ'য়েই তোমাদের বাড়ী যাবো।"

"তাঁর বড়দি', করুণাদি'কে সেখানে দেখলি না?"

মাধুরী জানাইল—না। সম্ভবতঃ তিনি খবরই পান নাই।

একথা শুনিয়া অনিমা আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিল না। সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল। দেখিল অরুণ তখন হল-ঘরে বসিয়া সেদিনকার খবরের কাগজের পাতা উল্‌টাইতেছে।

অনিমা অরুণকে দেখিয়াই কহিল—"দাদা, আমায় একবার এখুনি করুণাদি'র বাড়ীতে নিয়ে চল না—বড্ড দরকার দাদা, শীগ্‌গির চল—"

অরুণ কহিল—"এখন যে গাড়ী পাওয়া যাবে না অনি, বাবা বেরিয়েছেন।"

অনিমা কহিল—"একখানা ট্যাক্সি, না হয় এইটুকু পথ হেঁটেই যাবো'খন।"

"তবে তাই চল্", বলিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে অনিমাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

আট দশ মিনিটকাল মধ্যেই তাহারা মাষ্টার মহাশয়ের ভবনে পৌছিল। অনিমা ভিতরে ছুটিয়া গিয়া দেখিল—করুণাময়ী তখন ঠাকুর ঘরে পূজার জোগাড় করিতেছেন!

অনিমা করুণাময়ীর সাক্ষাৎ পাইয়াই—"বড়দি" বলিয়া তাহার হাতদুটি জড়াইয়া ধরিল এবং অঝোরে কাঁদিয়া ফেলিল।

কাণ্ড দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"ব্যাপার কি অনু? এমন কাঁদচিস্ কেন বোন্?"

—"ওঁর বড্ড অসুখ বড়দি', দেখবার কেউ নেই, আপনি একবার যান—" কোন গতিকে সে বিগলিত অশ্রুধারা গোপন করিয়া এই কথা কয়টি কহিল।

—"কার অসুখ? নবুর?—সে কি অনি, এই তো কাল সে এখান থেকে দিব্যি খেয়ে-দেয়ে গেল!"

—"হ্যাঁ বড়দি', মাধুকে নিয়ে দাদা দেখা কোরতে গিয়েছিলেন। এই মাত্র শুনলুম জ্বরে নাকি গা পুড়ে যাচ্ছে। ম্যালেরিয়া হওয়াই সম্ভব। দেখবার শোনবার কেউ কাছে নেই।"

—"তা ভয় কি বোন, ম্যালেরিয়া হয়, দু'দিনেই সেরে যাবে। আমি এখনই তোমার মাষ্টার মশায়কে নিয়ে সেখানে যাচ্ছি, তুইও সঙ্গে চ' অনি?"

যাইবার কথায় অনিমার বুকের ভিতর আবার কেমন করিয়া উঠিল। কহিল, "না বড়দি', আমি সেখানে যাবোনা, আপনি শুধু দেখে আসুন, সে কেমন আছে। আপনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি এখানেই অপেক্ষা করবো।"

অগত্যা সেই অত বেলায় স্বামীকে লইয়া করুণাময়ীকেই একাকী বাহির হইতে হইল। যাইবার পূর্ব্বে লালমোহনকে তিনি অনিমার হেফাজতে রাখিয়া গেলেন।

অনিমা সেই পূজার ঘরের অঙ্গনে লালুকে কোলে করিয়া বসিয়া, করুণাময়ীর গৃহ-বিগ্রহ মদনমোহনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, ঠাকুর সেখানে রূপার সিংহাসন আলো করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

অনিমা ইচ্ছা করিলেই বড়দি'র সাথে যাইতে পারিত। গেলে হয় ত' সে স্বচক্ষেই কিশোরকে দেখিতে পাইত—হয় ত' দুদণ্ড তাহার রোগ-

শয্যার পার্শ্বে বসিতে পারিত এবং খানিকটা সেবা করিয়াও অন্তরকে শীতল করিতে পারিত। কিন্তু সেখানে সে কিসের জোরে যাইবে? বাড়ীতে একজন আত্মীয়কে দেখিতে আর একজন আত্মীয় হয় ত' যাইতে পারে? কিন্তু গৃহকর্ত্তার বিনা আহ্বানে—সে নারী হইয়া তাহারই আর একটি অনাত্মীয় যুবককে দেখিতে যাইবে কোন সুবাদে? আর বাড়ীর লোকেরাই বা ভাবিবে কি! তাহার অন্তরে যে ব্যাকুলতা, সে ত' সর্ব্বসাধারণের প্রকাশ করিবার জন্য নয়। বড়দি' সব জানেন বলিয়া তাঁহাকে গোপন করা চলে না। অনিমা নিজের অক্ষমতায় অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিল—অথচ এত নিকটে থাকিলেও সে সাহস করিয়া আজ কিশোরের শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া আসিতে পারিল না—এই চিন্তাই আজ তাহাকে বেশী করিয়া পীড়িত করিতে লাগিল।

বড়দি' যখন ফিরিলেন, তখন বেলা অনেকখানি। অনিমা এতক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছিল। বড়দি' আসিয়া যাহা জানাইলেন, তাহা অন্তরের উৎকণ্ঠা কমাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। নূতন জ্বরে প্রথমটা নাকি গায়ের উত্তাপ খুব বৃদ্ধি পায়। তাহার উপর ডাক্তারও নাকি সন্দেহ করিয়াছে—একটু ইনফ্লুয়েঞ্জার ছোঁয়াচ লাগিয়া থাকিতে পারে।

করুণাময়ী কহিলেন—"অনু, বিকেল বেলা আবার আমি যাব বোন—তুমিও সঙ্গে এসো, তাতে কিছু দোষ্ হবে না।"

"কিন্তু আমি কি সত্যিই সেখানে যেতে পারি বড়দি'? আচ্ছা, আমি গেলে সবাই কী ভাব্‌বেন?"

"কিছু ভাববে না অনু, বিকেলবেলা আমি তোমায় তুলে নিয়ে যাব।"

চিন্তাক্লিষ্ট অন্তর লইয়া বিরস বদনে অনিমা বাড়ী ফিরিল। স্নান-

আহারের প্রবৃত্তি তার বিন্দুমাত্র ছিল না; তথাপি মনের অনিচ্ছাতেও তাহাকে খানিকটা আহার করিতে হইল।

সারা দুপুর দুশ্চিন্তায় কাটিলে বিকাল নাগাদ আবার বড়দি' আসিয়া পড়িলেন। তাহার পর অনিমাকে সঙ্গে করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে যখন তিনি পিত্রালয়ে নবকিশোরকে দেখিতে তাহার রোগশয্যার পাশে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সারা দিবস অব্যক্ত যন্ত্রণা-ভোগের পর নবকিশোরের একটুখানি তন্দ্রা আসিয়াছে।

তাহার উত্তপ্ত কপালে বড়দির হাতখানি আসিয়া ঠেকিতেই তন্দ্রাজড়িত চোখে কিশোর একবার তাকাইল। তাহার পর পাশে অনিমাকে দেখিয়া ঠিক যেন ঘুমের ঘোরে কথা কহিল—যেন এখনও তাহার ঝোঁক কাটে নাই—এমনিভাবে কহিল, "চিনতে পেরেচি, তুমি এসেছ অনিমা।" তাহার পর রক্তবর্ণ চোখে বড়দির দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টি পড়িতেই তাহার নিদ্রালু নয়নের স্বাভাবিক চেতনা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। সে কহিল—"একবার কাছে এসে বসুননা বড়দি। মনে হ'চ্চে অনেক দিন যেন ও পায়ের ধূলা মাথায় নিতে পাইনি। পা দুটি একবার তুলুন না দিদি!"

অনিমা ও বড়দি' তাহার কপালের উত্তাপ অনুভব করিল। সৌম্য কাছেই বসিয়া নবকিশোরের সেবা করিতেছিল। সে কহিল—"ভয়ের কারণ বিশেষ কিছুই নেই, ডাক্তারবাবু বোলেছেন—তিন চার দিন জ্বর থাকবে।" বলিয়া টেম্পারেচার লেখা খাতাখানি তাহাদের সামনে তুলিয়া ধরিল। দু'জনে তখন নিবিষ্ট মনে তাহাই দেখিতে লাগিল।

"তোর নবুদা'র কাছে আজ রাতে কে থাক্‌বে সৌম্য?"

সৌম্য কহিল—"বেশী লোক থাকার দরকার হবে না বড়দি। আমি আজ এ ঘরেই শোব'খন।"

"তুই একা পারবি না সৌম্য—আমি তোর মাষ্টার মশাইকে পাঠিয়ে

দোব'খন।" তার পর নবুর দিকে ফিরিয়া তাহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন—"এখন কি বড্ড কষ্ট হ'চ্চে, নবু?"

"না বড়দি, এখন আর বিশেষ কষ্ট নেই।"

অনিমা কাছে বসিয়া সব শুনিতেছিল। হঠাৎ দেখিল, কিশোরের রোগতপ্ত একখানি হাত আসিয়া তার হাতখানির উপর পড়িল। লেপের তলায় তাহাই আশ্রয় করিয়া অনিমা বসিয়া রহিল। মনে হইল যেন সে হাতের উত্তাপ তাহার অন্তরের বেদনাকে আরও খানিকটা উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। সৌম্য শুধু আজ এখানে থাকিবে, হয় তো মাষ্টার মহাশয়ও আসিবেন—তথাপি সেবায় অনভিজ্ঞ এই দুইটি পুরুষের তত্ত্বাবধানে নবকিশোরকে ছাড়িয়া খানিকক্ষণ পরেই অনিমাকে বিদায় লইতে হইবে। সারা রাত ইহার কেমন করিয়া কাটিবে, কে জানে! রাত্রে জ্বর যদি বৃদ্ধি পায়, যন্ত্রণা বাড়ে, ইহারা কেমন করিয়া তাহার প্রতিকার করিবে! বড়দি' ত' ইচ্ছা করিলেই দুটি রাত এখানে থাকিতে পারেন! কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় থাকিতে না চাহিলে অনিমা কোন্ লজ্জায় সে প্রস্তাব তাঁহার নিকট করিবে?

হঠাৎ কি ভাবিয়া নবকিশোর অনিমাকে কহিল—"খুড়ীমাকে আজ একখানা চিঠি লিখেছ? মাধু আজ সকালে তোমায় বলেচে অণু?"

অনিমা মাথা নাড়িয়া সে কথার জবাব দিল।

"আমার অসুখের কথা কিছু লিখ না যেন। খুড়ীমার শরীর বড় খারাপ দেখে এসেচি। এখান থেকে তাঁকে ঔষধ পাঠাবার কথা—কিন্তু আমি না সেরে উঠলে কে সে কাজ কোরবে?"

বড়দি প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন—"তাঁর যা' করা দরকার আমি কোরবো নবু, তুমি এখন সে-সব কথা কিছু ভেবো না, ভাই। কেবল তাড়াতাড়ি ভাল হোয়ে ওঠ।"

ইতিমধ্যে করুণার জননী আসিয়া পড়িলেন। নবু কেমন আছে সন্ধান লইয়া তিনি সৌম্যকে খানিকটা বার্লি আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। মুখে বলিলেন—"অনেকক্ষণ পথ্য পড়ে নাই। এখন কিছু আহার দরকার।"

কিন্তু সৌম্য উঠিবার পূর্ব্বেই করুণাময়ী উঠিয়া পড়িলেন এবং "আমিই বার্লি আনছি", বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। চ্যাটার্জ্জী গৃহিণীও করুণার পিছনে পিছনে যাইতে যাইতে অনিমাকে বলিয়া গেলেন—বাড়ী ফিরিবার আগে একবার যেন সে দেখা করিয়া যায়।

ইহারা চলিয়া গেলে, অনিমার যেন অনেকটা সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। নবকিশোর তাহার শীতল হাতখানির উপর একটু জোর করিয়া টান দিতেই তাহা তখনই তাহার উত্তপ্ত গণ্ডখানির উপর পড়িয়া যেন সুধার প্রলেপ দিতে সুরু করিল।

"আর একটু কাছে এসে বোসনা অণু—ভাল কোরে দুটো কথা বল না শুনি। সেই ত' কাল থেকেই মুখ বুজে রয়েচ"—ইত্যাদি অনিমার উদ্দেশ্যে সে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। আর রুদ্ধ নিশ্বাসে অনিমা তাহার আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া গোড়ার আদেশটি পালন করিলেও, বলিবার মত কথা খুঁজিয়া পাইল না শুধু আর্ত্ত অন্তর লইয়া সেই ব্যথাতুরের বেদনা লাঘব করিতে সে নিপুণহস্তে তাহার কপালে, তাহার গণ্ডে, তাহার সারা মুখে সেই পদ্ম-হস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

"আজ সমস্ত দিন আমার কেমন কোরে কেটেচে জান অনিমা—ও কি অমনি চোখে জল এল, আচ্ছা পাগল ত'? আমার কি হ'য়েচে অণু? ভয় কি, এ জ্বর দু'দিনেই সেরে যাবে"—বলিয়া রোগ-পাণ্ডুর মুখে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

কিন্তু এত বেদনা সহিয়াও অনিমা কিছুতে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল

না—তোমার আজ সারা দিন কেমন করিয়া কাটিয়াছে, তাহা অপরে না জানিলেও কি এখনও পর্য্যন্ত এ হতভাগিনীর অজানা আছে! তোমার অসুখের কথা শুনিবামাত্র তোমার অনিমা এ রোগশয্যার পার্শ্বে তখনই ছুটিয়া আসিত। কিন্তু তোমাদের যে নিষ্ঠুর সমাজ আমার দেহকে কাছে আসিতে না দিলেও—আমার অন্তরকে ত' সারাক্ষণ তোমারই পাশে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

ওগো, সারাদিন তোমার বড় ব্যথায় কাটিয়াছে জানি, কিন্তু আমিও কি খুব শান্তিতে ছিলাম! আজ তোমাদের এ বিধিনিষেধ অবহেলা করিবার মত যদি স্পর্দ্ধা আমার থাকিত—তবে সে অনুশাসন কদাচ মানিতাম না। আত্মাকে আঘাত করিয়াও যে মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে হয়, এ কথা কি জানিতাম? হৃদয় শতধা হইয়া গেলেও তাহারই নিষেধ মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। তোমাদের এ মনুর সমাজে মনের স্থান নাই, তাই অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষ শুধু ভালবাসার দাবীতে, অবলীলায় মেলা-মেশার অবসর পায় না।

অনিমা এই সব ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে করুণাময়ী দুধ-বার্লি গরম করিয়া গেলাস হস্তে সে ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বাটীটি অনিমার দিকে আগাইয়া দিয়া নবুকে খাওয়াইয়া দিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

আদেশ শুনিয়া অনিমার বুকটি ঈষৎ কাঁপিল। বুঝিবা ক্ষণেক ইতস্ততঃও করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রবল শক্তি সঞ্চয় করিয়া মনের সমস্ত দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া, দৃঢ় হস্তে পথ্যের পাত্র ধরিয়া, নিজ বস্ত্রাঞ্চলে তাহা মুছিয়া লইয়া, এক হাত নবকিশোরের গলায় উঁচু করিয়া অতি নিপুণা শুশ্রূষাকারিণীর মত সবটুকু নবকিশোরকে খাওয়াইয়া দিল। নবকিশোর তাহা নিঃশেষে পান করিয়া বুঝিবা নিমেষের জন্য পরম তৃপ্তিতে চোখ দু'টি বন্ধ করিল।

ডাক্তারের কথা মিথ্যা হইল না। নবকিশোর কয়েকদিন ধরিয়া ভুগিয়া ভুগিয়া ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিল। অনিমা এ কয়দিন মাঝে মাঝে করুণাময়ীর সঙ্গে গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে। সে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহা ঘটে নাই। সৌম্য এতদিন ধরিয়া যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত, প্রায় দিনরাত রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া কায়মনপ্রাণে তাহার সেবা করিয়াছে—বোধ করি নিজের সহোদর ভাই হইলেও তাহার বেশী কিছু করিতে পারিত না।

কিন্তু নবকিশোর সারিয়া উঠিলেও কৃষ্ণপ্রেয়সীর রোগমুক্ত হইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। সেই পুরাতন জ্বর ও মাঝে মাঝে কলিক্ ব্যথা তাঁহার দেহকে জীর্ণ করিয়া ফেলিল। নবকিশোরের গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার সময় তাঁহার সাময়িক ভাবে জ্বর ছাড়িলেও—সেই পূর্ব্ব প্রথামত তিথিতে তিথিতে পালা করিয়া জ্বর আসিতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রেয়সীর ভুগিয়া ভুগিয়া রোগের প্রতি বিরক্তি ধরিয়া গেল। প্রথম প্রথম জ্বর হইলে তিনি অল্প বিস্তর চিকিৎসা করাইতেন, ঔষধও খাইতেন। হালে তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। আজকাল জ্বরের উপরেই তিনি ভাত খান, জ্বরের উপরেই সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম করেন।

মাঝে, অনিমার লেখা, কিশোরের জবানি এক পত্র পাইলেও, সে যে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে একথা তিনি জানিতে পারিলেন না। অনিমাও ঠিক কিশোরের লেখার ছাঁদে অক্ষরগুলি এমন নিপুণভাবে সাজাইয়া সাজাইয়া লিখিত যে কৃষ্ণপ্রেয়সীর সতর্ক চক্ষুও সে জাল ধরিতে পারিত না। ফলে দুই দিক হইতেই অসুখের কথা গোপন রহিয়া গেল।

নবকিশোর সুস্থ হইলেও শরীরে তাহার তখনও স্বাভাবিক বল আসে নাই। তথাপি একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সে অনিমাদের বাটীতে আসিয়া

উপস্থিত হইল। আসিয়াই দেখিল সম্মুখের পরিচিত হল-ঘরটির এক কোণে বসিয়া পরম নিবিষ্ট মনে মাধুরী পড়াশুনা করিতেছে। মাষ্টার মহাশয়ের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি এতদিন পর সুস্থ হইয়া আবার পড়াইতে আসিয়াছেন জানিয়া মাধুরী বিশেষ প্রীতিলাভ করিল। নবকিশোরও সেখানে আসিয়া খুটাইয়া খুটাইয়া মাধুরীকে তাহার পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং যত্নসহকারে তাহার নূতন পাঠ্য পুস্তকগুলি দেখিতে লাগিল। তাহার পর স্কুলের পাঠ সম্বন্ধে খানিকক্ষণ মাধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহার হোম-এক্‌সারসাইজ্‌গুলি দেখিয়া দিল।

এদিকে অনিমার পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী। সকাল বেলায় নিশ্চয়ই তাহার পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকিবার কথা। বিশেষ তাহার অসুখের মধ্যে দেখা-শোনা ও খোঁজ-খবর করিতে অনিমার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হইয়াছে। তাই মনে বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও সে তখনকার জন্য অনিমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিল। ভাবিল বিকাল বেলা একবার আসিবার চেষ্টা করিবে।

অনিমা সেদিন সকাল বেলায় সত্যই তাহার উপরের শয়ন গৃহে খাটে বসিয়া নিবিষ্ট মনে পড়াশুনায় ব্যস্ত ছিল। সঙ্গে ছিল তাহারই আর এক সহপাঠিনী। সে এই কয়দিন ধরিয়া প্রায় নিয়তই অনিমার সহিত একত্রে অঙ্ক কষিতে আসিত। মেয়েটির নাম বিজলী।

কিশোর রোগমুক্ত হইয়াছে জানিলেও সে যে বাহির হইবার মত ইতিমধ্যেই এতখানি শারীরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে তাহা জানিত না। তাই তাহার এ বাটীতে আসিবার কথাও অনিমার নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গেল। ফটক হইতে বাহির হইবার সময় তাহার সেই চিরপরিচিত শুভ্র উত্তরীয়ের অঞ্চল-ভাগ হঠাৎ অনিমার দৃষ্টি পথে পড়িল। নিমেষে

অনিমার চোখ দুটি যেন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার খাতার একখানি পাতা ছিঁড়িয়া, তাহাই মুহূর্ত্তে নুটি পাকাইয়া কিশোরের উদ্দেশ্যে উপর হইতে নিক্ষেপ করিল এবং সৌভাগ্য বশতঃ তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া তাহারই মাথার উপর আসিয়া পড়িল। পাকানো নুটিটি হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া আঘাতকারিণীর উদ্দেশ্যে চোখ মেলিয়া চাহিতেই সম্মুখে বারান্দায় তাকাইয়া দেখিল—অনিমার ফুল্লকুসুমের মত সুন্দর মুখখানি কৌতুকের হাসিতে ভাসিয়া উঠিয়াছে। নবকিশোরের কাছে এ যে কত বড় আহ্বান—তাহা সে ভাল ভাবেই জানিত। তাই গৃহগামী চরণ দু'খানিকে আবার বিপরীত দিকে ফিরাইয়া অনিমার কক্ষের উদ্দেশে সরাসর উপরে উঠিয়া আসিল এবং পর্দ্দা ঠেলিয়া তাহার ঘরে ঢুকিতে গিয়া আর একটি অপরিচিতার সহিত চোখাচোখি হইতেই সে হতবিহ্বল হইয়া বাহিরেই দাঁড়াইয়া পড়িল। কোন গতিকে অনিমার উদ্দেশে কহিল—"আমি কি ভিতরে আসতে পারি?" অনিমা ভিতর হইতে কৃত্রিম রাগের সুরে "না" বলিয়াই, তন্মুহূর্ত্তে হালকা হাসিতে ঘরখানি ভরাইয়া তুলিল। বিজলী এতক্ষণ বিশেষ কৌতুক বোধ করিতেছিল। অনিমা যে ইচ্ছা করিয়াই এই যুবকটির প্রতি অকারণে শাস্তি বিধান সুরু করিয়াছে বোধ করি সে তাহা অনুভব করিয়া, গৃহকর্ত্রীর অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া কহিয়া উঠিল,—"আসুন না, ভেতরে আসুন।"

কিশোর ভিতরে আসিয়া বিজলীর উদ্দেশে দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া সামনের একখানি খালি বেত্রাসনে বসিয়া পড়িল।

"তারপর অসুখ সারতে না সারতেই যে বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু হ'য়েচে দেখতে পাই—" অনিমা শ্লেষের ভঙ্গীতে এই কথা কয়টি কহিল।

মৃদু হাসিয়া কিশোর কহিল—"কী বাড়াবাড়ি দেখলে!"

অনিমা আবার বিদ্রূপের স্বরে কহিল—"কিছু নাঃ। দিব্বি যে কাউকে কিছু না বোলে যাওয়া হ'চ্ছিল? পড়াতে আসতেই বা তোমাকে কে ব'ল্‌লে?"

নবকিশোর প্রত্যুত্তরে জানাইল, সে এখন অনেক সুস্থ, তাই ইচ্ছা করিয়াই পড়াইতে আসিয়াছে।

"তবে ইচ্ছা কোরে একবার দেখা কোরে যাওয়া হোল না কেন? আজকাল এত সুবুদ্ধি উদয় হবার কারণ কী?"

বিজলী আর কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। সে কথার মাঝেই এক সুযোগে অনিমার কানে কানে কহিল—"কে ভাই ইনি?"

অনিমা জোরে জোরে তাহার জবাব দিল—"শুনতে পাই আমাদের মাধু দিদির মাষ্টার—কিন্তু এ মাষ্টারী বজায় রইলে বাঁচি।"

ইতিমধ্যে মাধুরী সেখানে আসিয়া মাষ্টার মহাশয়কে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আবার সেখানে আবিষ্কার করিয়া, তাহার কোলে উঠিয়া গলাটি এক হাতে জড়াইয়া বসিয়া রহিল।

নবকিশোর তখন চোখে-মুখে কৌতুক ছিটাইয়া অনিমার কথার জবাব দিল—"মনিব সদয় থাকলে চাকুরী যাবার ভয় নাই।"

অনিমা কহিল—"এবার থেকে সেই রকমই ব্যবস্থা ক'রচি। এখন কোথায় যাওয়া হ'চ্চে শুনি, বড়দি'র বাড়ীতে?"

একজন অপরিচিতার সম্মুখে এই প্রকার নানা জাতীয় প্রশ্নবাণে নবকিশোর জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। এবার সে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল—

"তারও তোমায় জবাব দিতে হবে নাকি?"

অনিমা তাহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া ভাবিল—সেই মানুষ এমনি করিয়া কথা কহিতে জানে? সে এবার সত্য সত্যই রাগ

করিয়া কহিল—"আমার জবাব শোনবার কী দরকার ? আমি যে নিতান্ত বেহায়া, নইলে আজ তোমায় এখানে ডাকতুম না।"

নবকিশোর মনে মনে বুঝিল, না জানিয়া হঠাৎ বোধ করি তার কোন গোপন স্থানে আঘাত করিয়া ফেলিয়াছে। তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকিলেও সে এবার ব্যথিত হইয়া কহিল—"তোমার কথায় বড় দুঃখ পেলাম অনিমা! আমি কোথায় যাই না-যাই, তাও কি তোমার অজানা ?"

বিজলী আবার কানে কানে কহিল—"লোকটিকে খুব ভাল কোরে বেঁধেছিস বুঝি ?"

অনিমা জোরে জোরে তার জবাব দিল—"না ভাই, এ তেমন মানুষ নয়, এদের একটু আলগা দিলে মাথায় উঠে বসে—"

"খবর্দার তবে আলগা দিস নি"—এবার জোর করিয়া এই কথা কয়টি কোন মতে উচ্চারণ করিয়া বিজলী উঠিয়া পড়িল এবং সকলের উদ্দেশে কহিল—"এবার তবে যাই, আবার একদিন এসে গল্প করবো'খন" —বলিয়া সে নবকিশোরকে যুক্ত ক'রে নমস্কার জানাইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

বিজলী উঠিতে মাধুরীও নাচিতে নাচিতে তাহার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার পরে সেই ঘরে আর যে দুটি প্রাণী অবশিষ্ট রহিল—এ উহার মুখের দিকে অনিমেষ লোচনে তাকাইয়া রহিল। অনেকক্ষণ কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিল, অনিমাই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। কহিল—"তারপর এবার বাড়ী থেকে ফেরবার পর থেকেই দেখতে পাচ্চি লুকোচুরী চ'লচে ?"

কিশোর কহিল—"কিন্তু আমি যে অসুখ কোরে ফেললুম অনি, সেও কি আমার দোষ ?"

অনিমা রাগ করিয়া কহিল—"তুমি আজকাল দোষ-গুণের বাইরে চ'লে গিয়েছ বোলে মনে কর, কিন্তু সবাই তা' করে না।"

"তবে আমায় তুমি কি কোরতে বল ?"

অনিমা কহিল—"বড়দি'র বাড়ীতে তুমি একটু কম কম গেলেও দোষের হবে না! অসুখ ক'রলে, কিন্তু সেই অসুখের শাস্তি দিতে, নিত্য আমায় এমন কোরে বিঁধছ কেন ?" বোধ করি, শেষের কথাগুলি বলিতে তাহার গলার স্বর একটু কাঁপিয়া উঠিল—কিন্তু নবকিশোর যে কী অপরাধ করিল, তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিল না। কেবল বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিল।

"আচ্ছা ভগবান কি তোমায় এক ফোঁটাও বুদ্ধি দেন নি। না হয় অসুখ কোরে এ ক'দিন আসতে পার নি; কিন্তু এ বাড়ীতে ঢুকে, কাউকে কিছু না জানিয়ে কোন্ মুখে বেরিয়ে যাচ্ছিলে শুনি ?"

নবকিশোর কহিল—"আমি সত্যি ব'লচি অনিমা, তোমার পড়ার বিঘ্ন হবে বোলেই আসি নি!"

অনিমা তাহার জবাবে কহিল—"এতটা অনুগ্রহ এখন থেকে আর করো না। জেনো সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে। এত বেলায় আবার বড়দি'র বাড়ী যাওয়া হ'চ্ছিল কেন শুনি ? অসুখ বুঝি আর একবার না বাধিয়ে তুললে চ'লচে না ?"

নবকিশোর ম্লানমুখে কহিল—"কিন্তু সেখানেও ত' একবার যাওয়া দরকার ?"

"হোক দরকার, আমি যতক্ষণ না ব'লব, ততক্ষণ তুমি সেখানে যাবে না।"

"তাহ'লে এখন বাড়ী যাই ?"

"না।"

"তা' হ'লে আজ আমি কিছু খাবোও না?"

অনিমা রাগ করিয়া কহিল, "না। তোমার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে আমার কি কোন জ্ঞানই নেই!"—বলিয়া সে ছুটিয়া কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল। নবকিশোর চেয়ারখানি ছাড়িয়া যেন মনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই অনিমার খাটের একটি কোণ আশ্রয় করিয়া কোন গতিকে পা মেলিয়া বসিল।

অনিমা খানিক পরে যখন ফিরিল, তখন তাহার হাতে একবাটি গরম দুধ। ইঙ্গিত করিবামাত্র সুবোধ বালকটির মত নবকিশোরকে তাহা নিঃশেষে পান করিতে হইল।

"নাঃ আজ ভাত-টাত কিছু খাব না, কোথায় যাবও না; এখানেই শুয়ে থাকবো।" বলিয়া সে সত্যই অনিমার মাথার বালিশটি টানিয়া ভাল করিয়া বিশ্রাম করিবার ব্যবস্থা করিল।

রকম দেখিয়া অনিমা সকৌতুকে কহিল—"তুমি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছ না কি?"

নবকিশোর উদাসভাবে কহিল—"এর পরেও তোমায় ভয় দেখাতে পারে, এমন মানুষ কেউ আছে নাকি অনিমা?"

অনিমা আর একবার বাহিরে যাইতে যাইতে জবাব দিল—"সত্যিকারের মানুষ যারা হয়, তারা পারে না। কিন্তু মানুষ ছাড়া তো প্রাণীর অভাব নেই—" বলিয়া নীরব হাসিতে অধর কাটিয়া কহিল—"শান্ত শিষ্ট ছেলেটির মত এখানে শুয়ে থাক, আমি স্নান কোরে আসি।"

তারপর অনিমা যখন স্নান করিয়া প্রসাধন অন্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিল, তখন সে দেখিল, কিশোর সত্যই তাহারই শয্যার ভাল করিয়া হাত-পা ছড়াইয়া দিব্য নাক ডাকাইয়া পরম তৃপ্তিতে নিদ্রা দিতেছে। অনিমা আর তাহাকে বিরক্ত করিল না। রন্ধনশালায় গিয়া তাহারই

মধ্যাহ্ন আহারের উদ্যোগ সুরু করিল। স্বহস্তে পরিপাটি করিয়া খানিকটা পুরাতন চাউলের ভাত ও মাছের তরকারী রাঁধিয়া নিজের ঘরে আনিয়া একটি টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিল। তাহার পর পাশের এক প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে একখানা কুশাসন ও গঙ্গাজল সমেত এক জোড়া কোশাকুশি ধার করিয়া আনিল। দাদার একখানি পরিষ্কার ধোয়া কাপড় আনলায় রাখিয়া নিজের দেরাজ হইতে একখানি পাটভাঙ্গা তোয়ালে বাহির করিল। পরে ঘরের এক কোণে আসনটি বিছাইয়া গঙ্গাজলের কোশাকুশি রাখিয়া, খাটের নিকট আসিয়া বসিল।

তাহার পর কিশোর যখন চক্ষু মেলিল—দেখিল, ঘরে যেন ভোজবাজী সুরু হইয়াছে। নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিবার সমস্ত উপকরণই প্রস্তুত। মায় সাফ্ কাপড়খানি পর্য্যন্ত।

“এসব কী অনিমা—অনেকক্ষণ বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ?”

অনিমা কহিল—“এবার তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে আহ্নিক সেরে নাও, তোমার খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে।”

নবকিশোর একবার বোধ করি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাহার দিকে চাহিল, কিন্তু আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে তাহার সাহস করিল না। সে শিশুটির মত তাহারই নির্দ্দেশে হাত মুখ ধুইয়া ও কাপড় ছাড়িয়া, আহ্নিক করিতে বসিল। কিন্তু চোখ বুজিয়া আজ সে কোন রকমে সেখানে তাহার ইষ্টদেবতার সন্ধান পাইল না। শুধু এই অসম সাহসিনী নারীর জ্যোতিষ্মান চক্ষু দুটি কেবলই যেন মনের সামনে নাচিতে লাগিল !

তাহার পর আহারে বসিলে কুন্দ-শুভ্র অন্ন ও আহারীয়ের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই যেন তাহার চোখ দুটি জুড়াইয়া গেল ! আজ তাহা হইলে সত্যই তাহার অনিমা প্রতারণা করে নাই। নবকিশোর আজ পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে খুটিয়া খুটিয়া তাহারই শেষ কণাটি পর্য্যন্ত আহার করিল।

পরে কহিল—"তোমরা কখন খাবে অনু ?

"আমার আজ খাবার তাড়া নেই। বাবা আর দাদা অনেকক্ষণ বেরিয়েছেন। তাঁদের ফিরতে দেরী হবে!"

"তবে তুমি এখন আমার কথা শুনবে, আমার সামনে ব'সে খাবে ?"

"তারপর ?"

"তারপর আমার কাছে এসে একটু ব'সবে ?

"তারপর ?"

"তারপর আমি যা বোলবো তাতে তুমি রাগ কোরবে ?"

"আমি কক্ষনো রাগ কোরবো না, তুমি একটিবার মাত্র মুখ ফুটে বল।"

"তারপর কী হবে আমি বলতে পারিনে অনিমা। আমি মনে মনে বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়চি। হয়ত' তোমায় কাছে পেয়ে অসম্মান কোরে বসবো!"

অনিমা আজ কী শুনিল ? তাহার অন্তর্য্যামী যেন তদ্দণ্ডেই কহিয়া উঠিল—কবে তুমি তোমার ওই মান-অপমানের ভার সরিয়ে নেবে গো ? মান-অপমান তোমার ওই ঝুটা সমাজের জন্য, মান-অপমান আর পাঁচজনের কাছে। অসম্মান বোলে যাকে তুমি আজ ঠেকিয়ে রাখতে চাও, সে যে আমার কাছে কত বড় সম্মান—একবার যদি জানতে !

অনিমাকে নিরুত্তর দেখিয়া নবকিশোর ভাবিল—হয় ত' সে তাহাকে আঘাত করিয়াছে তাই সে ব্যথিত হইয়া কহিল—"রাগ কোরলে অনি ? আচ্ছা সত্যিই কি আমি ভুলেও তোমার অসম্মান কোরতে পারি ! আমি যে তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসি অনিমা ?"

অনিমা দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল—"না তুমি ভালবাস না। যারা ভালবাসে তারা অপমানের কথা মুখে আনে না। মান-অপমানের ভয় দেখিয়ে তারা ভালবাসাকে অপমানই করে—শ্রদ্ধা ক'রতে জানে না। এমন ভালবাসায় আমার দরকার নেই।"

"কিন্তু আমার যে প্রতিপদে বাধা—আমি যে কিছুই বুঝতে পারিনে অণু ?"

"তবে সেই বাধা নিয়েই তুমিই আজন্ম থেকো। বুঝতে পেরেও যে অন্ধ, তাকে বোঝাবার মত শক্তি আমার নেই—কিন্তু আর আমার ব'লবারও ক্ষমতা নেই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর আমায় নির্য্যাতন কোরো না—এবার বাড়ী যাও—" কোন গতিকে এই কথা কয়টি কহিয়া সে ঝড়ের মত কক্ষ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। নির্ব্বাক নিস্পন্দ কিশোর ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিল।

বাড়ী ফিরিয়া কিশোর আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। দেহের দিক দিয়া তখনও সে যথেষ্ট দুর্ব্বল ছিল—আজ সে দৌর্ব্বল্য তাহার মনকেও ভাঙিয়া ফেলিল। অনিমা যে কী চায় তাহা সে জোর করিয়া বলিবে না, কিশোরও তাহা অনুমান করিয়া তাহাকে তৃপ্ত করিতে ভরসা পায় না। জলস্রোতে দুইটি বিপরীতগামী তরণী একই গন্তব্য পথে যাত্রা সুরু করিলে যে বিরোধ উপস্থিত হয়—এই দুইটি নরনারীর অন্তর্জগতে যেন সেই বিরোধেরই সূত্রপাত হইয়াছে। কী যেন এক সংশয়ের বিষে তাহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। কোথায় যে তাহার মীমাংসা খুঁজিয়া পায় না। নবকিশোর প্রাণপণে বিবেকের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে অবশেষে অনিমার নিকট মরিয়া হইয়া এই পত্র লিখিয়া ফেলিল। পত্রখানি এইরূপ :—

"অণু, জানিতাম না এতদিন তুমি আমায় উপহাস করিয়া আসিয়াছ। নতুবা হাজার অপরাধ করিলে আমাকে এমন করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারিতে না। আজ যে ভালবাসাকে তুমি বিদ্রূপ করিলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাহারই স্বরূপ তুমি একদিন দেখিতে পাও। তোমার কিশোর আজ সব দিক দিয়া নিঃস্ব হইলেও—তাহার একটুখানি হৃদয়

আজও অবশিষ্ট আছে এবং শতবার তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও—সে শুধু তোমাকেই জানে, তোমাকেই চিন্তা করিয়া সুখী হয়, তোমাকেই ভালবাসিয়া তৃপ্তি পায়। তুমি আমাকে যদি বেদনা দিয়া সুখ পাও, আমি তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখী নই।

তোমাকে ভালবাসিবার যোগ্যতা হয় ত আমার ছিল না; কিন্তু ভালবাসিয়াছি। তুমি আমায় তাহার বিনিময়ে কিছু না দিলেও আমি বিন্দু মাত্র দুঃখী নই—কিন্তু আমার প্রেমকে অপমান করিও না। আজ এইটুকু বিশ্বাস আমার উপর রাখিও, মাত্র এই আমার মিনতি। ইতি, তোমার অযোগ্য কিশোর।”

নবকিশোর চিঠিখানা লিখিয়া সৌম্যকে দিল। কহিল, যদি সময় পাও এখানা তোমার অনিমাদি’কে দিও।

কলেজ হইতে ফিরিয়া সৌম্য সে চিঠিখানা অবিকৃত অবস্থায় নবকিশোরকে ফেরত দিল। কহিল “তোমার কি মাথা খারাপ হ’য়েছে নবুদা, এচিঠি আমি অনিমাদিকে দেব?”

“এখানাও তুমি পড়েছ? চিঠি না হয় নাই দিতে, কিন্তু এখানা পড়বার অধিকার ত’ আমি তোমায় দিই নি?”

সৌম্য কহিল “তোমার অদৃষ্ট ভাল নবু দা’ যে চিঠিখানা আমি পড়ে অনিমাদি’কে দিই নি। যদি না রাগ কর তবে আমার একটি কথা চিরকাল মনে রেখো—অনিমাদি’কে তুমি চিনতে পার নি। তুমি তার ভালবাসার যোগ্য নও।”

বিহ্বলভাবে কিশোর কহিল—“তাই ঠিক সৌম্য এবং সেই কথাই ত’ আমি তাকে জানাতে চেয়েছি।”

“কিন্তু সে তো তোমায় অযোগ্য মনে করে না। তুমি জান না কী চিঠি তোমায় সে লিখেছিল! নবু দা’ তুমি এত বোকা যে এমন মেয়েকেও

তার ভালবাসার মূল্য দিতে জানলে না। আজ সে ভালবাসার এক কণাও যদি আমি পেতুম—কী কোরতুম জানো?—আজীবন তার বুকের মালা হ'য়ে থাকতুম।"

"তবে এ বাঁদরের গলায় সেটা পরাবার চেষ্টা করিস্‌নি সৌম্য—তুই আজ থেকে সে অধিকার ভোগ কর্।"

কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তে সৌম্য চটিয়া উঠিল। সে হঠাৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া নির্ম্মম কণ্ঠে কহিল "ভুল কোরে তোমায় দাদা বোলেছিলুম। সে ভুলের আজ প্রায়শ্চিত্ত কোরবো। তুমি আর কোনদিন আমায় কাছে ডেকো না। তোমায় আমায় সম্বন্ধ আজ এখানেই শেষ হোক"—বলিয়া সে ঝড়ের বেগে প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। নবকিশোর আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না; সে গমনোদ্যত সৌম্যকে যখন জোর করিয়া ঠেকাইয়া বুকের পাঁজরে চাপিয়া ধরিল তখন সে নিদারুণ অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে, তাহার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

"সৌম্য, তোরা সবাই মিলে আজ আমায় এমন ক'রে ত্যাগ করিস নি। তুই আজ আমার ভুল বুঝিয়ে দে ভাই—তুই যা' কোরতে ব'লবি আমি তাই কোরবো।"

কথা শুনিয়া সৌম্যের রাগ অনেকটা নামিয়া আসিল। সে এবার অপেক্ষাকৃত সহজ কণ্ঠে কহিল "আমি তাকে দিদি বোলে ডাকি। তা ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ তার সাথে আমার সাজে না—নইলে তোমার হাতে ছেড়ে দিয়ে তার এ অপমান আমি এমন কোরে সইতুম না। কী দিয়ে তোমার মন তৈরী নবুদা', একটা মেয়ে মানুষকে ভালবাসতে পার না? এতগুলো বই পড় কিসের জন্য শুনি? পণ্ডিত হবে [illegible] কিন্তু আমার ত মনে হয়, এসব তোমার পণ্ডশ্রম হ'চ্চে, তোমার গাঁয়ে গিয়ে চাষবাস করাই ভাল।"

কথাগুলি ত' ঠিক্ সৌম্যের মত চঞ্চল যুবকের মুখে শোভা পায় না! নবকিশোর হতভম্ভ হইয়া কহিল "তুই কি কোরতে বলিস?"

সৌম্য কহিল, "এখুনি যাও, অনিমাদির সঙ্গে দেখা কর। তুমি কি কোরে এসেচ আমি তা' ঠিক জানি না। কিন্তু চিঠিখানা আমার ফিরিয়ে দাও; এ চিঠি আমি তোমায় রাখতেও দেবো না"—বলিয়া সে হস্ত প্রসারিত করিল। নবকিশোর তেমনি বিহ্বলের মতই পত্রখানি তাহার হাতে দিয়া কহিল—"তোর কি ভয় হয়, আমি আবার চিঠিখানা তাকে দেবো?"

"কিছু আশ্চর্য্য নয়, নবুদা তুমি সব পার। কিন্তু মনে থাকে যেন—আমি মাঝে পড়ে আজ তোমার একটা মস্ত ফাঁড়া কাটিয়ে দিলুম—এ চিঠি তার হাতে পড়লে তুমি নিস্তার পেতে না।" বলিয়া সৌম্য আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। নবকিশোর উদাস ভাবে টলিতে অনিমাদের বাটীর উদ্দেশ্যে রওনা হইল।

কিন্তু এই ব্যাপারের পরেও তাহাদের মনের ঝড় নিভিবার সুযোগ আসিল না। অনিমা পরীক্ষার পড়ায় এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে নবকিশোর আসিলেও তাহার সহিত দুদণ্ড নিভৃতে বসিয়া আলাপ করিবারও অবকাশ হইত না। নবকিশোরও একমাস নিয়মিত মাধুরীকে পড়াইয়া চলিয়াছে—তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বাদ দেয় নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে অনিমার সঙ্গে চোখাচোখি হইলেও—ইহারই রেশ টানিয়া, অন্তরের মিথ্যা বিরোধটাকে আর একবার ঝাড়িয়া ফেলিবার শেষ সুযোগ, ইচ্ছা থাকিলেও সে লাভ করিতে পারে নাই।

অনিমার যেদিন শেষ পরীক্ষা সেদিন সকালে নবকিশোর অনিমাকে কহিল, "[illegible] তুমি পরীক্ষার হল থেকে বাইরে অপেক্ষা কোরো। বিকেল বেলা আমি গিয়ে নিয়ে আসবো।"

অনিমা কি ভাবিয়া রাজী হইল।

কিশোর যথা সময়ে হাজির হইল। এ কয়দিন ক্রমাগত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের জবাব লিখিয়া তাহার যে ক্লান্তি আসিয়াছিল আজ তাহা চুকিলে অনিমা হৃষ্টচিত্তে পরীক্ষা-মন্দির হইতে বাহির হইতেই নবকিশোরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

—"আজ তোমায় ছেড়ে দেবো না। তুমি আজ সমস্ত সন্ধ্যা আমার সঙ্গে থাকবে, রাত দশটায় বাড়ী যাবে।"

অনিমা হাসিয়া কহিল, "এত জোর কিসের জন্য শুনি? কিন্তু আমি কি আজ কিছু খাব-ও না।"

"খাবে বই কি, আজ শুধু কমলা নেবু খাবে। আমি নিউ মার্কেট থেকে এক ডজন নেবু কিনবো, তার পর গ্লোবে গিয়ে দু'জনে বায়োস্কোপ দেখবো।"

নিউমার্কেটের নামে অনিমা কহিল—"আমি ডালমুট খাবো।" S. N.

কিশোর হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা তাও দু' পয়সার কিনবো।"

অনিমা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের অভিনয় করিয়া কহিল—"আমি এমন কিপ্টের সঙ্গে যাইনে—তোমায় চার আনার ডালমুট কিনতে হবে।"

উভয়ে তখন একখানা দোতলা বাসের মাথায় চাপিয়া সত্য সত্যই চাঁদনীর মোড়ে নামিল। নিউমার্কেটে গিয়া অনিমা ইচ্ছামত প্রচুর চকোলেট, টফি, ডালমুট কিনিল। নবকিশোর মাত্র কয়েকটি নেবু কিনিল।

তাহার পর যখন গ্লোব থিয়েটারে গিয়া তাহারা দোতলার সার্কেলে, একেবারে জনশূন্য একটি কোণে দুজনে পাশাপাশি বসিল, ছবি দেখানো তখন সুরু হইয়াছে।

সাদা পর্দ্দার বুকে ছায়ার লীলা সুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু একটি ঘটনার নাট্যরূপ—তাহার আরম্ভ আছে, বিকাশ আছে, পরিণতি আছে—অখণ্ড মনযোগের সহিত গোড়া হইতে ঘটনা পরিবর্ত্তনের ধারা

অনুসরণ না করিলে, গল্পের খেই হারাইয়া যায়, সূত্র ছিন্ন হইয়া পড়ে—আজ এই দুটি নরনারী অন্ধকারের বুকে পাশাপাশি বসিয়া তাহার কতটুকুই বা অনুধাবন করিল? তথাপি, এমনি ধারা একান্তে এ উহাকে নিকটে পাইবার যে আনন্দ—জগতের কোন্ নাটকের অভিনয় তাহা অপেক্ষা তৃপ্তিপ্রদ? এই যে সুযোগ, ইহা কি শুধু ছবি দেখিয়া অন্তরকে ভুলাইবার জন্য? নবকিশোরের আজ ভাবনা-চিন্তা নাই, কেবল অনর্গল কথা বলিতে থাকে এবং কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে বাদাম বা চকোলেটের টুক্‌রা কাগজের ঠোঙা হইতে তুলিয়া অনিমার মুখে তুলিয়া দেয়। অনিমা পরম তৃপ্তিতে সেগুলি ঠোঁট দিয়া গ্রহণ করে এবং যেন অখণ্ড মনোযোগ দিয়া মাঝে মাঝে চিত্রাভিনয়ের বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করে।

নবকিশোর কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া কহিল—"বেশ, তবে তুমি ছবিই দেখ, আমি আর কথা-ই কইব না।"

অনিমা মধুর হাসিয়া তাহার গলাটি কিশোরের দিকে বাড়াইয়া দিয়া তাহারই স্পর্শে কিশোরের কান দুইটি একবার নাড়িয়া দিল।

কিন্তু সে দুর্বিনীতাকে কিশোর আজ ক্ষমা করিল না। নিজে এবার তাহার অধিকতর নিকটে সরিয়া বসিয়া তাহার স্কন্ধ-সংলগ্ন অনিমার গলাটি বাহুর পাশে বন্দী করিয়া মুখখানাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। অনিমা বাধা মাত্র দিল না, একটি কথাও কহিল না। আজ তাহার পরমপ্রিয়ের বাহুর আড়ালে যে বুকের পরশটুকু পাইয়াছে, তাহাই আশ্রয় করিয়া সে নিস্পন্দ, চেতনা-হীনের মত পড়িয়া রহিল। আর নবকিশোর মাঝে [illegible]হাত করিয়া বাদামের টুক্‌রা তাহার মুখে তুলিয়া দিতে দিতে যখন এক[illegible] ঠোঁটে করিয়া সে কার্যটি সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিল, তখন দেখিল, সে [illegible] নির্ব্বিকার। চোখ বুঁজিয়া তাহার অস্তিত্ব গোপন

করিলেও তার পরশটুকু গোপন করিতে পারিল না। উত্তপ্ত ওষ্ঠপুটের যে চিরন্তন পিপাসা—হিম-শীতল অধর দিয়া তাহারই নিবৃত্তি করিয়া দিল। সুধার প্রলেপ লাগিয়া অন্তরে অন্তরে আজ তাহার পুলকের বান ছুটিল।

তথাপি এ অপ্রকাশ্য রঙ্গালয়ে, দৃষ্টির অন্তরালে থাকিলেও আঁধারের লুকোচুরি কতক্ষণ চলে! অনিমা যখন তাহা আবিষ্কার করিয়া চক্ষু মেলিয়া স্বাভাবিক চেতনায় উঠিয়া বসিল, নবকিশোর তখন বলিতে সুরু করিয়াছে।—

"জান অনিমা, আমি একটি ছেলেকে জানতুম, যে একটি মেয়েকে ভালবাস্‌ত—"

পরম বিজ্ঞের মত অনিমা কহিল—"তারপর?"

—"কিন্তু মেয়েটি এমনি অপদার্থ যে, সে কথা সে বিশ্বাস ক'রতো না।"

অনিমার গাম্ভীর্য্য যেন একটু ভাঙিল। সে এবার অপেক্ষাকৃত তরলকণ্ঠে বলিল—"তারপর?"

—"তারপর তাকে আবার বুট আর বাদাম ভাজা কিনতে হোল, ভালবাসায় আর কুলোলো না"—বলিয়া হো হো করিয়া কিশোর হাসিয়া ফেলিল।

অনিমা হতাশের অভিনয় করিয়া কহিল—"তা হ'লে তো দেখচি, মেয়েটি বড্ডই অসহায়! তাকে এবার থেকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে হ'চ্চে!"

কিশোর কহিল—"কি গুরুমন্ত্র দেবে তার কানে?"

অনিমা কহিল—"এসব কাঠ-রেড়ালের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে হবে ত—আচ্ছা কাঠ-বেড়ালেরা শুধু বাদামই খায়—নেবু খায় না, নয়?"

নবকিশোর দেখিল, সত্যই ত' নেবুগুলার সদ্ব্যবহার হয় নাই; সে এবার সারা মুখে পুলক ছিটাইয়া কহিল—"দেবো?"

—"হাত-মুখ নোংরা না ক'রে যদি খাইয়ে দিতে পার তো দাও!"

নবকিশোর কহিল—"শক্ত কাজ বটে, তবু একবার হাতযশ পরখ ক'রে দেখা যাক, কিন্তু যদি না পারি, তোমায় আবার বাদাম খেতে হবে!"

অনিমা কহিল—"তা' খাব না? কলেরা হ'য়ে না মরলে তোমার মনের সাধ পূরবে কেন? বরং আমি তোমায় বাদাম খাইয়ে দেব, তুমি আমায় নেবু খাওয়াবে। কিন্তু মনে থাকে যেন—আমার মুখের বাইরে একটুখানি রস লাগবে না—লাগলে আমিও তোমার সারা মুখে মাখিয়ে দেব।"

নবকিশোর হাসিয়া কহিল—"কিন্তু শাস্তি শুনে লোভ হ'চ্চে, কি ক'রব তাই ভাবচি!"

কিছুক্ষণ এইভাবে চলিল, নবকিশোর আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল, কহিল—"আচ্ছা, যে মেয়েটির কথা কইছিলুম, সে মাঝে মাঝে অমন্ দপ্ কোরে জ্বলে ওঠে কেন ব'লতে পার?"

অনিমা সকৌতুকে জবাব দিল—"বোধ করি, পুরুষদের একটু সায়েস্তা ক'রবার জন্য।"

কিশোর আবার কহিল—"কিন্তু সে মাঝে মাঝে লঘু অপরাধে বড্ড গুরু শাস্তি দেয়! জান অনিমা?—সেদিন সে ছেলেটিকে পরিপাটি কোরে খাইয়ে অবশেষে নির্ম্মমভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিল।"

অনিমা তার জবাবে কহিল—"মুখে তাড়িয়ে দিলেও কি মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে? তোমার সে লোকটির সে দিন উচিত ছিল জোর কোরে সেখানে থাকা। তুমি আমায় ব'লেছ, সে তাকে ভালবাসে। সেই ভালবাসা যদি তাকে সে অধিকারটুকু না দিতে পারে, তার উচিত, সে মেয়েটিকে ভুলে যাওয়া। কিন্তু যাই বল কিশোর, আমার মনে হয়, সে ভালবাসায় কিছু গলদ আছে!"

কোন মতে মুখের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া কিশোর কহিল—"আমারও তাই মনে হয় অনিমা। সেই ছেলেটির একটি নিকটতম বন্ধু সেদিন তাকে সেই কথাই ব'লেছিল।"

অনিমা স্মিতমুখে কহিল—"কি বলেছিল ?"

—"ব'লেছিল—শুধু তার গলদ আছে তাই নয়, সে মেয়েটির ভালবাসারও সে সম্পূর্ণ অযোগ্য। ছেলেটির বন্ধুটি নাকি মেয়েটিকে দিদি ব'লে ডাক্‌তো নইলে সে—"

অনিমা সকৌতুকে কহিল—"কী ক'র্‌ত ?"

—"এ মুক্তোর মালা সে বাঁদরের গলায় ছেড়ে না দিয়ে, নিজে পরতো"—বলিয়া মনের ভুলে হঠাৎ অনিমার গালদুটি নাড়িয়া দিতেই সে রোষদৃপ্ত কণ্ঠে কহিল—"তবে তুমি সরে পড়; ভাগ, আমি তোমার কোন গল্প শুনতে চাই নে, আমার সারা মুখ কি ক'রলে—" বলিয়া সে বিরক্তির অভিনয় করিয়া সত্যই আসন ছাড়িয়া খানিক দূরে গিয়া বসিল।

তখন কিশোর অনুনয় করিয়া কহিল—"রাগ ক'রো না অণু! আমি মনের ভুলে কোরে ফেলেছি—আমি এখুনি মুছে দিচ্চি—এমন সুন্দর কোরে মুছে দেব, তুমি জানতেও পারবে না।"

অনিমা বড় বড় চোখে শাসনের ভঙ্গীতে কহিল—"ঐ হাত দিয়ে ?"

—"দূর বোকা, হাত দিয়ে কখনও গাল মুছে দেয়! কিন্তু যাই বল, অণু—তোমার সে ছেলেটার মত আমি আর অত বোকা নই—"

নবকিশোরের সুদৃঢ় বাহুর আলিঙ্গন অনিমাকে আবার নিকটবর্ত্তী করিল এখন অনিমা তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া শুধু মুখে রাগ দেখাইয়া কহিল—"ছাড় বলচি অসভ্য।"

—"ছাড়বো বই কি অণু, একটু পরেই ত' ছেড়ে দেব! কিন্তু ব'লতে পার, আবার কবে এমন দিন আসবে, যখন ছাড়বার কথা আর

ভুলেও মনে আসবে না? আমি সে দিনের প্রতীক্ষায় থাকবো—তুমি বল, তুমিও সে দিনের প্রতীক্ষায় থাকবে?"

অনিমা ইহার কী জবাব দিবে? জীবনে সে শুভ মুহূর্ত্ত একদিন আসিবে বলিয়াই ত' আশায় বুক বাঁধিয়া এ অনিশ্চয়ের পথে এতখানি অগ্রসর হইয়াছে। এ জীবন-নদীর জল-স্রোতে, যাহাকে কাণ্ডারী করিয়া সে সুখের তরণী ভাসাইয়াছে—একদিন তাহাই যে পথের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া আপন গন্তব্য স্থলে পৌঁছিবে—ইহাতে যদি সংশয়ের বাষ্প মাত্র থাকিত, তবে কি সে এতখানি অগ্রসর হইবার ভরসা পাইত? আজ তাহার তনু-মন আচ্ছন্ন করিয়া সে আশা-তরু মূল গাড়িয়া বসিয়াছে। একদিন তাহাই ত' শাখা পল্লবিত হইয়া পত্র-পুষ্পে ফুটিয়া উঠিবে! যদি এখনও তাহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে এই চরম প্রশ্নের মীমাংসা না হইয়া থাকে—শুধু মুখের জবাবই কি তাহা অপেক্ষা বড় হইবে?

অনিমা চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। শুধু তার বাঞ্ছিতকে ঘিরিয়া তাহার অধরে অধর দিয়া, স্কন্ধে মাথা রাখিয়া, নিস্পন্দের মত বসিয়া রহিল। আজ কোন শঙ্কা, কোন সংশয় তাহাদের পীড়িত করিতে পারিল না।

এমনি করিয়া দু'টি প্রাণীর, সে দিন ছবিঘরের একান্তে অভিনয় দেখার সাধ মিটিল। কিন্তু দৃষ্টির অলক্ষ্যে থাকিয়া, যে অতনু শুধু একটি মাত্র বাণ ছুঁড়িয়া আজ চরম অভিনয় করিয়া গেল, মিলন-পিয়াসী দু'টি আত্মার অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের অন্তর্য্যামী সে সাফল্যে হাসিল কি কাঁদিল—বোঝা গেল না। কিন্তু সমাপ্তির যবনিকা টানিয়া বাহিরের অভিনয় শেষ হইয়া আসিলেও—অন্তরের রঙ্গালয়ে বুঝি আবার নূতন করিয়া কোন অজানা নাটকের অভিনয় সুরু হইল—যাহার আভাস মাত্র

পাইয়া, এই দুইটি নর-নারীর হিয়া, কি এক অনাস্বাদিত আনন্দের উন্মাদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আজ বোধ করি, তাহারই সীমানা নির্দ্দেশ করিতে আশায় বুক বাঁধিয়া, কল্পনার রঙীন সূতায় তৃপ্তির জাল বুনিতে বুনিতে, তাহারা আবার নূতন করিয়া জীবনের পথে যাত্রা সুরু করিল।

চিরন্তন দুঃখ বা চিরন্তন আনন্দ বিধাতার বিধানে ঘটে না। নিয়তির কাল-চক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই বাণীই প্রচার করে। আজ যাহা আনন্দের, কাল তাহা দুঃখের; আজ যাহা আশার, কাল তাহা নৈরাশ্যের; আজ যাহা তৃপ্তির, কাল তাহা বেদনার।

পথের সন্ধানে বাহির হইয়া, যে হতভাগ্যের জীবন অকস্মাৎ সৌভাগ্যের অরুণালোকে নানা রঙে রাঙিয়া উঠিল, আজ এতদিন পরে বুঝিবা তাহারই অন্তরালে থাকিয়া এক টুকরা কাল মেঘ দেহ বিস্তার করিতে সুরু করিল।

ইতিমধ্যে অনিমা প্রবেশিকা পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত পাশ করিলে, সাধারণ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করায় কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইল, অঙ্ক ছাড়া প্রায় সব ক'টি বিষয়েই, লেটার' এবং বাংলা ভাষায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় একটি সোনার পদক পাইল। কিন্তু এ সাফল্যের আনন্দ সে উপভোগ করিবার অবসর পাইল না। পরীক্ষায় পাশ করার কিছু পরেই তাহার পিতা নিবারণবাবু হঠাৎ ইহধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বয়স হইলেও শরীরে বিশেষ কোন ব্যাধি ছিল না। অফিসে কাজ করিতে করিতে হঠাৎ অস্বোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহাকে বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইল; কিন্তু মূর্চ্ছা আর ভাঙিল না। ডাক্তার আসিয়া অনুমান করিলেন—অত্যধিক রক্তের চাপ বৃদ্ধি হওয়াই মৃত্যুর কারণ।

এই দুর্ঘটনায় অনিমার পরিবারে সকলেই কাতর হইয়া পড়িল। নবকিশোর, সৌমা ও করুণা যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে লাগিল! অনিমা আই-এ পড়িবার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর সেও হঠাৎ কলেজ যাওয়া বন্ধ করিল। নৈরাশ্যে তাহার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িল। তাহার পিতার জীবনকে আদর্শ করিয়া, তাঁহারই উৎসাহে অনিমা দশজনের একজন হইবে বলিয়া, পরম নিষ্ঠার সহিত সে সাধনা সুরু করিয়াছিল—সেই পিতাই যখন মারা গেলেন, তখন তাহার এ অসাধ্য সাধন করিবার আবশ্যকতা কি! তাহা অপেক্ষা মাধুরী পড়ুক—দাদা একটা কাজ-কর্ম্মের সন্ধান করুন—সে সকলের পশ্চাতে থাকিয়া, সংসারটিকে বাঁচাইয়া রাখুক—ইহাই সে কর্ত্তব্যস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, কলেজের মোহ ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু এ জেদ সে বজায় রাখিতে পারিল না। নবকিশোর আর আজ-কাল তাহার মতামতের অপেক্ষা রাখে না। যে একটি অনুরোধ করিতে কুণ্ঠায় মরিয়া যাইত—সে আজ জোর গলায় আদেশ করিতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না।

তাই বাধ্য হইয়া নবকিশোরের অনুরোধে তাহাকে নিয়মিত কলেজে হাজিরা দিতে হইত। ইতিমধ্যে অরুণ লেখাপড়া ছাড়িয়া একশত টাকা বেতনে তাহার বাবার অফিসে ভর্ত্তি হইল। অরুণের পিতা উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী ছিলেন। তাহারই জোরে ও সাহেবের সুপারিশে সে গোড়া হইতে ভাল কাজই পাইল। আর চাকুরী যখন করিতে হইবে, বিশেষতঃ সরকারের চাকুরী—তখন তাহা যত অল্প বয়স হইতে সুরু করা যায়, ভবিষ্যতের পক্ষে ততই ভাল।

তিনটি মাত্র প্রাণীর জন্য অত বড় বাড়ী আবদ্ধ না রাখিয়া অনিমার পরামর্শে অরুণ তাহাদের পৈতৃক বাটীর সমগ্র উপর তলাটি ভাড়া দিল। মাস গেলে তাহা হইতে প্রায় একশত টাকা আয় হইত।

দেখিতে দেখিতে নবকিশোরের বাৎসরিক পরীক্ষা আসিয়া পড়িল। এতদিন সে মন দিয়া পড়াশুনা করিবার অবসর পায় নাই—নিঃসঙ্গ অনিমাদের দেখাশুনা, খবরাখবর করিতে তাহার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হইয়াছে। কোন গতিকে এবার যদি কলেজের পরীক্ষায় পূর্ব্ব সম্মান বজায় রাখিতে না পারে, তবে সে বৃত্তির টাকা কয়টি হারাইবে। নবকিশোর তাই আবার পরীক্ষার আগে পরম মনোযোগের সহিত লেখা-পড়া সুরু করিল।

কিন্তু ততদিন বুঝি কৃষ্ণপ্রেয়সীর জীবনেরও চরম পরীক্ষার সময় আসিয়া পড়িল। ভগ্নদেহ, ভগ্নমন ও ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া সে এতদিন কোন গতিকে কাটাইয়াছে। একটানা চল্লিশটী বছর ধরিয়া বিপুল অধ্যবসায় ও উদ্যমে সে জীর্ণ তরী বাহিয়া বাহিয়া আজ সে ক্লান্ত। ইহলোকে তার সকল বাসনাই পূর্ণ হইয়াছে। দেবতার মত স্বামী লাভ করিয়া তাহারই সেবায়, তাহার নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ অবসরগুলি কাটিয়াছে। অদৃষ্ট দোষে গর্ভে সন্তান ধারণ করিতে না পারিলেও—ভগবান তাহাকে অপুত্রক রাখেন নাই। দেহ ও মনে পরিপূর্ণ সম্পদ লইয়া তাহারই কোল জুড়িয়া যে আজ এত বড়টি হইয়াছে, সে ঐ কিশোর। এমন ছেলে থাকিতে নারী কখনও অপুত্রক হয় না। দুরারোগ্য ব্যাধি তাহার দেহকে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেও, যন্ত্রণায় কাতর করিতে পারে নাই। অনাবিল শান্তি লইয়া তাহার স্বামী, তাহার সন্তান আজও এ সোনার সংসার ঘিরিয়া তেমনি আনন্দ বিতরণ করিতেছে।

আজ ইহাদেরই ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তাহাতেই বা দুঃখ কি? কৃষ্ণপ্রেয়সী অন্তরে মৃত্যুর ডাক শুনিতে পাইলেও বেদনায় ভাঙিয়া পড়িল না বরং সে শুভ মুহূর্ত্তের উদ্দেশ্যে দিন গণিতে লাগিল। পুত্রকে শিয়রে করিয়া সে যদি স্বামীর চরণে মাথা দিয়া শেষ নিশ্বাস

ফেলিতে পায়, তবে তাহার মত সৌভাগ্যবতী আর কে আছে? শুধু একটু তার আশঙ্কা আছে—কিশোরের পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যদি না টিকিয়া থাকে? স্বামীকে বলিবার কিছু নাই, কিশোরকেও বলিবার কিছু নাই। মৃত্যুর শেষ পরোয়ানা জারী করিতে যমরাজ যখন ইহলোকের বন্ধন শেষ করিতে আসিবেন, তখন যেন কিশোর একবার মুখ ফুটিয়া 'মা' বলিয়া বিদায় দেয়। শুধু একটি বার ডাক দিলেই কৃষ্ণপ্রেয়সী পরম তৃপ্তিতে চক্ষু বুজিবার অবসর পাইবে। মনে হয়, এই ডাকটুকু শুনিবার জন্যই এখনও তার প্রাণটুকু বাহির হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে—কেবল কিশোরের আসিবার অপেক্ষা, একবার মাত্র ডাকিবার অপেক্ষা! কৃষ্ণপ্রেয়সী মনে মনে জানে, কিশোর এই সুযোগে আসিয়া পড়িলে আর সে আত্মাকে প্রবঞ্চনা করিতে পারিবে না। দুরন্ত শিশুর মত তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, বিদায় কালে 'মা' বলিয়া একবার শেষ আলিঙ্গন দিবেই।

স্বামী দোকান-পাট ছাড়িয়া আজ সাতদিন সাতরাত তাহার রোগ-শয্যার পার্শ্বে ঠায় বসিয়া আছে। সে ঠিক বুঝিয়াছে এতদিনে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী এ সাধ্বীকে লইবার জন্য তাঁহার রথ নিশ্চয়ই প্রস্তুত করিতেছেন। আজ সে চাকার শব্দ শোনা গিয়াছে—কেবল পৌঁছিবার অপেক্ষা মাত্র। এবার আর কৃষ্ণপ্রেয়সীর গতি রোধ করিবার সামর্থ্য নাই। সতী আজ সে আনন্দ-লোকে মহাপ্রস্থান করিবেই—স্বামী তার কোন শক্তি দিয়াই সে আহ্বান আজ খণ্ডন করিতে পারিবে না।

সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত উদাস দৃষ্টি দিয়া শ্রীধর কেবল তার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়। মাঝে মাঝে মনে হয় সে রোগে পাণ্ডুর মুখখানি বুঝি আজ তপস্যাকৃশা পার্ব্বতীর মতই এক রুক্ষ সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীধর বলে—“যদি কোন সাধ এখনও অপূর্ণ থাকে, ব’লতে কুণ্ঠা করো না বড় বৌ—”

স্বামীর কথা শুনিয়া সাধ্বীর চোখে জল আসে। সে তাহার দুটি হাত নিবিড় ভাবে বুকের উপর ধরিয়া, পলক-হীন দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইতে থাকে—কখনও বা চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়। কিন্তু শত চেষ্টাতেও সে স্বামীর কথার জবাব দিতে পারে না। মনে ভাবে, এ সংসারের খেলা-ঘরে যার চল্লিশটি বৎসর পরম আনন্দে কাটিয়াছে, আজ আনন্দের স্মৃতিটুকু সতেজ থাকিতে থাকিতে যদি দুটি চক্ষু বুজিতে পারে, তবেই ত, সকল সাধের নিবৃত্তি হয়! সংসার-বিপণীতে জীবনব্যাপী বেচা-কেনার পর আজ দোকান-তুলিবার বেলা—নূতন করিয়া সাধ বাড়াইবার আবশ্যকতা কি!

তথাপি সে বারবার স্বামীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এইটুকু মাত্র শেষ কামনা জানাইয়াছে, যেন শেষ নিশ্বাস ফেলিবার পূর্ব্বে একবার কিশোরের সঙ্গে দেখা হয়।

পত্নীর কথায় আজ শ্রীধর বুঝিল, নারীজনসুলভ সাধারণ মমতা আজ পরের ছেলেকে আশ্রয় করিয়া কোথায় গিয়া ঘা দিতে সুরু করিয়াছে। জীবনের শেষ কামনা যদি ইহাকেই অবলম্বন করিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিতে চায় তবে স্বামী হইয়া তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য—সময় থাকিতে নবকিশোরকে সংবাদ দিয়া নিকটে আনিয়া রাখা।

শ্রীধর তদ্দণ্ডেই নবকিশোরকে আহ্বান করিবার জন্য পত্র লিখিতে বসিল—কিন্তু তাহার পরীক্ষা সন্নিকট বলিয়া, কৃষ্ণপ্রেয়সী সে পত্র লিখিতে দিল না। তিন-চার দিন পূর্ব্বে কিশোর একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিল সামনের সপ্তাহে তাহার পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, পরীক্ষা শেষ হওয়া মাত্র সেই দিবসই গ্রামে রওনা হইবে। কৃষ্ণপ্রেয়সী হিসাব করিয়া দেখাইল—

তাহারও আর মাত্র চার-ছয় দিন বাকী। এ কটা দিন নিশ্চয়ই পরমেশ্বর সদয় হইবেন, কিশোরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবেই।

এতদিন জ্বর সমানে লাগা ছিল। আজ সন্ধ্যার পর হইতে তাহা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল এবং নিশা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক চেতনাটুকুও লুপ্ত হইল—রোগিণী বিকার ঘোরে অর্থহীন প্রলাপ বকিতে সুরু করিল। শ্রীধর পূর্ব্বাহ্নেই খবর দিয়া সহর হইতে পাশ করা বড় ডাক্তার আনাইয়াছিল, রোগিণীর শয্যা-পার্শ্বে ডাক্তার সমানে বসিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ও ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ খাওয়াইতে সুরু করিলেন। ডাক্তার গায়ে হাত রাখিলেই বা একটু উচ্চ স্বরে ডাকিলেই কৃষ্ণপ্রেয়সী চমকিয়া উঠিত। রক্তবর্ণ চক্ষুর বিহ্বল দৃষ্টি দিয়া সে যেন ঘরের চারিধারে কাহার সন্ধান করিতে থাকিত।

অন্তরে মর্ম্মন্তুদ্ বেদনা বহিয়া স্বামী যখন ভগ্নকণ্ঠে এক একবার 'বড়বৌ' বলিয়া আহ্বান করিত—অনুসন্ধানরত দু'টি চক্ষু তখন স্বামীর দিকে ফিরাইয়া সে উদাস কণ্ঠে কহিত—

"ঐ এল বুঝি গো, ঐ এল বাছা আমার, ঐ এল। একবার ওঠ—কাছে যাও তাকে আমার কোলের কাছে এনে দাও—"

মাঝে মাঝে বিকারের ঘোরে—"নবু—বাপ্ আমার—আয় বাপ্ কাছে এসে বোস্, মা বল একবার-"বলিয়া ডাকিতে লাগিল। নারায়ণে সমস্ত সমর্পণ করিয়া যাহার আত্মা আজ বৈকুণ্ঠ-লোকে মহাপ্রয়াণ করিতে সুরু করিয়াছে—সে আজ ভুলিয়াও তাহার ইষ্টের নাম করিল না, তাহার অত সাধের গৃহদেবতা কোথায় পড়িয়া রহিল—একটা ক্ষুদ্র দেহধারী রক্তমাংসের বালক—তাহারই মুখে একটি মাত্র মা-ডাক শুনিবার আশায় এত যন্ত্রণাতেও বুঝি তাহার আত্মা, দেহ ছাড়িবার শেষ ছাড়-পত্র পাইল না, নীরব নিশ্চল দৃষ্টিতে তাহারই আশা পথ চাহিয়া রহিল।

সেদিন পরীক্ষা-মন্দিরে শেষ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া নবকিশোরের বার বার কী যেন এক অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপিতে লাগিল। খুড়ীমার অসুখের কথা। তাহার নিকট একরকম গোপন করাই ছিল—বর্ত্তমানে অত্যধিক বাড়াবাড়ির কথাও সে জানিত না। তথাপি কাহার যেন অজ্ঞাত ইঙ্গিত আজ নবকিশোরের অন্তরে বাবংবার বাজিতে সুরু করিল—একটা কিছু অশুভ, একটা কিছু ভয়ঙ্কর নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকিবে।

শঙ্কিত-হৃদয়ে পরীক্ষা-মন্দির হইতে বাহিরে আসিতেই দেখিল একখানি টেলিগ্রাম হাতে বিরস বদনে সৌম্য তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। অবস্থা দেখিয়া তাহার বুকখানি ছাঁৎ করিয়া উঠিল। ক্ষিপ্ত হস্তে টেলিগ্রামখানি খুলিতেই দেখিতে পাইল—শ্রীধরের কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তার নির্দ্দেশ মত তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাড়ী রওনা হইবার জন্য জরুরী তার করিয়াছে—কৃষ্ণপ্রেয়সীর অবস্থা নাকি শোচনীয়।

রুদ্ধনিশ্বাসে ভগবানের নাম জপিতে জপিতে, নবকিশোর একবস্ত্রে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল। সৌভাগ্যবশতঃ তার কিছু পরেই গ্রামে যাইবার একখানি ট্রেন মিলিল।

তারপর নবকিশোর যখন গ্রামে আসিয়া পৌছিল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। সাতদিন সাতরাত কৃষ্ণপ্রেয়সীর নিদ্রাহীন দৃষ্টি তাহাকেই খুঁজিয়া খুঁজিয়া আজ চিরনিদ্রায় দু'টি চোখ বুজিয়াছে। নন্দীগ্রামের আকাশে বাতাসে আজ শুধু গগন-ফাটা হরিবোল। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী আজ তার মানবীমূর্ত্তিকে চিতায় রাখিয়া—সোনার রথে পা বাড়াইয়াছে।

অর্দ্ধ-চেতন, অর্দ্ধ-উন্মাদ নবকিশোর শ্মশান-ঘাটে আসিয়া পৌছিল—তাহার কিছু আগেই শব আসিয়া চিতার বুকে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। আর সে চিতার পার্শ্বে প্রাণহীন সতী-দেহ আগুলিয়া শ্মশানের-ঈশ্বর যেমন

করিয়া বসিয়াছিল—তেমনি উদাস, তেমনি নিস্পন্দ দৃষ্টিতে পত্নীর বুকে হাত রাখিয়া শ্রীধর বসিয়া আছে।

বুকফাটা চীৎকারে গগন কাঁপাইয়া নবকিশোর যখন 'খুড়িমা'—বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, শ্রীধরের নিষ্পলক আঁখি দুটি তখন সহসা জ্বলিয়া উঠিল। সে হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিল—

"খবরদ্দার কিশোর, সতীর দেহের ধারে দাঁড়িয়ে আজ তার অপমান করিস নি। ঐ চিতার পরে তোর মা, শুধু তোর মুখে একবার 'মা' ডাক শোনবার আশায় এখনও হতভাগী জেগে আছে। এখনও ডাক কিশোর, এখনও সময় আছে। বল্ মা, আমি এসেছি, আমি তোমার মুখে শেষ আগুন ঠেকিয়ে দিতে, তোমার চিতার পাশে ছুটে এসেচি—এখনও ঘুমোয় নি রে। এখনও জেগে আছে দেখ্। সাত দিন সাত রাত সে নিদ্রাহীন দৃষ্টি দিয়ে তোকে খুঁজেছে, ভগবানের নাম মুখে আনে নি, ইষ্টনাম ভুলে গিয়ে শুধু তোকেই ডেকেচে, কিশোর! যদি এলি, একবার ডাক বাপ্ একবার মা বল! তার শেষ সাধ পূর্ণ ক'রে নিজের হাতে চিতা ধরিয়ে দে।"

চিতার আগুন নিভিতে নিভিতে দেহ ভস্মীভূত হইয়া যায়—কিন্তু মনের চিতায় যখন আগুন ধরে, সে আগুন কি নেভে?

কৃষ্ণপ্রেয়সীর চিতা নিভিল। কিন্তু নবকিশোরের মানস-চিতায় সে আগুন আজ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নি তার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া যে সুবর্ণ প্রতিমাকে গ্রাস করিল, আজ তাহারই ছিটা আসিয়া নবকিশোরের অন্তর আচ্ছন্ন করিলেও—এক নিমিষে তাহাকে গ্রাস করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে, তিলে তিলে পলে পলে তাহাকে পুড়াইতে সুরু করিল। অগ্নি শিখা যদি একেবারে তাহাকে শেষ

করিতে পারিত—হয়ত' সে বাঁচিয়া যাইত—এমন করিয়া মরণ-যন্ত্রণাকে ঠেকাইতে হইত না !

এ ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী পৃথিবী আজ তাহার নিকটে শূন্য ! বন্ধুর ভালবাসা, স্বজনের প্রীতি, আত্মীয়ের আত্মীয়তা, সংসারের যাবতীয় স্নেহের বন্ধন আজ তাহার নিকট তিক্ত অসার। তাহার কোন আকর্ষণই আজ অন্তরকে প্রলুব্ধ করে না। মা থাকিতে যে মায়ের আদর বুঝিল না, আজ মা-হারা হইয়া, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল, সংসারে সকল স্নেহের আধার সেই জননী, যাহার অভাবে মানুষ সর্ব্বস্ব পাইয়াও ভিখারী হয়, লক্ষ কুবেরের ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও তাহার অন্তরের দারিদ্র্য ঘোচে না। সতীর পবিত্র প্রণয়-মধু, ভগিনীর স্নেহ, স্বজনের প্রীতি ভ্রাতার প্রেম, পিতার ভালবাসা এমনকি শিশুর মুখের আধ আধ ডাক, সকলকে ছাপাইয়া, সকলকে দূরে রাখিয়া, সকলের আকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া যে অন্তরকে সজীব রাখিতে পারে, হৃদয়কে শক্তিমান করিতে পারে—মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিতে পারে—সে ঐ জননীর প্রীতি, জননীর প্রেম, জননীর স্নেহ, জননীর আদর, জননীর আলিঙ্গন, জননীর চুমা।

সেই জননীর দেহ আপন হাতে চিতায় তুলিয়া দিয়া আজ সর্ব্বস্বহারা সন্তান, শ্রীধরকে সঙ্গে করিয়া গৃহে ফিরিল। কিন্তু পত্নীহারা স্বামীকে আর সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা চলিল না। একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেমের যে গোপন ফল্গুধারা এতদিন এ বৃদ্ধের বুকে বহিয়াছে—আজ তাহাই শতধা হইয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িল। সচেতন দৃষ্টি মেলিয়া নবকিশোর সেই প্রথম অনুভব করিল গৃহ-দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া গৃহলক্ষ্মী বিদায় গ্রহণ করিলে—গৃহস্থের ঘর, এমনি ভাঙিয়া পড়ে।

পত্নীর অন্তিম কার্য্য ও শ্রাদ্ধ-শান্তি ভালমত চুকিবার পরদিনই শ্রীধর উকীলের সাহায্যে তাহার যথাসর্ব্বস্ব নবকিশোরের নামে লিখিয়া দান-পত্র

রেজেষ্টারী করিয়া ফেলিল। পরে এক শুভদিনে ঐ মূল্যবান দলিলখানি নবকিশোরের হাতে তুলিয়া দিয়া, একটি কম্বল ও একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ মাত্র সম্বল করিয়া সে কাশীর পথে রওনা হইল। যাইবার পূর্ব্বে সে-বৃহৎ কারবারের সমস্ত দায়িত্ব এবং সংসারের ভার সমস্ত নবকিশোরের হাতে তুলিয়া দিয়া বৃদ্ধ শ্রীধর অশ্রু গদগদকণ্ঠে কহিল—বাবা, মাত্র ত্রিশটে কোরে টাকা কাশীর ঠিকানায় আমায় প্রতি মাসে পাঠিয়ে দিস্, যে ক'টা দিন বাচি ঐ বিশ্বনাথের চরণ ধরে যেন সংসারের সব যন্ত্রণা ভুলতে পারি।

কিশোর বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীধরকে বুকে চাপিয়া ধরিল। কহিল—কাকা, মা আমায় সকল দিক থেকে নিঃস্ব ক'রে গেছে। আপনি আর এমন কোরে আমায় বেঁধে যাবেন না।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কিশোরের মাথায় হাত রাখিয়া, উত্তরীয়ের কোণ দিয়া তাহার চোখের জল সযত্নে মুছিয়া দিয়া, শ্রীধর জবাব দিল—তা হয় না কিশোর, লক্ষ্মীর ভিটের সন্ধ্যার দীপ জ্বালাতে আজ তোকেই এখানে থাকতে হবে। তোর মায়ের ভিটে আজ তোর নিজের কোরে গেলুম—

কিন্তু এ গুরুভার কি আমি বইতে পারব?

পারবি বই কি বাপ্, পারতেই যে হবে। যে সাধ্বী আমায় অন্তর থেকে ব'লচে—যে তাকে একবার মা বোলে ডাকতে পারে, সে তার পুত্রের কর্ত্তব্য কদাচ ভোলে না। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, গুণে ও চরিত্র-মাধুর্য্যে তোর মত ছেলে, আমি জানি এতখানি অকৃতজ্ঞ হবে না।

কিন্তু আপনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কোরে এমন সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবেন না কাকা আপনি আমার সংসারের ভার দিয়ে যান—কিন্তু অর্থের ভার দেবেন না।

কথা শুনিয়া এত দুঃখেও শ্রীধরের ম্লান হাসি দেখা দিল। সে কহিল —আমি যেখানে চলেচি কিশোর, মানুষ সেখানে শুধু একাই যায়, পয়সা নিয়ে যায় না। তার ডাক যে আমি শুনতে পেয়েছি বাপ, আর কি আমি

থাক্‌তে পারি ? যতদিন না ভগবান সেখানে আমায় পৌঁছে দেন, আমার এতেই চল্‌বে কিশোর ! তুই মানুষ হ'য়ে বেঁচে থাক্, তোর খুড়ীমার মান রাখিস্, তার ঠাকুরের মাথায় তুলসী দিস। তাঁর ভিটেয় সন্ধ্যার দীপ জ্বালিস—তবু এইটুকু জানতে পারলেই আমি নিশ্চিন্তে মর্‌তে পারি।

নবকিশোর বুঝিল পত্নীপ্রেমের পুণ্যতীর্থে অবগাহন করিয়া যে আকণ্ঠ অমৃতের আস্বাদন করিয়াছে, আজ জলশূন্য সরোবরে বসিয়া সে আর কোন্ আশায় পিপাসা নিবৃত্তি করিবে ?

স্বামী তাই হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে—সংসার ত্যাগ করিয়া, যে মহামিলনের প্রতীক্ষায়, বারাণসীর পুণ্যতীর্থে বিশ্বনাথের চরণাশ্রয় করিতে, যাত্রা সুরু করিল, নব-কিশোর শত চেষ্টাতেও বাধা দিতে পারিল না। তবে উদ্‌গত অশ্রুজল প্রবল বেগে দমন করিয়া কোন গতিকে সম্পত্তির দলিলখানা হাতে ধরিয়া উদাস দৃষ্টিতে সে প্রসারিত পথের দিকে চাহিয়া রহিল—শ্রীধর তখন দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীধরকে এ অঞ্চলে সকলেই একজন সঙ্গতিপন্ন মহাজন বলিয়া জানিত। সে সামান্য অবস্থা হইতে নিজ চেষ্টা ও অধ্যবসায় বলে ব্যবসা ও তেজারতিতে বহু টাকা খাটাইয়া পূর্ব্বাবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। তাহারই পরিত্যক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যে একজন জমিদারের ঐশ্বর্য্যকেও ম্লান করিতে পারে, নবকিশোর বোধ করি এতদিন তাহা ঘুণাক্ষরেও অনুমান করিতে পারে নাই। তাঁহার মহাজনী কারবার সুশৃঙ্খলিত। নবকিশোর হিসাব করিয়া দেখিল, বৎসরে ছয় মাস আমদানী ও চালানী হইতে মাসে হাজার টাকা হিসাবে লাভ হয়, বাকী ছয়মাসের লভ্যাংশ, খরচ-খরচা বাদ গড়পড়তা তিনশত টাকার কম হয় না। ইহা ছাড়া স্থানীয় জমিদারের অধীনে যে প্রায় পাঁচশ বিঘা ধানী-জমি পত্তন আছে

তাহা বরগায় খাটাইয়া যে ধান পায়, অর্দ্ধেকের বেশী বিক্রয় করিয়াও তাহার সম্বৎসরের খাই-খরচা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়।

দোকানে দুইটি বড় বড় লোহার সিন্ধুক ছিল। নবকিশোর খুলিয়া দেখিল তেজারতি এবং বন্ধকী কারবারে সোনা ও রূপার গহনায় তাহার একটি আগাগোড়া ভর্ত্তি এবং আর একটিতে শুধু টাকা ও নোট। অনুমান হয় নগদ তহবিল লাখ টাকার কম হইবে না।

একজন অনাত্মীয় ভিন্নসম্প্রদায় ভুক্ত লোক, তার সারা জীবনের উপার্জ্জিত এই বিপুল সম্পত্তিভার, স্বেচ্ছায় অবলীলাক্রমে একজন পথের ভিক্ষুকের হাতে তুলিয়া দিয়া, মাসিক মাত্র ত্রিশটি টাকার উপর নির্ভর করিয়া সংসারের মমতা কাটাইয়া চলিয়া গেল।

সারারাত ধরিয়া নবকিশোর কাঁদিল—অন্তরকে কোন দিক দিয়া প্রবোধ দিতে পারিল না। সংসারে সে ত' কাহারও নিকট একটি কানাকড়িও চাহে নাই। জীবনে লেখা পড়া শিখিয়া উন্নতি করিবার তাহার কোন সুযোগ ছিল না। ভগবান সে সুযোগও দিয়াছেন। তাহাই আশ্রয় করিয়া সে একদিন মানুষ হইতে পারিবে, স্বাবলম্বী হইতে পারিবে, এ বিশ্বাস তাহার আছে। তবে কেন মাঝ পথে এ ভাগ্য পরিবর্ত্তন—যাহার দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন তাহার মনুষ্যত্বের আদর্শকে এমন নির্ম্মম ভাবে আজ হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে!

সে নারায়ণের পূজা করিতে বসিয়া বার বার তাঁহার চরণে এই মিনতিই জানাইতে লাগিল—

প্রভু, এত প্রলোভনের মধ্যে যদি আমায় টেনে এনেচ, তা' বহন ক'রবার মত শক্তি দাও। আমি ত' কারু কাছে কোন অপরাধ করিনি, তবে কেন আমায় এমন কোরে জড়িয়ে বাঁধলে? তুমি শক্তি না দিলে, এই বাড়ীতে আমি কেমন ক'রে বাঁচব' কেমন ক'রে নিঃশ্বাস ফেলবো?

আজ যারা আমায় এমন ক'রে বেঁধে গেল, তারা সবাই চায়, আমি পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করি। কিন্তু সত্যই কি আমি তা' পেরেচি? যার অন্তিম নিশ্বাস পতনের সঙ্গে সঙ্গে আমি আজ মাতৃহীন, যদি পুত্রের কর্ত্তব্য পালন কোরতে পারতুম সে কি এমন কোরে হৃদয় শশ্মান কোরে, সংসার মরুভূমি কোরে এত অকালে চলে যেতে পারত, যে এমন অকৃতজ্ঞ, এমন কুলাঙ্গার এমন হৃদয়হীন তার অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য কেন? তুমি যদি দয়াময়! তবে সে দয়া এ অযোগ্যের প্রতি আরোপিত হোল কেন? কিন্তু আর যে আমি ভাবতে পারিনে প্রভু। তুমি আমায় নিষ্কৃতি দাও— যাকে আমি হৃদয়হীনের মত আঘাত কোরেছি—ঐশ্বর্য্যবান হ'য়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করা চলে না, কাঙালের অন্তর নিয়ে তাকে যেন আমি আজীবন ইষ্টের আসনে বসিয়ে পূজা ক'রতে পারি!

কিন্তু অবোধ সন্তান আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগল হইলেও অন্তরের যাতনা লাঘব করিতে পারিল না। পরমেশ্বর আজ তাহাকে যে বাঁধনে বাঁধিয়া দিলেন তাহাতে এমন কোন ফাঁক এমন কোন ছিদ্র অবশিষ্ট রহিল না, যে পথে সে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। অন্তরের অবরুদ্ধ বেদনা প্রবল আত্মসংযমের দ্বারা গোপন করিয়া, চোখের জল মুছিয়া কিশোর আজ পরম বিষয়ীর ন্যায় আরব্ধ কর্ম্ম পরিচালনা সুরু করিল।

কিশোর বাড়ী গেল, কিন্তু যাওয়ার পর হইতে কাহাকেও একখানা চিঠিও লিখিলনা, কলেজ খুলিল, কলিকাতাও ফিরিয়া আসিলনা। করুণাময়ী শঙ্কিতা হইলেন, সৌম্য অস্থির হইল, অনিমার অন্তর বেদনায় ভাঙিয়া পড়িল।

কৃষ্ণপ্রেয়সীর মৃত্যু-সংবাদ তাহারা সকলেই পাইয়াছিল। কৃষ্ণপ্রেয়সী তাহার নিজের জননী না হইলেও—কিশোরকে জননীর অধিক স্নেহ

দিয়া মানুষ করিয়াছিল একথা করুণাময়ী, অনিমা ও সৌম্য, কে না জানিত? সকলেই বুঝিল, সে আবার দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হইল।

কিন্তু সংসারে দুঃখ ও শোক কাহার নাই? প্রাণাধিক প্রিয়কে চিতায় তুলিয়া দিয়া, যে বেদনা লইয়া মানুষ বাড়ী আসে তাহা যদি চিরন্তন হইয়া থাকিত, তবে কি ভগবানের রাজ্যে কোন প্রাণীর সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করা সম্ভব হইত?

নবকিশোর বেদনা পাইয়াছে সত্য। কিন্তু আর পাঁচজনের মতই ত' তাহাকে সে বেদনা ভুলিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া—কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

কৃষ্ণপ্রেয়সীর মৃত্যু সংবাদ পাইবার পর, করুণাময়ী অনিমা ও চ্যাটাজ্জী সাহেব ও মাষ্টার মহাশয় সকলেই তাহার শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সে সব পত্র সে ভাল করিয়া পড়েও নাই; সকলগুলি খুলিয়া দেখিবার অবসরও হয় নাই।

করুণাময়ী পত্রের জবাব না পাইয়া অধিকতর শঙ্কিতা হইলেন। কলেজ খুলিয়া গেল, কিশোর পড়িতেও আসিলনা। অবশেষে তিনি আবার তাহাকে নানা কথায় প্রবোধ দিয়া, সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ উপদেশের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে কলিকাতা আসিবার জন্য আদেশ করিলেন।

নবকিশোর যথা সময়ে সে পত্র পাইল, কিন্তু আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলনা। প্রত্যুত্তরে সে লিখিয়া জানাইল:—

বড়দি,—

ছোট ভাই বলিয়া আজ যাহাকে আদেশ করিয়াছেন, সে আর আজ আপনার সে ছোট ভাই নাই। আপনার স্নেহচ্ছায়ায় পুষ্ট হইয়া, জগতের

কাছে যে একবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহার সে গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে, উন্নত শির আজ ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে।

যে একদিন মানুষ হইবার জন্য কলিকাতা গিয়াছিল, মানুষ হইবার জন্য লেখাপড়া শিখিতেছিল, মানুষ হইবার জন্য সমাজে মিশিয়াছিল, নিজের চেষ্টায় দশজনের একজন হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইবে বলিয়া বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছিল—সে আর আজ ভিখারী নয়, তাহার দারিদ্র্য ঘুচিয়াছে, কুবেরের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সে আজ রাজাধিরাজ! সে সম্পত্তির পরিমাণ কত জানেন? লক্ষাধিক টাকা নগদ, প্রায় হাজার বিঘা ধান-জমি এবং মাসিক প্রায় হাজার টাকা লাভের এক সুবৃহৎ চালানী কারবারের মালিক—এই নবকিশোর!

কিন্তু, কেমন করিয়া বড়দি? জানিতে কৌতূহল হয় নিশ্চয়ই। আমি জানি আপনার কৌতূহল হইবে, সৌম্যর কৌতূহল হইবে, অনিমার কৌতূহল হইবে। হয় ত' জগত শুদ্ধ পরিচিত অপরিচিত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলের সে কৌতূহল হইবে।

এ ঐশ্বর্য্য তার জননীর ভালবাসার দান।

এ দানের মূল্য সে জীবন থাকিতে দিতে পারে নাই। যে ভালবাসা আজ ফকিরকে রাজা করিয়াছে, ভিখারীকে সিংহাসনে বসাইয়াছে, চির-নিঃস্বকে চির-ঐশ্বর্য্যবান করিয়াছে—সে কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে, অকৃতজ্ঞ নবকিশোর কী দিয়াছে জানেন?

জননীর অন্তরে বিষ ঢালিয়া, সে মাতৃ-হৃদয় আজীবন দগ্ধ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত, অন্তিম নিশ্বাস পতনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি—পুড়াইয়া পুড়াইয়া দিনে দিনে, তিলে তিলে, পলে পলে, তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

জীবন থাকিতে আপন হাতে যে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল আজ

জীবন অন্তে তাহাই নূতন করিয়া আবার জ্বালিয়া আসিয়াছে। সে দিন চিতার বুকে তাহারই শিখা জ্বলিয়াছিল। সুপুত্র যেমন করিয়া জননীর ঋণ পরিশোধ করে—এখানকার গ্রামবাসী বুঝি তাহাই সেদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

তাহারই বিনিময়ে আমার আজ এই বিপুল সম্পত্তি লাভ। আমি আজ ধনী, আমি আজ ঐশ্বর্য্যশালী। খুড়ামহাশয় সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আমার নামে দান-পত্র করিয়া দিয়া সম্প্রতি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন। আর আজ আমি সে কুবেরের ঐশ্বর্য্য আগুলিয়া বসিয়া আছি।

বলুন ত' বড়দি, ইহার পর আমার আর কি কলিকাতা যাওয়া সম্ভব? একদিন ভিখারীকে ভাই বলিয়া আসনে বসাইতে পারিতেন, ঠিক তেমনি করিয়া বসাইতে, তেমনি করিয়া আদর করিতে, শাসন করিতে, আদেশ করিতে আর কি আপনি পারিবেন?

সে নবকিশোর যে নাই বড়দি। মার চিতার সঙ্গে সে চিরকাঙাল পুড়িয়া মরিয়াছে।

আবার আমায় পড়াশুনার প্রলোভন দেখাইয়াছেন।

বিদ্যালাভ করিয়া বড় হইব, জ্ঞানী হইব, পণ্ডিত হইব—কেমন নয়?

একদিন বিদ্যাচর্চ্চার মূল্য স্বরূপ দশটি টাকা বৃত্তি লাভ করিয়াও পরবর্ত্তী জীবনে পড়াশুনার সুযোগ পাইব—কল্পনাও করি নাই। সেই হতভাগ্যকে আপনার পরম স্নেহশীল পিতা স্বেচ্ছায় আবিষ্কার করিয়া আপনার পরিবারে স্থান দিয়া—ধন্য করিয়াছিলেন।

সে কৃতজ্ঞতায় অন্তর পূর্ণ করিয়া, বড় আশায় বুক বাঁধিয়া, আপনাদেরই স্নেহচ্ছায়ায় একটা নূতন সংসার গঠন করিয়া পরমানন্দে পড়াশুনা সুরু করিয়াছিলাম।

কিন্তু তাহার পরিণাম ?

যোগ্যতার মূল্য নিরূপণ ত' ভাল করিয়াই করিয়াছি বড়দি, মনুষ্যত্বের আদর্শকে বড় করিতে গিয়া, যেটুকু মাত্র হৃদয় অবশিষ্ট ছিল—সেদিন নন্দী গ্রামের শ্মশান ঘাটে—তাহা নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছি।

ইহার পরেও বড় হইব, ইহার পরেও বিদ্বান হইব, ইহার পরেও পণ্ডিত হইব—সে ঔদ্ধত্য আমার নাই বড়দি, আপনারা আমায় মার্জ্জনা করিবেন।

যে বিদ্যা লাভ করিতে গিয়া আজ আমি মাতৃহীন, জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত, সে বিদ্যায় আর আমার প্রয়োজন নাই। আর একটি কথা এখানে আমি বলিয়া রাখি বড়দি। হয় ত' আর সুযোগ পাইব না, কখন কোথায় যাই, আমার কিছুই স্থিরতা নাই।

অনিমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ সে আপনি জানেন। এ সম্বন্ধ আপনিই আবিষ্কার করিয়াছিলেন—আমি নই। ভিখারীকে যে কেহ ভালবাসিতে পারে, ইহা আমি জানিতাম না। কিন্তু সত্যই সে সর্ব্বগুণময়ী নারী এ কাঙালকে ভালবাসিয়াছিল। আমি দরিদ্র হইয়া সে ভালবাসা অকপটে গ্রহণ করিয়াছিলাম। একদিন ইহাও আপনারই ইঙ্গিতে বড়দি। নতুবা সে সাহস আমি করিতাম না। আপনারই চরণ প্রান্তে বসিয়া আমি শিখিয়াছিলাম— ঝুটা সমাজের বিধিনিষেধ অপেক্ষা—হৃদয়ের ধর্ম্ম, বিবেকের ধর্ম্ম ঢের বেশী বড়, ঢের বেশী কাম্য। নতুবা আজন্ম নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ সন্তান, কোন্ সাহসে কায়স্থ কুমারীকে জীবন-সঙ্গিনী করিবার সাহস করিত ?

সেই অনিমা, যাহার সহিত আমি নিঃসঙ্কোচে মিশিয়াছি, নিঃসঙ্কোচে ভালবাসিয়াছি—বলিতে লজ্জা নাই—তাহার অঙ্গও স্পর্শ করিয়াছি, আজ হঠাৎ বড়লোক হইয়া, সমাজের সমস্ত বন্ধন, সকলের ভালবাসা উপেক্ষা করিলেও, তাহাকে ত্যাগ করিব কেমন করিয়া বড়দি ?

অন্তরের বড় ব্যথা বড় বেদনা লইয়া আজ এত লিখিলাম বড়দি। হয় ত' আঘাতও করিলাম। সে নবকিশোর পুড়িয়া মরিয়াছে তাহার আশা আপনারা রাখিবেন না, আমাকে ভুলিবেন, সৌম্যকেও ভুলিতে বলিবেন কেবল অনিমাকে বলিয়া রাখিবেন—আজীবন কাঁদিবার জন্য তাহাকে আমি রাখিয়া গেলাম। হয় ত' একদিন সে ভালবাসার মূল্য দিতে পারিতাম, তাহার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতে পারিতাম। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, সে নবকিশোর আর নাই। সে হৃদয় নিঃশেষে পুড়িয়া মরিয়াছে। এ মরুভূমির বুকে যে একটু শুষ্ক মাটি এখনও অবশিষ্ট রহিল—সে হতভাগিনী যদি কোন দিন এখানে আশ্রয় লইতে ভরসা পায়, হৃদয়হীনকে ভালবাসিয়া ভালবাসার সাধ মিটাইতে সাহস করে, তাহাকে বলিবেন—সে দুয়ার এখনও খোলা রহিল—সেখানে সে আমার স্ত্রী।

সম্প্রতি আর সংসারে মন টিকিতেছে না। পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন আজ আমার নিকট তিক্ত বোধ হইতেছে। ভাবিতেছি এদিককার একটা সাময়িক ব্যবস্থা কিছু করিয়া কিছুদিনের জন্য তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইব।

চিঠির উত্তর দিলে হয় ত' আর আমার হাতে আসিবে না—ততদিনে বোধ করি বাহির হইয়া যাইব।

কৃতজ্ঞতা জানাইবার মত উপাদান আর আমার হৃদয়ে নাই। সে যোগ্যতা না থাকিলেও, একজন পাষণ্ডকে ভাই বলিয়া ভালবাসিয়া যদি ভুল বুঝিয়া থাকেন—সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আপনি করিবেন, আপনার সে শক্তি আছে।

আপনাদের ভুলিতে পারিব কি না জানি না, যাহাতে ভুলিতে পারি সেই আশীর্ব্বাদই করিবেন। বন্ধনের বেদনা আর আমার বহন করিবার শক্তি নাই বড়দি, হতভাগিনী অনিমাকে যদি ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতাম

—তাহা যদি সম্ভব হইত—তবে হয় ত' সে আর কাহাকেও ভালবাসিয়া সুখী হইতে পারিত। আমি একেবারে মুক্ত হইয়া একটু নিঃশ্বাস ছাড়িতে পাইতাম। কিন্তু তাহা যে রহিল না বড়দি? ভগবান আমার অদৃষ্টে দুঃখ মাপিয়া রাখিয়াছেন—কে তাহার প্রতিরোধ করিবে?

আজ তবে আসি। এ অনির্দ্দেশ যাত্রা পথে--কোথায় কি করি, কোথায় যাই কিছুই স্থিরতা নাই। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি

—অকৃতজ্ঞ কিশোর।

অনিমার পরিবারে যে সুখ শান্তি ও ঐশ্বর্য্য ছিল—পিতার মৃত্যুর পর তাহা বিলীন হইতে সুরু হইয়াছে।

পিতা, গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-বিভাগে উচ্চবেতনের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন, টাকাকড়ির দিক হইতে কোনদিন কোন সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহার উপর তাঁহার আর একটী মারাত্মক রোগ ছিল। সেটি ঘোড়া রোগ। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত প্রতি শনিবার নিয়মিত তাঁহাকে ঘোড়দৌড়ের মাঠে হাজিরা দিতে হইত। সমাজে মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে তাঁহাকে দেনা করিতে হইত। ইহারই ফলে তাঁহার কলিকাতার বাসভবনটী মহাজনের নিকট বন্ধক পড়িল। পিতার মৃত্যুর পর অনিমা জানিল বাবা স্থাবর সম্পত্তি কিছু রাখিয়া গেলেও—তাহার পিছনে প্রায় হাজার পঁচিশেক টাকা দেনা, তাহাদের দুই ভ্রাতা ভগ্নীর স্কন্ধে চাপাইয়া গিয়াছেন। তাহা অচিরাৎ পরিশোধের উপায় না করিলে ভবিষ্যতে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ ও আসলে যে পরিমাণ টাকা দাঁড়াইবে তাহাতে বাস্তুভিটাখানি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেও দেনা-পরিশোধ সম্ভব হইবে না।

ইহার উপর সম্প্রতি নাগ-সাহেবের অত্যাচার অনিমার নিকট প্রায় অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে। লোকটি এটর্ণী—যেমনি অর্থপিশাচ তেমনিই চরিত্রহীন। এই নাগ সাহেবটিই অনিমাদের প্রতিবেশী এবং ইহার নিকট দেনার দায়ে তাহার পিতা তাঁহাদের বসতবাটী বন্ধক রাখিয়াছিলেন।

অনিমার পিতা জীবিত থাকিতে নাগ-সাহেব পাওনা টাকার জন্য বড় একটা পীড়াপীড়ি করেন নাই—তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই যেন নূতন করিয়া অত্যাচার সুরু হইল।

অরুণ সবে কলেজ ছাড়িয়া চাকুরীতে ঢুকিয়াছে। সে এটর্ণী বাবুটিকে বিশেষ করিয়া বুঝাইল—শীঘ্রই সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া দেনার একটা ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু তাহা হইবার পূর্ব্বেই উচ্চবেতন এবং প্রমোশনের আকর্ষণেই তাহাকে সুদূর বর্ম্মামুল্লুকে বদলী হইবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইল। প্রথমে সে অনিমাদের একাকী অভিভাবকশূন্য অবস্থায় কলিকাতায় ফেলিয়া যাওয়া উচিত বিবেচনা করিল না। কিন্তু এই পৈতৃক দেনার কথা বিবেচনা করিয়া অধিক উপার্জ্জনের প্রলোভন সে ত্যাগ করিতে পারিল না। ভাবিল এই দুঃসময়ে কিছু টাকা বেশী পাইলে সংসারের সুসার হইবে। অনিমাও ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিল।

অরুণের এক অতিবৃদ্ধ মাতুল মেদিনীপুরে চাকরী করিতেন, অনেকদিন হইল পেনসান্ লইয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন। অরুণ মামাকে জরুরী তার করিয়া আনিয়া কলিকাতার বাসায় অনিমাদের অভিভাবক হইয়া থাকিবার জন্য রাজী করাইয়া এক শুভদিনে রেঙ্গুন যাত্রা করিল। মামাবাবুও বৃদ্ধ বয়সে বিনা খরচায় পরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার সুযোগ পাওয়ায় কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

কিন্তু অরুণ কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেই, অনিমার উপর নাগ-সাহেবের অত্যাচার পুরোপুরি সুরু হইল। তিনি যখন তখন, সময় নাই, অসময়

নাই, টাকার তাগাদায় আসিবার ছলে—অনিমার সহিত আত্মীয়তা জমাইতে সুরু করিয়া দিলেন। এ গায়ে-পড়া আলাপে অনিমার হৃদয় জ্বলিয়া গেলেও—তাহাকে মুখে কিছু বলিবার বা বাধা দিবার শক্তি রহিল না। কিন্তু সে ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কায়মনপ্রাণে ভগবানকে ডাকিতে সুরু করিল।

অনিমা তাহার পিতার মৃত্যুর পরই, কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার মোহ জন্মের মত ত্যাগ করিয়া সংসারের যাবতীয় ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু কিশোর তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। তাহার আদেশ পালন করিতে অনিমা আবার কলেজে হাজিরা দিতে সুরু করে।

একদিন অনিমা কলেজ হইতে ফিরিয়াই দেখিল—নাগ সাহেব যেন নিজ বাড়ীর মত দিব্বি আরামে তাহার বিছানার উপর পা-ছড়াইয়া শুইয়া আছেন! দেখিবামাত্র রাগে তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। লোকটি শুধু কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত নয়, একেবারে অভদ্র। গৃহস্বামিনীর অনুপস্থিতকালে তাহার অনুমতির অপেক্ষামাত্র না রাখিয়া, একজন অনাত্মীয় বয়স্কলোক তাহারই ঘরে আসিয়া এমনভাবে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সুরু করিবে—ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর।

কিন্তু আজকাল অনিমা লক্ষ্য করিতেছে, ধীরে ধীরে এই একপ্রকার অচিন্ত্যনীয় ব্যাপারই ঘটিতে সুরু করিয়াছে। নাগ-সাহেব দুদিন আগে তাহাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতেন—সম্ভ্রমের সহিত কথা কহিতেন। আটচল্লিশ ঘণ্টা কাটিতে না কাটিতেই—সে আপনি 'তুমি'তে দাঁড়াইয়াছে—সে সম্ভ্রমে অহেতুক জবরদস্তি আত্মীয়তার গন্ধ ফুটিয়া উঠিতেছে।

বছর পঞ্চাশেক বয়স হইলেও নাগ-সাহেব পরিপূর্ণ সৌখীন্। তিনি চুলে কলপ দেন। সর্ব্বদা সাহেব বাড়ীর দামী সুট পরেন। নিত্য দুই

বেলা প্রসাধন করেন এবং অনিমার সহিত কথা কহিতে হইলেই তিনি তাঁর আসল 'শেল্' বাঁধান 'পাশ্‌নে' চশমাটি চোখে লাগাইয়া প্রণয়ীর দৃষ্টিতে তাকাইতে থাকেন।

অনিমার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় এই উদ্ধত অসভ্য বর্ব্বরের তোবড়ানো গালটি একটি চড় মারিয়া প্লেন্ করিয়া দেয়। কিন্তু বাবার বিপুল দেনার কথা ভাবিয়া সাহস করে না।

সেদিন অনিমা কলেজ হইতে গৃহে ফিরিতেই নাগ-সাহেব সুরু করিল—

"কতক্ষণ থেকে বসে আছি জান—ঘণ্টা দুয়ের কম হবে না।"

অনিমা নীরস কণ্ঠে কহিল—"কিছু দরকার আছে ?"

প্রশ্ন শুনিয়া ভদ্রলোক একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। তিনি একটু ঢোক গিলিয়া জবাব দিলেন—"না, এই বলছিলুম, আসতে কি নেই, অনিমা ? চলনা বিকেল বেলা একটু বেড়িয়ে আসবে—আমার গাড়ী গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেচি।"

"আমায় মাপ্ কোরবেন, আমি আপনার সঙ্গে কোথাও যেতে পারবোনা, বিকেলে আমার একটু কাজ আছে—একটু বেরুতে হবে।"

"সেখানেই চল—আমিই না হয় তোমায় রেখে আসি।"

প্রশ্ন শুনিয়া অনিমা মহা বিপদে পড়িল। লোকটি জোঁকের মত তাহার পিছন নিয়াছে এখন সহজে ছাড়িলে বাঁচে। সে আবার প্রবল বেগে মনে জোর সঞ্চয় করিয়া কহিল—"না। আপনার সঙ্গে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"কেন আমার অপরাধ, আমি কী দোষ করেছি ?"

অনিমা স্বাভাবিক দৃঢ়তার সহিত কহিল—"দোষের কথা নয়, আপনার ও আমাদের মধ্যে যা স্বাভাবিক সম্বন্ধ—তার বাইরে আমাদের

কোন অনুগ্রহ না দেখাতে এলেই আমরা চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।” কিন্তু এ বক্তৃতাতেও নাগ-সাহেবকে নিবৃত্ত করা গেল না। তিনি এবার গদগদ কণ্ঠে বলিতে সুরু করিলেন—

“অনিমা তুমি বোললেই ত,’ আমি তা’ পারিনে। তোমার বাবা যে আমার কতবড় বন্ধু ছিলেন, তুমি ত’ তা’ জান না। আমারও ত’ একটা কর্ত্তব্য আছে!”

অনিমা মরিয়া হইয়া কহিল—“বাবার সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ ছিল তা’ আমি জানতে চাইনে। কিন্তু আপনি ও আমরা পাওনাদার ও দেনদার ছাড়া আর কিছু নয়। এছাড়া আর অন্য সম্বন্ধও আমি ভাবতে পারিনে। কিন্তু মিষ্টার নাগ, আমায় মাপ্‌ কোরবেন, যখন তখন আপনি এমন কোরে বাড়ীর উপর এসে অনুগ্রহ সুরু কোরলে—আমরা সইতে পারবো না।”

মেয়েটি বলে কি? অনিমার কথা বলিবার ধরণ দেখিয়া এতবড় পরম বিষয়ী, ধুরন্ধর রক্তবীজও অবাক হইয়া গেল। জীবনে সে বহু স্ত্রী চরিত্র অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইয়াছে—বহু রমণীকেও সায়েস্তা করিয়াছে। যাহাদের যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার নিকট আবদ্ধ, ইচ্ছা করিলেই এই দণ্ডেই বাটী হইতে উচ্ছেদ করিয়া পথের বাহির করিয়া দিতে পারে—তাহাদেরই পরিবারভুক্ত ১৭।১৮ বছরের এক ফোঁটা মেয়ে তাঁহারই মুখের উপর এমন ভাবে জবাব দিয়া প্রতিবাদ করিতে পারে—নাগ-সাহেব ইহা জীবনেও বোধ করি কল্পনা করেন নাই।

তথাপি তিনি হাল ছাড়িয়া দিলেন না। কোন ব্যাপারে অগ্রসর হইয়া হাল ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহার কুষ্ঠিতে লিখে নাই। তিনি প্রত্যুত্তরে ভাল করিয়া গুছাইয়া কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিলেন—ইতিমধ্যে একটি অপরিচিত যুবককে হঠাৎ ঝড়ের মত প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি

হতবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল—বলা হইল না।

ঘরে যে প্রবেশ করিল—সে সৌম্য।

হঠাৎ সময় বুঝিয়া সৌম্য আসিয়া পড়ায়—অনিমা যেন চাঁদ হাতে পাইল। সে উপস্থিত এ পাষণ্ডের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল ভাবিয়া ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিল।

সৌম্য অনিমার দিকে তাকাইয়া কহিল—"অনিমা দি' এখুনি তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। যে কাপড়ে আছ ঠিক সেই কাপড়ে যাবে—বড়দির হুকুম। আর এক মিনিট দেরী কোরবে না, আমি সঙ্গে গাড়ী এনেছি।"

"আমি প্রস্তুত। তুমি চল", বলিয়া অনিমা অগ্রসর হইল।

নাগ-সাহেব সৌম্যের আপাদমস্তক বার বার ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। ছেলেটী বলিষ্ঠ। হাঁটিবার কায়দা এবং কথা বলিবার ধরণ দেখিয়া বিশেষ বলবান—এমন কি গুণ্ডা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অনিমার পিতার জীবদ্দশায় ইহাকে এ বাটীর ত্রিসীমানায় কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া ত' মনে হয় না। তবে হঠাৎ এ গুণধরই বা জুটিল কোথা হইতে?

তিনি আর কৌতূহল দমন করিতে পারিলেন না। সৌম্য না শুনিতে পায় এমন কায়দায় নাগ-সাহেব অনিমাকে বলিলেন—"ও ছেলেটি কে অনিমা?"

"আমার এক ভাই।"

"এখন কাদের বাড়ীতে যাওয়া হ'চ্চে?"

"তাও কি আপনার জানা দরকার না কি?" কঠোর ভাবে জবাব দিয়া অনিমা চলিতে সুরু করিল।

"ওঃ তাই"—বলিয়া শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে একটা কুৎসিত ব্যাপারের ইঙ্গিত মাত্র করিয়া, শিস্ দিতে দিতে এ্যটর্ণী-প্রভু বাহির হইয়া গেলেন।

নবকিশোর পশ্চিমের কয়েকটি তীর্থস্থান উদ্দেশ্যহীনের মত ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে সত্যসত্যই বেহার অঞ্চলের একটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন সহরে, এক স্বাস্থ্য নিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ঘর ছাড়িয়া বাহিরের আলো বাতাসের মাঝে সে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবে, অন্তরের বেদনা কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারিবে ভাবিয়া বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সে অশান্ত হৃদয় সহজে শান্ত হইল না, বরং ঘরে থাকিয়া কর্ম্মের উত্তেজনায় যে বেদনা ধীরে ধীরে পরিপাক করা সহজ সাধ্য হইত, কর্ম্মহীন দিবসের নিরালা মুহূর্ত্তগুলি তাহা নির্ম্মমভাবে জাগাইয়া তুলিতে সুরু করিল।

তাহারই অনুপস্থিতকালে ঘর সংসার এবং দোকান পাটের পরিচালনার ব্যবস্থা সে ভালই করিয়া আসিয়াছে। মূল্যবান অলঙ্কারাদি ও নগদ তহবিল যাহা আলমারীতে ছিল তাহার সমস্তই তাহার এক নামজাদা ব্যাঙ্কে আমানত করিয়া আসিয়াছে। দোকানের ভার বিশ্বাসী পুরাতন কর্ম্মচারীদের উপর দিয়া এবং কাশীর ঠিকানায় শ্রীধরের নামে অন্ততঃ একশত টাকা করিয়া প্রতিমাসে যথানিয়মে পাঠাইবার উপদেশ দিয়া নিজে শ'পাঁচেক টাকা সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু ইহার ভিতর তার একটি মাত্র শান্তি ছিল। বাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে অন্ততঃ বড়দিদিকে একখানা পত্র লিখিয়াও তাহার হৃদয়ের জ্বালা লাঘব করিয়া আসিতে পারিয়াছে।

সমাজের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন সত্যই তাহার নিকট তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার আর কোন আকর্ষণ নাই। এ শূন্য সংসারে তাহার আজ আর কেহই নাই। নাই বা থাকিল? সংসারে সকলেরই কি থাকে?

নবকিশোর ভাবে—এমনি করিয়া চলিতে চলিতে ভগবান যদি এ-অনির্দ্দেশ যাত্রাপথে একটুখানিও শান্তির আলো দেখাইতেন! মানুষের প্রেম সে চাহেনা; মানুষের ভালবাসার সাধ তাহার মিটিয়াছে। যাহার মূল্য সে একজনের জীবন থাকিতে দিতে পারিল না—তাহা সে অপরের নিকট কোন্ সুবাদে আদায় করিবে? ভালবাসার বোঝা বহিয়া আর সে জীবনকে ভারগ্রস্ত করিতে চাহে না, ভগবান শুধু একটু মুখ তুলিয়া চাহিলেই, সে ইহার মধ্যে একটু শান্তি পাইতে পারে।

তথাপি বেচারী অনিমার কথা স্মরণ করিয়া এক একটু সঙ্কোচ এখন মনের রুদ্ধ দুয়ারে উঁকি মারে!

অনিমা যে ভালবাসে ইহাতে ত' ভুল নাই। কিন্তু সে যদি না বাসিত বা ভালবাসিয়াও মুক্তি দিত, তবে হয় ত আজ এমন করিয়া তাহার কথা ভাবিয়া কষ্ট পাইতে হইত না! কিন্তু সে ত' মুক্তি দিল না! জননীর বিচ্ছেদ-বেদনায় হৃদয় যেখানে শতধা হইয়া আছে, কাহারও কথা ভাবিবার সেখানে অবসর নাই। তথাপি মাঝে মাঝে অনিমার ক্ষুদ্র ম্লান মুখখানি আজো সেখানে ভাসিয়া উঠে কেন?

নারী তার পুষ্পিত যৌবনের নৈবেদ্য সাজাইয়া যেখানে অতি আগ্রহে বসিয়া আছে, মাটির মানুষ না হইয়া যদি পাথরের দেবতাও হইত—তথাপি সে আকুল আহ্বানে সাড়া না দিয়া পারিত না।

নবকিশোরও পারিল না। বেদনায় যখনই হৃদয় ভাঙিয়া পড়ে তখনই সে দেখিতে পায়—কে যেন অন্তরের অলক্ষ্যে থাকিয়া দু'খানি চারুহস্ত বুলাইয়া সে ব্যথায় প্রলেপ দিতে সুরু করিয়াছে।

এত বেদনার মাঝে সেই মুহূর্ত্তের স্মৃতিটুকুই মিষ্ট।

তথাপি নবকিশোর তাহার অসংযত মনকে শাসনে রাখিতে পারে না। মাঝে মাঝে যখন সে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তখন মনে হয় সকল বন্ধনের স্মৃতি আজ চূরমার করিয়া ভাঙিয়া দেয়। আপনাকে নিকটে পাইয়াও যখন হারাইতে হয়, তখন সে হারাইবার ব্যথা সহ্য করিবার জন্য, পরকে আবার নিকট করিয়া লাভ কি ?

নবকিশোরের মন যখন এমনি সন্দেহ দোলায় দুলিতেছিল—অনিমার মনে তখন ঝড় বহিতে সুরু করিয়াছে। বড়দি'কে লেখা, নবকিশোরের পত্রখানি পড়িয়া তাহার মনের যে অবস্থা—বোধ করি প্রবল ভূমিকম্পে সমস্ত পৃথিবী রসাতলে গেলেও সে বিন্দুমাত্র দৃক্পাত করিত না।

চিঠিখানি তাহাকে লেখা নয়, চিঠিখানি বড়দি'কে।

কিন্তু তাহা হইলেও তাহার উদ্দেশ্য ত' বুঝিতে কষ্ট হয় না! নবকিশোর সমস্ত ছাড়িয়া, সকলের বন্ধন কাটাইয়া আজ সন্ন্যাসী। শুধু তাহারই মধ্যে সে হতভাগিনী অনিমা এখনও বাঁচিয়া আছে।

তাহার সমাজ নাই, ঘর থাকিতেও সে গৃহহীন, এত অগণিত বন্ধু-বান্ধব থাকিতেও কাহারও আকর্ষণের ধার ধারে না—মায় এত বড়, শ্রদ্ধার পাত্রী যে বড়দি, তাঁহারও দাবী সে অবলীলায় উড়াইয়া দিবার স্পর্দ্ধা রাখে। তবু তাহারই ভিতরে সে লিখিয়াছে ঃ—

হতভাগিনী অনিমাকে যদি ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতাম—তাহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে সে হয় ত' আর কাহাকেও ভালবাসিয়া সুখী হইতে পারিত।

'পাষাণের দেবতা তুমি, তাই একথা লিখিতে পারিলে? হৃদয় তোমার সত্যই শ্মশান হইয়া গিয়াছে, অন্তর বলিয়া কোন অস্তিত্ব নাই—নতুবা এমন নির্ম্মম ভাবে আঘাত করিয়া কাঁদাইতে পারিতে না।

অনিমা তোমার কী দেখিয়া ভালবাসিয়াছিল ?

সে কি আজ তুমি বড়লোক হইয়াছ বলিয়া ? একদিন তুমিই না আমায় চিঠিতে লিখিয়াছিলে :—

তুমি মোরে করেছ সম্রাট
তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব মুকুট ?

যাহাকে সম্রাট করিয়া, হৃদয়ের মুক্ত দেউলে রত্ন-দীপ সাজাইয়াছিলাম, প্রেমের মণি-মুকুতার হার গাঁথিয়া যাহার গলায় পরাইয়াছিলাম, সে কি আজকের এই লক্ষপতি কিশোর ?

ওগো, স্থান যদি সত্যই দিতে হয়, তবে যেন সেই গরীবের চরণেই স্থান পাই। অর্থের আমার আকাঙ্ক্ষা নাই, ধনীর অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া ঐশ্বর্য্যের সৌধ গড়িবার আমার বাসনা নাই। ভগবান তোমায়—সকল দিক দিয়াই নিঃস্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই তোমার হৃদয় আমি ভালবাসায় ভরিয়া দিয়াছিলাম। তাহার বিনিময়ে শুধু তোমাকেই চাহিয়াছিলাম, তোমার অর্থ চাহি নাই। ভগবান যদি এতদিন পরে হঠাৎ তোমার উপর সদয় হইয়া থাকেন, ধন সম্পদে তোমার ঘর ভরিয়া দিয়া থাকেন—সে রাজ-ঐশ্বর্য্যের প্রতি আমার লোভ নাই। আমি যে চরণ দু'খানি আশ্রয় করিয়া, এ সংসার-সমুদ্রে তরী ভাসাইয়াছিলাম শুধু সেই আশ্রয়টুকুই আমার যথেষ্ট। অপর কোন ঐশ্বর্য্য আমি কামনাও করি না। তোমাকেই কাণ্ডারী করিয়া যেন সে সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারি—শুধু এই আশীর্ব্বাদটুকু করিও।

স্ত্রীলোক বারবার ভালবাসিয়া সুখী হইতে পারে না। পুরুষে পারে কিনা জানি না, যাহারা পারে তাহারা হয় ত' ভালবাসার নামে ভালবাসাকেই অপমান করে—ভালবাসিতে পারে না।

সংসারের যাবতীয় স্নেহের বন্ধন, এমন কি বড়দি' ও সৌম্যের ভালবাসা তুচ্ছ করিয়াও যদি বা অনিমার প্রেমকে বড় করিলে, তবে আবার কোন্ মুখে বল—যদি সম্ভব হয়, তবে যেন আর কাহাকেও ভালবাসিয়াও সুখী হয় ?

হায়, যদি জানিতে, পুরুষ হইয়া যাহা সহজে, এত অবলীলায় উড়াইয়া দেওয়া চলে—নারীর সে স্বাধীনতা নাই। (যে লতা বাড়িতে চায় সে কেবল একটি মাত্র বৃক্ষকেই আশ্রয় করিয়া মাথা তুলিতে পারে। প্রেমও ঠিক তাই। অবলম্বন চূর্ণ হইলে হয়ত আর একটি মিলে—কিন্তু এতদিনে তাহার জীবনী-শক্তি, তাহার রস কষ সব শুকাইয়া যায়। সত্যকারের ভালবাসা এবং ভালবাসার অভিনয়, এক জিনিষ নয়। অন্তরের উৎস সতেজ থাকিতে যাহা সম্ভব তাহাই প্রেম। শুষ্ক হইবার পরেও যদি তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া অপরের ভোগে লাগাইতে হয়, প্রেম তাহাকে কোন কালেই বলা চলে না—সে হয় প্রেমের ব্যভিচার। চোখ খুলিলেই দেখিতে পাইবে—প্রেমের নামে সমাজের চতুর্দ্দিকে যাহা চলিতেছে—তাহার অধিকাংশই প্রেম নয়, সেই ব্যভিচার !)

সেই প্রেম নিঃশেষ করিয়া তোমার পায়ে ঢালিয়া দিবার পরও কি অনিমার পক্ষে অপরকে হৃদয়-সমর্পণের মিথ্যা চেষ্টা করিয়া ভালবাসার অভিনয় দেখানো সম্ভব ?

মনে পড়ে, একদিন অন্ধকারে তোমার বুকে মাথা রাখিয়া ছবি দেখিতেছিলাম। ক্ষণপরেই ছবি শেষ হইল, কিন্তু সে মধুময় আলিঙ্গন টুটিবার পূর্ব্বে, বড় সাধ করিয়া বলিয়াছিলে—"অনু, যতদিন সে শুভদিন না আসে, তুমি আমার অপেক্ষা করিও, আমিও তোমার অপেক্ষা করিব।" মনে পড়ে, আমি তাহার জবাব দিতে পারি নাই। শুধু সে আশ্বাসের বাণী আমি নিঃশেষে অন্তরে ভরিয়া লইয়াছিলাম। সেই বাণী যে আজও আমার জপমালা হইয়া আছে।

সে ত' স্বপ্ন নয়। তুমি নিজেকে যতই 'হৃদয়হীন' বলিয়া আজ গর্ব্ব অনুভব কর, জানিও তোমার সে শ্মশান-হৃদয়ই আমার স্বর্গ। পারিজাতের গন্ধ বহিয়া, প্রেমের মন্দাকিনী প্রবাহে, চিরদিন তাহা হতভাগিনী অনিমার নিকট অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। নিঃস্ব হইলেও সেখানে তুমি রাজার সম্পদ লইয়া বাঁচিয়া ছিলে। আজ তুমি বড়লোক না হইলেও সে রাজ-আসন তোমার টুটিত না। সেখানে তুমি থাকিতে আজীবন আমার পতি, আমার ইষ্ট, আমার হৃদয়ের ঈশ্বর!

মা হারাইয়া তুমি আজ বেদনায় পাগল হইয়াছ। ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছ। কিশোর আমিও মাতৃহীন। মাকে ভাল করিয়া মনে পড়ে না। বাবাকে পাইয়া সে দুঃখও ভুলিয়াছিলাম। তাঁহাকে ভালবাসিয়া বাবা ও মা উভয়ের ভালবাসাই পূর্ণ হইয়াছিল। সে বাবাকে হারাইয়া আমি আজ নূতন করিয়া পিতৃমাতৃহীন। তথাপি আমার দাদা ও ছোট বোনটির মুখ চাহিয়া সংসারের কর্ত্তব্য ভুলি নাই। সে বিপদে তুমি আমায় কি সান্ত্বনা দিয়াছিলে তা' মনে পড়ে না? বাবার অভাব আমার কোন দিন পূর্ণ হয় নাই কিশোর, হয় ত' কোন দিন হইবেও না কিন্তু তাই বলিয়া নিয়তির অখণ্ডনীয় নির্দ্দেশ অবহেলা করিব কেমন করিয়া? কালের ফুৎকারে এমন করিয়াই ত' সকলেরই সুখের নীড় এক এক দিন টুটিয়া যাইবে! যাহা মানুষের সাধ্যের বাহিরে, তাহার অভাবে—দুঃখে কাতর হওয়াই চলে—ভাঙিয়া পড়া চলে না। এ দুদিনের খেলা ঘরে পুতুল খেলা খেলিতে আসিলেও, স্বেচ্ছায় ঘর ভাঙিয়া শ্মশান করিয়া ফেলা মানুষের ধর্ম্ম নয়। ঝড় ঝাপ্‌টা লাগিতে লাগিতে যখন সে ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া পড়িবে, তখন সে ধ্বসিয়া পড়িবেই, কাহারও নিষেধের অপেক্ষা রাখিবে না। প্রকৃতির বিধানকে যখন আমাদের খণ্ডন করিবার উপায় নাই, তখন বিপদে পাগল হইয়া হৃদয়কে

মরুভূমি জ্ঞান করিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা মূর্খতা। তুমি ধীর স্থির ও পণ্ডিত, তোমায় কিছু শিখাইব বা উপদেশ দিব—সে বাতুলতা আমার নাই, সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া দেখিও—বুঝিতে পারিবে।

তোমার খুড়ীমাকে আমি দেখি নাই সত্য। কিন্তু তাঁহার প্রতি তোমার যে অগাধ প্রেম—সে কি আজও আমার অজানা আছে, মনে কর?

স্ত্রী তার ভালবাসা দিয়া জননীর প্রেমকে পূর্ণ করিয়া দিতে পারে—তোমার অনিমা ত' ছার—জগতের আর কোন নারীর সে সাধ্য নাই। সুতরাং সে চেষ্টা আমি করি না কিশোর। দুঃখ হয়, সুযোগ থাকিতে এমন নারীর পদসেবা করিবার সৌভাগ্য একদিনও অর্জ্জন করিতে পারিলাম না।

শোকে তুমি সত্যই উন্মাদ হইয়াছে। নতুবা বড়দি'র মত ভগ্নী এবং সৌম্যের মত ভাইকে অবহেলা করিবার মত শক্তি তোমার থাকিত না। অনিমা কি জানে না মনে কর—বড়দি' ও সৌম্যের তুলনায় তাহার প্রেম কত তুচ্ছ! মানুষকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় তাহা তুমি জানিতে না সত্য, কিন্তু আমি জানিতাম। তথাপি কেমন করিয়া ভালবাসিয়া সুখী হইতে হয়, তাহা আমি সর্ব্বপ্রথম সৌম্যের নিকটেই শিখি।

এই সৌম্য ও বড়দি' যে তোমার কত বড় সুহৃদ তাহা এখনও যদি না জানিয়া থাক, তবে আমার কথায় বিশ্বাস করিও—আমার মত তুচ্ছ এক রমণীর ভালবাসা না পাইলেও তুমি বাঁচিয়া যাইবে—কিন্তু ইহাদের বাদ দিয়া এ শুষ্ক সংসার পথে, তোমার চলিবার মত দ্বিতীয় অবলম্বনও অবশিষ্ট রহিবে না।

কিশোর, চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইও না। সময় থাকিতে ইহাদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিও না। প্রতিকার করিও।'

করুণাময়ী কিশোরের পত্রখানি পাইবামাত্র অনিমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনিমা ও সৌম্য তখন নূতন করিয়া সে পত্রখানি পড়িল। সকলেই বুঝিতে পারিল—কিশোর আজ শোকে প্রায় পাগল হইয়া উঠিয়াছে নতুবা কোন সুস্থ লোকের পক্ষে এমন যুক্তিহীন প্রলাপ—মনের ভুলেও প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

তথাপি নবকিশোরের মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া করুণাময়ীর স্নেহপ্রবণ অন্তর বেদনায় ভাঙিয়া পড়িল। কিশোর যদিও লিখিয়াছে পত্রের উত্তর দিলে সে পাইবে না, তথাপি বড়দি ভাবিলেন হয় ত' এখনও সময় আছে। এখনও সৌম্য গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে।

প্রস্তাব করিতে সৌম্য তদ্দণ্ডেই রাজী হইল। কিন্তু সে যতখানি আশায় বুক বাঁধিয়া নবকিশোরের সন্ধানে তাহার গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল—ঠিক ততখানি নিরাশা বুকে লইয়া তাহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল।

নবকিশোরকে পাওয়া গেল না।

দোকানের কর্ম্মচারীদের নিকট অনুসন্ধানে জানা গেল, প্রায় সপ্তাহ-খানেক পূর্ব্বে সে তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অদ্যাবধি গন্তব্য স্থানের হদিস তাহাদের জানায় নাই।

মাঝে মাঝে টাকাকড়ি পাঠাইবার জন্য বা চিঠি-পত্র লিখিবার জন্য কোন ঠিকানা রাখিয়া গিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করায় সৌম্য জানিল—তাহাও অনাবশ্যক জ্ঞানে নবকিশোর জানাইয়া যায় নাই। সঙ্গে নাকি এককালীন পাঁচশত টাকা লইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহা নিঃশেষ না হইলে যে নবকিশোর দ্বিতীয় পত্র আর লিখিবে না, তাহা সৌম্যকে না বলিয়া দিলেও সে বুঝিতে পারিল।

সে আর অগত্যা কি করে, কলিকাতায় চলিয়া আসিল। আসিবার পূর্ব্বে দোকানের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিল নবকিশোর আসিবামাত্র যেন তাহার পৌঁছ-সংবাদ সেই মুহূর্ত্তেই জরুরী তার করিয়া তাহাদের কলিকাতার ঠিকানায় জানানো হয়।

কর্ম্মচারী সে কথা পালন করিবে প্রতিশ্রুতি দিল।

কিন্তু দেখিতে দেখিতে ছয়মাস কাটিয়া গেল। নবকিশোরের কোন সংবাদই আসিল না। নবকিশোর কোথায় আছে, কেমন আছে, এতদিন কি করিতেছে, ভাবিতে ভাবিতে সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন—অনিমার আশাতরু বোধ করি সমূলে উৎপাটিত হইবার উপক্রম করিল।

এ কয়মাস ধরিয়া সেই নরপিশাচ এ্যাটর্নী জোঁকের মত সমানে তাহার পিছনে লাগিয়া আছে। সে অত্যাচার সহ্য করিয়াও, সে-কথা অনিমা প্রাণ থাকিতে কাহাকেও জানায় নাই, হয় ত' মরিয়া গেলেও তাহা জানানো সম্ভব নয়। এতদিন সে শুধু কিশোরেরই মুখ চাহিয়া এ নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিযাছে। কিন্তু আর যে সহ্য হয় না!

আজ কয়েকদিন হইল, সে নরপশু স্পষ্টই জানাইয়াছে—লোভ তাহার অনিমার দেহের উপর। পিতৃকৃত সে বিপুল ঋণের বিনিময়ে সে অনিমাকে অঙ্কশায়িনী করিতে চায়। বাধা পাইয়া পাইয়া সে পিশাচ এবার মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সে একদিন স্পষ্টই বলিল—"মনের ভাব গোপন রেখে যন্ত্রণা বাড়াতে চাই নে অনিমা! তোমায় দেখে পাগল হ'য়েচি, তোমায় পেয়ে আমি ধন্য হ'তে চাই। তুমি যদি আমার হও অনিমা, জীবনে তোমার কোন দুঃখ থাকবে না। জগতে যত রকম ঐশ্বর্য্য সম্ভব, সমস্তই আমি নিঃশেষে তোমার পায়ে ঢেলে দেব।"

প্রশ্ন শুনিয়া অনিমা কঠিন হইয়া কহিল—"আমার এ দেহটা আপনি

চাইছেন, কিন্তু এ দেবার আমার কোন অধিকার নাই। কিন্তু এ যদি সম্ভবও হোত, আমি কখনও তা দিতুম না। ভালবাসার আপনার বয়স নেই, যোগ্যতাও নেই। এক স্ত্রী আপনার এখনও বর্ত্তমান।"

"কিন্তু তা' হোলই বা অনিমা, তাকে আমি ভালবাসি না! তুমি যদি আমার হও, আমি আজীবন তোমায় রাজরাণী কোরে রেখে দেব।"

জবাব শুনিয়া অনিমার মুখে ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল—"আপনি ভুল বুঝেছেন মিষ্টার নাগ, দেনার দায়ে আমাদের যদি সর্ব্বস্ব বিকিয়েও যায়, ভিক্ষে কোরেও খেতে হয়, তথাপি আপনার এ হীন প্রস্তাব কদাচ অনিমা গ্রহণ কোরবে না। পয়সার লোভ দেখিয়ে ভদ্রলোকের মেয়েকে উপপত্নী করা যায় না।"

মিঃ নাগ এবার মরিয়া হইয়া কহিল—"কিন্তু আমি যদি সত্যই তোমায় বিয়ে ক'রে, আলাদা বাড়ীতে রাখি?"

অনিমা কহিল—"তাতেও না। আপনি আমায় পাবেন না, সারা জীবন তপস্যা কোরলেও অনিমা আপনার হবে না।"

বারবার বাধা পাইতে পাইতে ক্রমশঃ নাগ সাহেবের জেদ বাড়িতেছিল। এবার সে চক্র তুলিয়া ফণা মেলিতে সুরু করিল। কহিল—"নির্ব্বোধের মত জবাব দিও না অনিমা। আমি যখন তোমায় চেয়েছি, আমার হাত থেকে তুমি কখনও নিস্তার পাবে না। জগতে এমন কোন প্রাণীর ক্ষমতা নেই, আমার ইচ্ছায় বাধা দেয়। হলোই বা আমার একটু বয়স বেশী। ভাল আমি এখনও বাসতে পারি। তুমি বিশ্বাস কর না, কিন্তু তুমি যদি সত্যই আমায় বিবাহ কর, তোমার দুঃখ বেশী দিন থাকবে না। একদিন না একদিন বুঝতে পারবে, জগতে অনেক স্ত্রীর থেকেও তুমি সুখী।"

অনিমা কিন্তু কঠিন হইয়া জবাব দিল—"যদি তাও সত্য হয়, তথাপি আমি আপনার হবো না। সে সুখে আমি পদাঘাত করি—"

কথা শুনিয়া সে রক্তবীজের হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ড লোপ পাইল। সে হুঙ্কার দিয়া কহিল—"তোমার এতদূর আস্পর্দ্ধা? কিন্তু কেন শুনি? দুটো নাগর জুটিয়েছ বোলে? তোমাদের মত মেয়ের চরিত্র আমার অজানা নেই, তোমাদের সায়েস্তা করার ঔষধও আমার জানা আছে। সহজে যদি সম্মত না হও, আগে তোমায় গৃহহীন কোরে পথের বার কোরবো—তারপর তোমার এ সতীপনা কোথায় থাকে দেখা যাবে। কিন্তু সাবধান অনিমা, তুমি সাপের ল্যাজ দিয়ে কান চুলকেছ, এর পরিণাম কি, এখনও হয় ত' বুঝতে পারছ না, কিন্তু পরে বুঝবে। আমি এখন চ'ললুম, কিন্তু পরে হয় ত' তোমায় অনুতাপ কোরতে হবে।" বলিতে বলিতে সে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল! অনিমা কিন্তু সেই দণ্ডেই বুঝিল, এ আস্ফালন হয় ত' তাহার মিথ্যা নয়। সে নামেও নাগ, কাজেও হয় ত তাহারই মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

রাত্রে শুইয়া শুইয়া তাহার কিছুতেই ভাল ঘুম আসিল না। তন্দ্রার ঘোরে সে বারবার দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। নাগসাহেব তাহাদের সত্যই তাড়াইয়া দিয়াছে—তাহারা দুটি বোন আশ্রয়শূন্য হইয়া রাস্তার ধারে এক ফুটপাতের তলায় পড়িয়া আছে। অমনি অব্যক্ত বেদনায় তাহার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িল—পার্শ্বে শায়িতা নিদ্রিতা মাধুরীর দেহকে আকুল আগ্রহে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া অজস্র ধারায় কাঁদিতে সুরু করিল।

সে অস্বাভাবিক অবস্থায়, আলিঙ্গনের মাঝে হঠাৎ মাধুরীর ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ায়—সে অঝোরে তাহার ছোড়দিকে কাঁদিতে দেখিয়া হতবিহ্বল হইয়া পড়িল। অবোধ বালিকা কারণ বুঝিতে পারিল না। কেবল বেদনাতুর মুখে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

অনিমা আর নিজেকে রোধ করিতে পারিল না। কহিল—"মাধু, আর দু'দিন পরে আমাদের যে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে ভাই।"

মাধুরী অবাক চোখে চাহিয়াছিল। কথা শুনিয়া কহিল—"কেন ছোড়দি' তাড়িয়ে দেবে কেন ?"

অনিমা কহিল—"তোকে কেমন কোরে বলবো মাধু, কেন তাড়িয়ে দেবে ? তোকে কেমন কোরে বলবো ভাই—বাবা যে অনেক টাকা দেনা কোরে গেছেন। অত টাকা দাদা কোথায় পাবে ভাই—সে যে অনেক টাকা। কিন্তু আর একটি উপায় আছে—আমি যদি তোদের ছেড়ে জন্মের মত চলে যাই !"

কথা শুনিয়া বালিকা হইলেও বেদনায় তাহার বুক ফাটিবার উপক্রম করিল। সে অঝোরে কাঁদিয়া ফেলিল—কহিল "ছোড় দি, কখনও অমন কথা মুখে এনো না, তা' হলে আমি বাঁচবো না। বরং তুমি এ সময় নবুদাকে একখানা চিঠি লিখে দাও, তিনি তোমার একটা ব্যবস্থা কোরবেনই।"

হায় অনিমা, এ বিপদে তোমার যাহাকে মনেও পড়িল না, ক্ষুদ্র বালিকা তাহা নিমেষেই বুঝিতে পারিয়াছে।

কিন্তু অনিমার কি সত্যই একবারও নবকিশোরের কথা মনে পড়ে নাই। সে ঘরছাড়া যদি সত্যই এমন করিয়া অনিমাকে ফেলিয়া না পালাইত, সে মনুষ্য নামধারী সর্পের ক্ষমতাও ছিল না তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করে। অনিমা ভাবিল, ভগবান তাহাকে সকল দিক দিয়া মারিয়াছেন, তবে আর কোন্ সুখে তাহার আশাপথ চাহিয়া থাকিবে ! এ নশ্বর দেহ বিক্রয় করিয়াও যদি পিশাচের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় হউক—অন্ততঃ মাধুরী বাঁচিয়া যাইবে। গৃহহীন করিয়া পথের বাহির করিয়া দিতে আর কেহ আসিবে না। নবকিশোর হয়ত যতদিন বাঁচিবে, আজীবন পাপীয়সী

বলিয়া তাহার নাম ভুলিয়াও উচ্চারণ করিবে না। কিন্তু তাহাতেই বা দোষ কী? মনে মনে সে ত' তাহাকেই স্বামী বলিয়া জানে। বিপদে এত কায়মনবাক্যে ডাকিয়াও যদি সে স্বামীর কর্ত্তব্য না পালন করে, পিশাচের হাত হইতে নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করিবার সাহস না থাকে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি করিব না কেন?

ধ্যানভঙ্গের পর সে কর্ত্তব্যপরায়ণ যখন ফিরিয়া আসিবে, তখন যেন সে দেখিতে পায়, তাহারই বাগদত্তা পত্নী আজ দেহ দিয়া পরের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছে।

কেন এমন সর্ব্বনাশের কাজ করিয়াছি—সে পরম পণ্ডিত যেন তার বুদ্ধি দিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দেয়। তাহার পর যদি সে অনিমাকে ঘৃণাও করে, আমার কোন আপত্তি থাকিবে না।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অনিমার মাথায় যেন ভূতের নৃত্য সুরু হইল। তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি লোপ পাইল। সে সেই দণ্ডেই আলো জ্বালিয়া নাগ সাহেবের উদ্দেশ্যে খচ খচ করিয়া এক পত্র লিখিতে সুরু করিল। সে লিখিল—

আমি আপনার প্রস্তাবেই রাজী হইলাম। বিবাহ করাই ঠিক। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া, বাড়ীর দলিলখানি ফিরাইয়া দিবেন। ইতি অনিমা।

পাছে রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া গেলেই তাহার সঙ্কল্প ঘুরিয়া যায়, সেই ভয়ে সে রাত্রেই নিঃশব্দে বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী নাগসাহেবের বাটীর বন্ধ লেটার-বক্সে চিঠিখানি ফেলিয়া আসিল।

কিন্তু চিঠিখানা ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনিমার অন্তর্য্যামী যেন বলিয়া উঠিল—কী সর্ব্বনাশ করিলে! সঙ্গে সঙ্গে বুক কাঁপিয়া উঠিল। অনিমা বার বার লেটার-বক্সের ডালা খুলিয়া চিঠিখানি বাহির করিবার চেষ্টা করিল,

কিন্তু পারিল না। তারপর পাগলের মত টলিতে টলিতে যখন সে তাহার ঘরে আসিয়া কোন গতিকে শয্যা আশ্রয় করিল, তখন তাহার ঘোরতর উন্মাদের অবস্থা, চিন্তা করিবার স্বাভাবিক শক্তিটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়াছে।

শেষ রাত্রিতে অনিমা পাশের ঘরে শুইয়াছিল। কিন্তু বেলা দশটা বাজিতেও অনিমা যখন উঠিল না, মাধুরী তখন ভাবিল সারারাত্রি জাগরণে সে অবেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছে। তাই সে কিছু না বলিয়া নীচে নামিয়া আসিতেই দেখিল, সৌম্য দিদির খোঁজে উপরে উঠিতেছে। দিদি যে ঘরে শুইয়াছিল, উভয়ে দেখিল তাহা ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ। সন্দেহ-বশে সৌম্য খড়খড়ি একটু ফাঁক করিতেই দেখিতে পাইল, অনিমা শয্যার উপর অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে এবং মুখ দিয়া এক প্রকার গোঙানি শব্দ বাহির হইতেছে। বুঝিল সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া দরজায় ধাক্কা দিতেই তাহা নিমেষে খুলিয়া গেল। সেই পথে সূর্য্যের আলো ঘরে পড়িতেই সৌম্যের যে দৃশ্য নজরে পড়িল, তাহাতে সে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল! মুখ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইল না।

অনিমার শিয়রের কাছে তাহার মামার আফিমের কৌটা খোলা পড়িয়া আছে। তাহাতে খানিকটা আফিম এখনও লাগিয়া আছে। বাকী যে কতটা অনিমা খাইয়াছে, তাহা অনুমান করা শক্ত। তবে সারা অঙ্গ বিষের ক্রিয়ায় নীল হইয়া উঠিয়াছে। মুখ দিয়া অনবরত ফেণা কাটিতেছে। চোখের তারা দুটি কপালের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়াছে।

অনিমার মাথার কাছে একখানি খোলা চিঠি! তাহাতে মাত্র কয়েক ছত্র লেখা—

'আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিলাম। ইহার জন্য কেহ দায়ী নয়'।

তাহার পর আর একটি পত্রে বড়দিকে উদ্দেশ করিয়া আর কয়েক ছত্র লেখা—

'বড়দি, আপনার চরণে অনেক অপরাধ করিয়া চলিলাম, মার্জ্জনা করিবেন। আপনার ভাই যদি কোন দিন দেশে ফিরিয়া আসে, তবে তাহাকে বলিবেন, এক পিশাচের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এ দেহ বিসর্জ্জন করিলাম; নতুবা বাঁচিয়া থাকিলে এ দেহ নষ্ট হইত—রক্ষা করিবার মত শক্তি ছিল না বলিয়া।

"দেবতার চরণে দিবার যোগ্যতা যদি নাই রহিল, এ পাপ দেহ লইয়া বাঁচিয়া থাকায় লাভ কি? বাঁচিতে হয়ত' চাহিয়াও ছিলাম; কিন্তু সে কলঙ্ক মাথায় বহিয়া যখন আপনাদের কাছে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি থাকিবে না, তখন ভাবিয়া দেখিলাম, মৃত্যু ছাড়া আর আমার গতি নাই। বাঁচিয়া থাকিয়া আপনার যে আশীর্ব্বাদ আমি পাইয়াছিলাম, মরণে যেন তাহাই আমার আত্মাকে শান্তি দেয়।'

পত্র পড়িয়া এবং অবস্থা দেখিয়া সৌম্যের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম করিল। সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া, রাস্তার ধারে এক দোকান হইতে তাহার বাবা, বড়দি ও মাষ্টার মশায়কে ছুটিয়া আসিবার জন্য টেলিফোন করিয়া দিল।

নিমেষেই বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। ডাক্তার এবং আত্মীয় স্বজনে বাড়ী ভরিয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ পাকস্থলীতে পাম্প বসাইয়া বমি করানো সুরু হইল। অর্দ্ধচেতন দেহকে সচেতন করিবার জন্য ঘন ঘন ইন্‌জেক্‌শান্ চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রোগী চক্ষু মেলিল না।

ডাক্তারেরা ভাবিলেন—বিষ যদি পাকস্থলীতে এখনও ভাল ভাবে মিশিয়া না থাকে, রোগী চেতনা না পাইলেও ভয়ের কোন কারণ নাই।

তাঁহারা ক্রমাগত পাম্প করিতে করিতে প্রায় দুই তিন বোতল জলের সহিত পাকস্থলীর অভুক্ত অংশ সমস্তই বাহির হইয়া আসিল। পরীক্ষা করিয়া জানা গেল—তখনও প্রাণ বাহির হয় নাই—ধীরে ধীরে নিশ্বাস পড়িতেছে।

তখন তাঁহারা চেতনার জন্য স্যালাইন্ প্রয়োগ করিতে সুরু করিলেন। এই ভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর পায়ে উত্তাপ দিতে দিতে—অনিমার নিমীলিত আঁখি দুটি যেন একটু নড়িয়া উঠিল।

ডাক্তারেরা বলিলেন আর ভয়ের কোন কারণ নাই। বিষ পাকস্থলীতে জীর্ণ হইবার অবকাশ পায় নাই, তৎপূর্ব্বেই তাহা বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছে। এখন রোগিণীকে প্রায় ২৪ঘণ্টা জাগাইয়া রাখিতে পারিলেই আফিমের সমস্ত প্রভাব দেহ হইতে দূর হইয়া যাইবে।

তাহার পর অনিমা ভাল করিয়া চোখ মেলিলে—সকলে মিলিয়া সে অসাধ্য সাধন সুরু করিল। বড়দি তাহার খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া অনিমার শায়িত দেহকে জোর করিয়া কোলের উপর তুলিয়া বসাইলেন এবং প্রায় আধ ঘণ্টা অন্তর ডাক্তারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাহাকে কফি পান করাইতে সুরু করিলেন।

প্রায় সারা দিনরাত সৌম্য ও বড়দিকে, সেদিন অনিমাকে আগ্‌লাইয়া কাটাইতে হইল। তারপর অনিমা যখন ভাল করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল, সৌম্য তখন জামার আস্তিন ভাল করিয়া গুটাইয়া খাটের বাজুতে ঘুসা ঠুকিতে সুরু করিয়াছে। কহিল—"সে পিশাচকে একবার দেখিয়ে দিন অনিমাদি'। একটি ঘুসীতে তার দাঁতের পাটিকে পাটি যদি সিধে উড়িয়ে দিতে না পারি—আমার নাম পাল্‌টে, কুকুর বোলে ডাক্‌বেন।"

করুণাময়ী কহিলেন—"সৌম্য প্রতিকার যদি কিছু কোরতে চাস, তবে তোর নবুদা'র খোঁজ করিস। পিশাচ যদি পৃথিবীতে কেউ থাকে,

তবে তোর সেই নবুদা। সে-ই আজ অনিমাকে খুন ক'রেছিল, কিন্তু ভগবান বাঁচিয়ে দিলেন। যদি কোন দিন সে পাষণ্ড আমার কাছে ফিরে আসবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাকে ব'লে দিস সৌমা, আমার বাড়ীতে সে হতভাগার আর স্থান হবে না। ভাই বোলে তাকে বড় ভালবেসেছিলুম। প্রতিফল সে হাতে হাতেই দিয়ে গেল।"

প্রশ্ন শুনিয়া সৌম্য বিহ্বলের মত তাকাইয়া রহিল। আর অনিমা সেই যে বড়দির কাঁধে মাথা রাখিয়া জড়ের মত পড়িয়া আছে—চেতনা লাভ করিলেও একটি কথাও কহিতে পারিল না। তেমনিভাবে বুকে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে, হয় ঠিক তার বিপরীত। অনিমার বাড়ীতে যেদিন এই অঘটন ঘটিল, নবকিশোর ঠিক সেই দিনই ঘুরিতে ঘুরিতে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছে।

এ কয়মাস সে নানাস্থানে ঘুরিয়া, শেষে গয়ায় গিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সীর উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া প্রয়াগে গিয়া মাথা মুড়াইয়া, দেশে ফিরিবার জন্য গাড়ীতে চাপিয়াছিল। কিন্তু কি ভাবিয়া ট্রেন হাওড়ায় আসিয়া থামিতেই সে সেদিন বাড়ী যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় রহিয়া গেল।

কালীঘাট অঞ্চলে কয়েক দিনের জন্য এক ঘরভাড়া করিয়া তাহার জিনিষপত্র সমস্ত সেখানে রাখিয়া, উদাস ভাবে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর সে পরিচিত রাস্তাগুলি ঘুরিতে ঘুরিতে কখন যে মনের অজ্ঞাতসারে বড়দি'র বাড়ীর হাতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—তাহা সে জানে না।

সারা দিবস ও রাত্রি জাগিয়া অনিমার শুশ্রূষা অন্তে, তাহাকে ভাল

দেখিয়া, যখন দেহে ও মনে পরিপূর্ণ ক্লান্তি বহিয়া করুণাময়ী তাঁহার নিজের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—সূর্য্যদেব তখনও ভাল করিয়া উঠেন নাই। সবে মাত্র চারিদিকে রঙীন আলো ছড়াইয়া প্রভাতের সূচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হল-ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই, মানুষ সর্প দেখিলে যেমন আতঙ্কে পিছাইয়া যায়, মেঝের উপর নবকিশোরকে শয়ান দেখিয়া করুণাময়ীও তেমনি শিহরিয়া উঠিলেন।

শীতকাল, গায়ে গরম জামা-কাপড় নাই, পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন ও মলিন, বিছানা নাই, মাথায় দিবার বালিশ পর্য্যন্ত নাই। একখানি সামান্য মাদুর বিছাইয়া একখানি শতছিন্ন সুতির কাপড় মাত্র ঢাকিয়া নবকিশোর পরম তৃপ্তিতে নিদ্রা যাইতেছে।

সে এতদিন কোথায় ছিল, কেমন ছিল, কখন আসিয়াছে, করুণাময়ী তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন বোধ করিলেন না—শুধু ক্ষণেক সেই মুণ্ডিতমস্তক, সর্ব্বস্বহারা, নিদ্রাচ্ছন্ন মলিন মুখের পানে অনিমেষ লোচনে তাকাইয়া রহিলেন। যাহাকে দণ্ডকয়েক আগে পাষণ্ড, হৃদয়হীন কুলাঙ্গার ভাবিয়া, তিনি তাহার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এমন কি সে এখানে আসিলে বিতাড়িত করিয়া দিবেন—এমন কথাও সৌম্যকে বলিয়াছিলেন, সেই নবকিশোরকে একটা কপর্দ্দকহীন রাস্তার ভিখারীর মত শয্যাহীন অবস্থায় ধূলায় লুটাইতে দেখিয়া—তাঁহার স্বভাব-কোমল মাতৃহৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ফরাসের উপর হইতে একটি তাকিয়া লইয়া অতি সযত্নে তাহার মাথার তলায় ঠেলিয়া দিতে এবং হঠাৎ নিদ্রার মাঝে বাধা পাইয়া সে চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল সামনে তাহার বড়দি' বসিয়া আছেন।

দু'হাত বাড়াইয়া পায়ের ধূলা লইতে গিয়া দেখিল, বড়দি' যেন হঠাৎ

কহিল : "বড়দি' আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছি নে, আমায় সব বুঝিয়ে দিন। যদি প্রতিকারের কোন উপায় থাকে, তা' নির্দ্দেশ কোরে দিন—আমি এই আপনার চরণ ছুঁয়ে শপথ কোরছি—জীবন থাকতে আর আমি আপনার অবাধ্য হ'ব না।"

নবকিশোরের যন্ত্রণা দেখিয়া করুণাময়ীর অন্তরে সে অভিমানের ... যেন কতকটা নিভিতে সুরু করিল। তিনি অপেক্ষাকৃত সংযম অবলম্বন করিয়া সহজ অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দিলেন :—

"তুমি কী সর্ব্বনাশ যে কোরেছ, অনিমার কাছে গেলেই সব জানতে পারবে। এখুনি সৌম্যের সঙ্গে সেখানে তুমি যাবে, দিনরাত সেখানে থাকবে, তারপর প্রতিকারের সময় এলে আমি তার সমস্ত ব্যবস্থা কোরে দেব। কিন্তু মনে থাকে যেন—যদি আমার কথার একচুল নড়চড় হয়, আমি তোমায় ক্ষমা ক'রবো না।"

কথা শুনিয়া যেন সে হৃদয়ের নিদারুণ গ্লানি অনেকখানি কমিয়া গেল। নবকিশোরও সহজ কণ্ঠে কহিল—"তাই হবে বড়দি' তাই হবে। আমি আপনার কথা কখনও অবহেলা করবো না।"

"এ কথার অবহেলা কখনও হবে না ?"

—"প্রাণ থাকতে নয় বড়দি'। এই আপনার পা ছুঁয়ে আবার ... ক'রছি—জীবনে আপনার অবাধ্য আর দ্বিতীয়বার হবো না।"

অনিমার জীবন-ইতিহাসে শীতের কুহেলিকা কাটিয়া আবার ... হাওয়া বহিতে সুরু করিল।

যে ছিল নির্জীব—সে আবার নব-জীবন লাভ করিয়া, নব-বসন্তে মঞ্জুরিয়া উঠিল। শুষ্ক পত্র ঝরিয়া পড়িয়া আজ তাহারই জীবন-তরু যেন নব-কিশলয়ে ভরিয়া উঠিয়াছে।